প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ ॥ ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক
ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ণ পরিচয়
২১৪/১ বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পরিবেষক
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
মমতা মণ্ডল
দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১-ই বিডন রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সমস্ত নদীর মতো তিক্রা-ও [তিগ্রা] বড় গরবিনী। আজও সে তেমনই গরবিনী গতিচ্ছন্দে বয়ে চলেছিল। রূপসী নারীদের ঠাট-ঠমক ও চলনে এক ধরনের উপহাস লুকিয়ে থাকে। তিক্রার চলনে যেন তেমনই কোনো উপহাস খেলা করছিল অন্তরঙ্গে। হয়ত সে ভাবছিল মনে মনে : হ্যাঁ, বাপু হে, হ্যাঁ! কত না শাহেনশাহ ও সম্রাট-কেই দেখলাম আমার দুই তটে! কত-ই না দেখলাম চারদিনের চাঁদনি রাত, আর তারপরেই সব অন্ধকার। তিক্রার গতি মন্থর, তবু কেমন যেন থমথমে। দু-দিকের উপকূলে সটান দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি। নদীর দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল রাজপ্রাসাদ, আর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। তটভূমি থেকে প্রাসাদ ও দুর্গ পর্যন্ত জমির ঢাল ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। উঁচু করা হয়েছে বলাই ঠিক। তিক্রা যাতে সহসা ছাপিয়ে উঠে সব কিছু গ্রাস করে ফেলতে না পারে, তাই নদীর কিনারা থেকে পাথর ও ইট ফেলে ফেলে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, আর সেখান থেকে ক্রমশ উঁচু দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তটভূমিকে। প্রাসাদ-দুর্গের প্রারম্ভিক দরজা অতিক্রম করলেই সামনে সমুচ্চ প্রাচীর দেখা যায়। এই প্রাচীরটির উচ্চতা প্রায় এক'শ হাত, তার বেশী ছাড়া কম নয়। প্রাচীরের স্থানে স্থানে দরজার আকারে চতুষ্কোণ গবাক্ষ গাঁথা আছে। গবাক্ষগুলির বহির্ভাগ লতা-পাতা দিয়ে সাজানো, এবং তাদের আরও মনোরম করা হয়েছে মর্মর ও অন্যান্য মসৃন পাথরের কারুকার্যের সাহায্যে। নদী-সংলগ্ন প্রাচীরের গায়ে এক বিশাল প্রবেশ দ্বার। এর বিস্তারও পঞ্চাশ হাতের কম নয়। তার উপরে রামধনুর মতো অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানটির দিকে তাকিয়ে মাঝেমাঝেই সাধারণ দর্শক ভেবে থাকে : এই বাইশ হাত চওড়া প্রাচীর এবং সংলগ্ন খিলানটি কখনোই মানুষের মেহনতের ফসল হতে পারে না। মানুষের পক্ষে কি এ-ধরনের অপার শ্রম সম্ভব? বিশেষ করে সেই সব শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে, যারা এক বেলাও ভর-পেট খেতে পায় না। সেই সিংহদ্বারে লেগে আছে এক মহাকপাট। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তার বিশালতা। তাকে শক্ত-পোক্ত করে রাখবার জন্য বড় বড় সোনা-রঙের গজাল, আর সোনালী ঘণ্টার পংক্তি রাজধানীর ও রাজতন্ত্রের বিপুল বৈভবের প্রভূত প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু সেই প্রমাণকে অনেক গুণ বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে সিংহদ্বারের উপর খচিত সুবর্ণ-রজত ও নানা রঙের মণি-মাণিক্যের শিল্পকৃতি। সিংহদ্বারটি পাহারা দিচ্ছে কবচে কবচে ছয়লাপ বর্মে আচ্ছাদিত বল্লমধারী সান্ত্রীর দল। ধূলিধূসর ঘন চাপ দাড়িতে তাদের দেখাচ্ছে বড়ই ভয়াবহ। কার হিম্মত আছে যে সেই সিংহদ্বার অতিক্রম করে ভিতরে অনধিকার প্রবেশ করবে?

সিংহদ্বার অতিক্রম করে আমরা কিন্তু এক নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারি। মধ্যবর্তী এক সুবিস্তৃত উদ্যানভূমিতে যেন সারা পৃথিবীর রঙ ও রূপ একসঙ্গে জড়ো করা হয়েছে। এক কোণে ক্রীড়া-পর্বত, অন্য কোণে নানা সুন্দর বৃক্ষের সমাবেশে রচিত হয়েছে উপবন। কোথাও পোষমানা হরিণের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কোথাও কোনো ফোয়ারার পাশে উজ্জ্বল পেখম মেলে নেচে চলেছে ময়ূরেরা। পাশাপাশি খাঁচাগুলির ভিতরে রয়েছে বন্দী পশুরাজ সিংহ, বাঘ, জেব্রা, উটপাখি, নানা জাতের বানর, শিম্পাঞ্জি, বনমানুষ। সহজেই বোঝা যায় এই প্রাসাদের মালিক শাহেনশাহ সমস্ত প্রাণিজগতেরই অবিসম্বাদিত শাসনকর্তা। প্রাসাদ-দুর্গের অন্তর্বর্তী এই সুবিশাল উপবনভূমির বিভিন্ন কোণ থেকে বহু ছায়াচ্ছন্ন পথ ও রাজপথ বিভিন্ন দিকে উঁচু-নীচু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পথগুলির নানা জায়গায় রয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন রাজকীয় দপ্তর। সেখানে সর্বদাই ব্যস্ত হাজার হাজার রাজ-কর্মচারীর সুশৃঙ্খল জমায়েত উপছে পড়ছে। (বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার সামলাচ্ছে তো তারাই। হ্যাঁ, সিন্ধু থেকে সিরিয়ার মরুভূমি, আর ককেশাস পর্বতমালা থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্যন্ত সেই সাম্রাজ্যের বিস্তার।) ছোটখাটো ব্যাপার তো নয়।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে সোজা সামনে তাকালে উঁচু ও প্রশস্ত সিঁড়ি পাহাড়ের ঢালের মতো উপরের দিকে উঠে গেছে দেখা যায়। সিঁড়িটির সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গেলে বড় বেশী সময় ব্যয় হয়ে যাবে। তাই সেটিকে দ্রুত গতিতে আরোহণ করে আমরা পৌঁছে যাই শাহেনশাহ-এর দরবার-কক্ষে। এক হাজার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে দরবার-কক্ষের ছাদ। দেখলে মনে হয় নীল আকাশ থেকে কেউ যেন খেলার ছলে টাঙিয়ে দিয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত মশারির মতো। দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় এখানেই ধনদাত্রী লক্ষ্মীদেবীর বর্তমান নিবাস। এই কক্ষে যেমন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মর্মর-সোনা-চাঁদি, পাঁচ'শ ঘর কৃষক মিলেও তাদের কুটির গড়তে সে পরিমাণ মাটি ব্যবহার করবার ঠাঁই খুঁজে পাবে না। যেদিকে চোখ পড়ে, সেদিকেই বহু বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, সৌন্দর্যের পরম্পরা, কলা ও সুরুচির বাহুল্য দেখা যায়। দরবার কক্ষের মেঝেতে উলের কালীন, এক-একটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ষাট হাত করে। দেওয়ালগুলি ঢাকা আছে রেশমের কালীনে, যার উপর সূচীশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন-স্বরূপ আঁকা রয়েছে সুন্দর ছবির অপার্থিব বর্ণমালা। (কে এঁকেছে এইসব ছবি? (অবশ্যই কোনো মানুষ, পরিশ্রমী সূচিশিল্পী, যাদের বহু বছরের অক্লান্ত মেহনতের ফসল এইসব ছবি, চোখের জলের নুন মেশানো ভাতের গ্রাসের বঞ্চনা বুকে নিয়ে।) আবার কোনো দেওয়ালে টাঙানো আছে সারি সারি জল-রঙ ও তৈলচিত্র। কোনোটা ভারতীয়, কোনোটা ইরানী, অথবা ইতালীয় শিল্পীর তুলিকার চমৎকারিত্বের নিদর্শন। (কোনো ছবিতে দেখা যায় আর্দেশীর-বাবের উন্নত মস্তকে রাজমুকুট পরাচ্ছেন স্বয়ং ভগবান অহুরমজ্দ, অন্যটিতে

হয়ত প্রথম-শাপুর রোমের গর্বকে খর্ব করে শৃংখলে আবদ্ধ সম্রাট ভেলারিয়ান-কে বন্দী করে নিয়ে আসছেন।) কোনোটিতে আঁকা আছে শিকারের উত্তেজক দৃশ্য, কোনোটিতে নববর্ষ উৎসবে মত্ত রাজা-প্রজাদের আমোদ-প্রমোদের সজীব চিত্রণ। গবাক্ষগুলির শূন্য স্থান ভরাট করে রেখেছে প্রাচীন ইরানী বাদশাহ-দের সুবর্ণ-রজত নির্মিত পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। (তাদের মধ্যে আছেন মহান্ কোবোশ, দারয়োশ, আর্দেশীর।) সুউচ্চ ছাদ থেকে নেমে এসেছে নানা রঙের রেশম ও মখমলের ফিতে। আলোকিত ফানুসগুলি যেন স্বর্গোদ্যানের এক একটি বৃক্ষ।

দরবার-কক্ষে এখন অনেক মানুষের ভিড়, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। প্রবেশ-দরজার আশেপাশে বসে আছে অজাতান-দের [গ্রামীণ নিম্নবর্গ, কিন্তু স্বাধীন প্রজা, দাস নয়] মণ্ডলী। এ-স্থানটি নির্দিষ্ট করা আছে স্বাধীন প্রজাদের নিম্নতম বর্গ কদহক্-খময়ান্ [গ্রাম-প্রমুখ], অস্পারান [গ্রামরক্ষী বা চৌকিদার] ইত্যাদি শ্রেণীর জন্য। এরা বগান্-বগের [দেবাদিদেব শাহেনশাহ] দর্শন পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বসে আছে। তাঁর দর্শন পেলেই এরা কৃতার্থ হয়ে যাবে। এইসব গ্রাম-প্রমুখ ও চৌকিদারেরা নিজের নিজের এলাকার এক-একজন ভগবানবিশেষের কম নয়, নিজের নিজের গলিতে যেমন একটি করে পরাক্রমশালী কুকুর থাকে—প্রায় তেমনই, কিন্তু এই দরবার-কক্ষে পৌঁছাবার আগে তাদের অনেক গলাধাক্কা সহ্য করতে হয়েছে, কাকুতি-মিনতি করতে হয়েছে অনেকের পায়ে পড়ে। একবার দরবার-কক্ষে পৌঁছে যাবার পরে এমনিতেই এরা নিশ্বাস ফেলছিল অতি সন্তর্পণে, তার উপরে সহসা শোনা গেল খুররমবাশের [রাজকীয় ঘোষকের] গম্ভীর সাবধানবাণী : "হে জিহ্বা! খামোশ! আজ তুই শাহেনশাহ-এর সম্মুখে হাজির হয়েছিস!" সামনের দিকে আরো এগোলে বাঁ দিকে অগণিত সুবর্ণ সিংহাসনের সারি। এই পংক্তিটি রাজকুমার, কুশান, শকান ও কির্মান-এর শাহ-দের জন্য সুরক্ষিত। তাদের ঠিক নীচেই বসেছেন বিস্পোনুহো-দের [রাজ-স্বীকৃত সামন্ত প্রভু] সাতটি শ্রেণীর মুখ্য অধিকারী-রা। এঁরা কারেন-পহলব, সোরন-পহলব, অস্পাহপত [সেনাধ্যক্ষ], গশ্নস্প-পহলব, স্পান্দিয়ার, মেহরান এবং জিক। তাঁদের পোশাক বহুমূল্য, চোখ ধাঁধিয়ে যায় সেদিকে তাকালে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্গাধীশ, কেউ কেউ অভিষেকের সময় রাজ-মুকুট বন্ধনের অধিকারী, আবার অনেকেই বংশানুক্রমে সেনাপতি বা অন্য কোনো উচ্চপদের আধিকারিক। ডানদিকে উপর থেকে নেমে এসেছে যে রজত সিংহাসনের পংক্তি, তার সর্বোচ্চ স্থানে বসেছেন মগোপতান্-মগোপত্ [ধর্মাধীশ বা মুখ্য রাজপুরোহিত]। তাঁর দাড়ি সাদা, বেশভূষা সাদা, পাগড়ি সাদা, গুশ্তী [কটিসূত্র] সাদা। এ-দেশে মুখ্য রাজপুরোহিতের প্রতিপত্তি শাহেনশাহ-এর থেকে কম নয়। তাঁর পবিত্র সংকেত পাওয়া মাত্র সাধারণ মানুষ তার ভালো মন্দ সবকিছু হারিয়ে ফেলতে পিছ-পা হয় না। ধর্মাধীশের সিংহাসনের কিছুটা নীচে, পিছনের

সারিতে বসেছেন আতরোপত্ মারস্পন্দান, মিত্রোবরাজ্, মিত্রো-অক্-বিদ্ ইত্যাদি কনিষ্ঠতর ধর্মনায়কের গোষ্ঠী। প্রমুখ আসন বচুর্ক-ফরমাদার-এর [প্রধান মন্ত্রী]। এঁরই করতলে কেন্দ্রীভূত আছে রাজ্যের সমস্ত শক্তি। তার পরের আসনগুলিতে আছেন যথাক্রমে অয়রান অস্পাহপত্ [ইরানের মুখ্য সেনাপতি], অয়রান-পত্ দপেহ-পত্ [মহাকায়স্থ বা অর্থমন্ত্রী] এবং হতুকশান্-পত বা বাস্ত্রিয়োশন-পত্ [কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী]। একই পংক্তিতে দেখা যাচ্ছে বিচার-ব্যবস্থার প্রধান আধিকারিক মহান্ শাবর্জদার-দাতবরকে। মন্ত্রিমণ্ডলী এবং স্বাধীন নাগরিকদের সামনের খালি জায়গায় বসেছেন বহু গায়ক, নর্তক ও যাদুকর। তাঁদের পোশাক ও বাদ্যযন্ত্রের ভিন্নতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা একদেশীয় নন। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ গায়ক ও নর্তক ভারতীয়। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে বেহরাম গোর এই শিল্পী-গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের বড় অনুনয়-বিনয় করে ভারত থেকে এ-দেশে আনিয়েছিলেন। বর্তমান প্রজন্মেও তাঁদের মধুর সঙ্গীত ও অপূর্ব নৃত্যকলা সমান সম্মান পেয়ে থাকে। সে-সম্মান তাঁরা পাবেন না-ই বা কেন? এঁরা নিজেদের সঙ্গীতজ্ঞানের মধ্যে সীমিত না থেকে ভারতীয় ও ইরানী কলার সংমিশ্রণে তৈরী করেছেন এক নতুন ধরনের এবং আরও শ্রুতি-মধুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। আগে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুধুমাত্র প্রত্যুষ থেকে প্রদোষকালের মধ্যবর্তী সময়েই গাওয়া হতো। ইরানী সঙ্গীতের প্রভাবে ইদানীং তা গাওয়া হয় দিন ও রাতের প্রহর অনুসারে, বিভিন্ন রাগে।

সহসা সমবেত লোকজন এক মুখর তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অনেকে সাষ্টাঙ্গ শুয়ে পড়লো মাটিতে, অনেকে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো 'অনবশক ববীদ' [অমর রহে], 'ওকামক রসী' [আপনার সকল কাজ সফল হোক]। কিন্তু এই চঞ্চলতা ঘোষকের পক্ষ থেকে রাজকীয় প্রত্যভিবাদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ ও স্থির হয়ে গেল। দরবার-কক্ষের সামনে উঁচুতে টাঙানো ছিল সোনা ও মণি-মুক্তাখচিত একটি সুবিস্তৃত রেশমি পর্দা। পর্দাটি ধীরে ধীরে সরে গেল। সামনের বেদী-মঞ্চটি চকচকে কালো আবলুস কাঠে তৈরী, আর তাতে সোনার উপর নানা রঙের জটিল ও নিপুণ কাজ করা আছে। বেদী-মঞ্চের উপরিভাগ সোনা ও সবুজ পান্নাখচিত চাঁদোয়ায় ঢাকা। গবাক্ষ-অন্তরাল থেকে আসছিল আলোর ছটা, আর সবুজ পান্নার উপরে সেই আলোহীন আলোর আভা নীল আকাশের বুকে রাতের তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল। বেদীর উপরে রাজসিংহাসন, যার উপরে বিছানো মণিময় আসন, এবং সামনে মখমলী সুবর্ণ পাদপীঠ। সামনের দিকে রয়েছে আরও চারটি অনুরূপ আসন, মূল সিংহাসনের ডানদিকে, যার মধ্যস্থলে বসেছেন এমনই এক মহাতেজস্বী পুরুষ, যে মূর্তিটির দিকে সাধারণ মানুষ চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। তাঁর শরীর কালচে-নীলাভ, পরিধানে সাদা-কালোর সংমিশ্রণে রচিত আজানুলম্বিত

কঞ্চুক [আলখাল্লা]। তাঁর পা-দুটি ঢাকা আছে লাল সুতোয় গ্রন্থিত পালকের পাদুকায়। আলখাল্লায় কটিবন্ধের রেশমি সুত্রের একটি প্রান্ত অলস-ভাবে পড়ে আছে সামনের দিকে। পুরুষটির কুঞ্চিত কেশদাম কিছুটা বাদামি, অলক গুচ্ছ ঘাড় থেকে নেমে এসেছে পিঠের উপরে। তাঁর অরুণাভ দাড়ির মধ্যে অসংখ্য কুণ্ডল। সভাস্থলের আলোকময় বাতাবরণে সেই কুণ্ডলগুলি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। চব্বিশ বছরের তরুণের যতটা দাড়ি থাকা সম্ভব, তার থেকে বেশী কিছু নেই যুবকটির চিবুকে। তাঁর কণ্ঠে ত্রিলহরী রত্নমালা ও দুহাতে কংকন। সোনার জরির কাজ করা পাদুকা পাদপীঠের এক পাশে পড়ে আছে। তাঁর শিরোপরি শোভা পাচ্ছে যে মুকুটখানি, তার ওজন যে পুরো সওয়া দু-মণ, তাতে সন্দেহ নেই। যতই হোক, মস্তকটি তো একজন মানুষের। সেই বিপুল ভার সে বহন করছে কী করে? বস্তুত সেই বিশাল বহুমূল্য রত্নভূষিত সুবর্ণ-মুকুট-টি এক অদৃশ্য শিকলের সাহায্যে চাঁদোয়া থেকে ঝোলানো হয়েছে মাথার ঠিক উপর পর্যন্ত। গবাক্ষ থেকে প্রতিসরিত সূক্ষ্ম রশ্মির রেখাগুলি এমনই দৃষ্টিবিভ্রম রচনা করেছে যে মুকুট-টির রহস্য কেউ জানতে পারে না। পুরুষটি ডান পায়ের হাঁটুর উপর রেখেছেন তাঁর বাঁ হাত, ডান হাতটি ঝুঁকে আছে সোনারঙ হাতলযুক্ত সোজা ও ধারালো খড়্গ-টির দিকে।

পর্দা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল এই মূর্তিটির উপর। তাঁকে দেখা মাত্র সামনের পংক্তির মানুষেরা, যারা তাঁর থেকে অন্তত দশ হাত দূরে বসেছিল, নিজের নিজের মুখ পথাম্ [রুমাল] দিয়ে ঢেকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও জয়-জয় ধ্বনি করেছিল। এমন সময় রাজকীয় ঘোষকের আদেশে সময়োপযোগী রাগ-সঙ্গীত শুরু হলো। ধর্মাধীশ রাজকুলে আসন্ন নব-জন্মের শুভসূচনা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার মধ্যে খুশীর ঢেউ খেলে গেল। সিংহাসনাসীন পুরুষটি সুখবর শুনে মৃদু হেসে আদেশ দিলেন ধর্মাধীশ-কে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করতে।

সহস্র চোখ অপলক দৃষ্টিতে মানুষের রূপধারী সেই দিব্য-প্রভাবশালী পুরুষটিকে দেখছিল। তাদের চোখে সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে পুরুষটির মধ্যে কোনো দৈবী বিভূতি অবশ্যই কাজ করছে।

দেবসভায় ইন্দ্রের রাজোচিত যে বিলাস-ব্যসনের কাহিনী সাধারণ মানুষ বহুকাল ধরে শুনে এসেছে তারই যেন প্রতিফলন তারা দেখছিল এই দরবার-কক্ষে। বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত মানুষ সেই দৃশ্যকে দৃষ্টির মাধ্যমে ধরে রাখতে চাইছিল মনের মণিকোঠায়। আর তারা আঘ্রাণ নিচ্ছিল বাতাবরণে ছড়িয়ে পড়া কস্তুরী-কেশর-গোলাপের মধুর সুগন্ধের। চোখের সামনে এইসব অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে অনেকেই ঘোষকের আজ্ঞানুসারে নিজেদের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারেনি। তবে কিনা সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় ছিল শুধু বিস্ময় মেশানো প্রশংসার বাণী। পুরুষটির চোখের পলক উঠছিল, নামছিল তাঁর

অক্ষিতারকা চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ ছিল, নতুবা তাঁকে দেখে হয়ত অনেকেরই ভ্রম হতো তিনি অচল অনড় মূর্তিমাত্র, তাঁর মধ্যে জীবনের স্পন্দন নেই। এমন সময় পিছনের দ্বারপ্রান্তে কিছু চঞ্চলতার আভাস পাওয়া গেল। একজন বিশালাকার সান্ত্রী দ্রুতগতিতে সামনের পংক্তির কাছাকাছি পেঁছে বরহর-নিগান্-খতায়ের [মুখ্য প্রতিহারী আধিকারিক] কানে কানে কি যেন বলল। সান্ত্রীটির মুখে-চোখে খেলা করছিল চিন্তা ও ভয়ের সুস্পষ্ট রেখা। বরহর-নিগান্-খতায় সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে অস্পাহপতের কানে কানে কিছু বলল। অস্পাহপত্ ইশারায় কিছু বললেন প্রধান মন্ত্রীকে। তিনি প্রণিপাত হয়ে পথামে মুখ ঢেকে নীচু গলায় সিংহাসনাসীন মানুষটির সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর আদেশ মুখে মুখে পেঁছে গেল সান্ত্রীটির কানে। সে দ্রুতপদে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

উপরের পংক্তির সিংহাসনাসীন মানুষগুলির প্রত্যেকেরই মুখমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে গভীর চিন্তার কালো ছায়া। কিন্তু, কারণ কি? শাহী দুর্গের ভিতরে, দরবার-কক্ষের নীচে, মর্মরনির্মিত সিঁড়ি পর্যন্ত রাজধানী তস্পোনের প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী একত্রিত হয়েছে। এদের পরনে কাপড় নেই, এরা ক্ষুধার্ত। এইসব মানুষ চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু দেখেছে. বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পুত্র-কন্যা মাতা-পিতা—কাকে নয়? তাই মৃত্যুভয় তাদের আজ আর বিচলিত করতে পারে না। দুর্গের প্রবেশদ্বারে বিশাল কপাট ও ভয়াবহ রক্ষীদের উপেক্ষা করে আজ তারা চলে এসেছে শাহেনশাহ-র সমীপে। সমস্ত অভাব-অনটন বিপত্তি-দুর্গতির কথা তারা পেশ করতে চায় শাহেনশাহ-র সামনে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জেনে গেছে যে, ছোট বা বড় কোনো সরকারী আমলার সামনে আবেদন-নিবেদনের ফিরিস্তি দিয়ে কোনো সুফল পাওয়া অসম্ভব। দ্বাররক্ষী এবং সান্ত্রীদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে, তাই অনায়াসেই তারা এই অবাধ্য অভব্য ভূখা-মিছিলকে আটকাতে পারত, হয়ত বা চেয়েও ছিল আটকাতে, অথচ সামান্য হাঁক-ডাক করা ছাড়া তারা সেই মিছিলকে আটকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। এর কারণ কি? আসলে তারা সেই চলমান অস্থিকংকালগুলির উপর নিজেদের খড়্গ ও বর্শা চালাতে কুণ্ঠা বোধ করেছিল। যারা জীবিত অবস্থাতেই মৃতের শামিল, তাদের উপর শক্তিপ্রয়োগ করে কি ফায়দা! যে কোনো শাসনব্যবস্থা ও শাসকের পক্ষে এ-ধরনের স্থিতি ত্রাসের সঞ্চার করে। তাই স্বাভাবিক কারণেই সেই সিংহাসনাসীন যুবকটি এবং তাঁর পাশের পংক্তির ব্যক্তিরা চিন্তিত ছিলেন, শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সভার লোকেরা কেউই 'খামোশ' ছিল না, ঘোষকের আদেশ সত্ত্বেও, এবং সম্ভবত সভার অনেকেই এই ঘটনার পূর্বাভাষ পেয়েছিল। ক্রমাগত বকবক করতে থাকলেও তাই তারা মাঝে মাঝেই সশঙ্ক চিত্তে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্ত্রীটির পিছনে পিছনে জনা-কুড়ি স্ত্রী-পুরুষ সভাকক্ষে

প্রবেশ করল এবং সমবেত জনসাধারণের মধ্য দিয়ে সিংহাসনের দিকে এগোতে লাগলো। এদের মধ্যে কয়েকজনের পোশাকের রঙ ছিল লাল। খুবই সাধারণ মানের বস্ত্র, শতচ্ছিন্ন—অথচ এই বিপুল বৈভবের বাতাবরণের মধ্যেও তাদের আচরণে বা অভিব্যক্তিতে দীনতার চিহ্নমাত্র ছিল না। লোকগুলির কারো দাড়ির রঙ লাল, আবার কারো কালো। অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষদের পোশাকও ছিল শতচ্ছিন্ন। তবে সেগুলি ঠিক পোশাক পদবাচ্য নয়, কেবল লজ্জা-নিবারণের জন্য একটির সঙ্গে আরেকটি গিঁট দেওয়া কয়েকটি পচা-গলা ন্যাকড়ার ফালি। এদের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তাম্বর মানুষদের তুলনায় খুবই মলিন ও কৃশ। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল দ্রুতগতিতে এগোতে, কিন্তু এমনই নির্জীবতা ছিল তাদের সেই চেষ্টায় যে উপস্থিত সকলের মনে হচ্ছিল তারা সম্ভবত সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। সিংহাসন থেকে দশ হাত দূরে পৌঁছে সান্ত্রীটি অবনত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। তার পিছনের স্ত্রী-পুরুষেরাও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাল শাহেনশাহ-কে। শাহ কিছুক্ষণ তাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে তাদের উঠে দাঁড়াতে বললেন। তারা উঠে দাঁড়ালে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। একজন রক্তাম্বর উত্তর দিলো—"সারাটা বছর অনাবৃষ্টি গেছে। তার উপর পঙ্গপাল এসে যেটুকু ফসল ছিল, তাও শেষ করে গেছে। মড়ক লেগে গেছে প্রদেশের কোণে কোণে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। যেখানে কিসানের নিজেরই একবেলার ভরপেট অন্নের সংস্থান নেই, তারা রাজধানীকে অন্নের যোগান দেবে কি করে? অন্যান্য প্রদেশ থেকে আনা এবং আগের মজুদ শস্য গুদামে পড়ে আছে। সামন্ত প্রভু, শ্রেষ্ঠী, এমন কি আপনার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সবার ঘরেও আছে। কিন্তু তারা তো স্থির করেছে—মানুষ ভুখা মরে তো মরুক, আমাদের সিন্ধুকে চাঁদি-সোনা উপছে পড়লেই হলো! এক লক্ষ শিল্পী ও শ্রমিক কেবল এই তল্পোনেই মারা গেছে। এই শিল্পীরাই তো শাহেনশাহ-র মুকুট তৈরী করেছিল, সিংহাসন নির্মাণ করেছিল, কালীনে কালীনে ঢেকে দিয়েছিল প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের মেঝে। এইসব শ্রমিকই বানিয়েছিল এই দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাসাদ। তারাই সারা দেশের জন্য ফসল ফলিয়েছে, কাপড় চোপড় বুনেছে। আজ তাদেরই হাজার হাজার মৃতদেহ বেওয়ারিশ লাশ হয়ে ঢেকে ফেলেছে অলিগলি নালা-নর্দমা। এত লাশ, এত লাশ চারিদিকে, যে কাক-শকুনেরও যেন মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। একদিকে যখন নগরের গলিতে বাগিচায় মৃত্যুর নগ্ন তাণ্ডব চলছে, গলিত শবের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তখন শ্রেষ্ঠী ও সামন্তদের বাতায়ন থেকে ভেসে আসছে আতরের খুশবুর ঝলক। তাদের ঘরে ঘরে তখন আলোর রোশনাই, ফূর্তির ফোয়ারা। আজ আমাদের কাছে জীবন এবং মৃত্যুর অর্থ অভিন্ন। তবু এভাবে বেঁচে থাকা আমরা অর্থহীন মনে করি।"

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে মানুষটির যেন শ্বাসনালী ফুলে ফুলে

উঠছিল। সিংহাসনাসীন পুরুষটি নিবিষ্টভাবে তার সমস্ত কথা শুনছিলেন। এবার তিনি মৃদুস্বরে কিছু কিছু প্রশ্ন করতে লাগলেন। রক্তাম্বর মানুষটি উত্তর দিতে দিতে চকিতে আড়চোখে তাকালো সোনা-রুপোর সিংহাসনে আসীন লোকগুলির দিকে। তাদের সকলেরই কপালে দেখা গেল কঠোর ভ্রূ-কুঞ্চন, অনেকে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। পুরুষটি সহজেই তাদের মনোভাব বুঝতে পারল এবং প্রশ্ন করল—"হে দেবাদিদেব! আপনি কি শুধুমাত্র বিশেষ একটি শ্রেণীরই শাহেনশাহ? আমরা, সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা কি আপনার কেউই নই?"

"অবশ্যই আমরা সম্পর্করহিত নই। বরং আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কি চাও তুমি?"

"সে তো বুঝতেই পারছেন আপনি। আমরা এভাবে তিল তিল করে মরতে চাই না। অথচ বেঁচে থাকতে হলে রুটির প্রয়োজন হয়, আর দেশের সমস্ত গম মজুদ করা আছে এই সব কুঁসিধারীদের গুদামে। আপনি যদি চান যে আমরা বেঁচে থাকি, তাহলে বাঁচবার পথ দেখান। আর তা না হলে আমরা তো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। আপনার সান্ত্রীদের আদেশ দিন আমাদের মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিতে। তাদের বলুন যথেচ্ছভাবে আমাদের উপর বর্শা-খড়্গ-ছুরি-তলোয়ারের ভাষায় কথা বলতে। আমরা তাদের অভিশাপ দেব না, দেব অন্তরের আশীর্বাদ, যাতে কোনো খাদ মেশানো নেই। পঞ্চাশ হাজার নারী-পুরুষ আজ আপনার প্রাসাদে একত্রিত হয়েছে—হয় আমরা জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে যাব, নয় তো মৃত্যুর হিমশীতল আঁধারে হারিয়ে যাব। আজ শুধু তস্পোনের পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসেছে—দেশের সাতটি প্রধান নগর থেকে রোজ পঞ্চাশ হাজার নারী-পুরুষের মিছিল এই প্রাসাদে আসতে থাকবে। কে জানে, তাতে হয়ত একদিন নগরে জীবিত প্রাণী কেউ আর থাকবে না, দেবাদিদেবের এই দুর্গ-প্রাসাদ মৃতদেহে ঢাকা পড়ে যাবে। তিনি হয়ে যাবেন মৃতদের শাহেনশাহ!"

চতুর্দিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল—"এরা মজুদকী! অপমান করতে এসেছে! হারামী বিধর্মী সব।" শাহ উত্তেজিত হয়ে বললেন—"মৃতদের শাহেনশাহ! আমি মৃতদের শাহেনশাহ নই, তা হতেও চাই-না! মহান্ পীরোজের পুত্র জীবিত মানুষের শাহেনশাহ হয়ে জন্মেছিল, সে তাই থাকতে চায়, তাই থাকবে। তুমি যাও, সকলকে খবর দাও যে কোয়াত্ তোমাদের জীবন দেবে, মৃত্যু নয়! অন্নহীনকে অন্ন দেবে, বস্ত্রহীনকে দেবে বস্ত্র! যাও!"

উত্তেজিত শাহ এ-কথা বলতে বলতে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুঃখে ক্ষোভে তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে, কাঁপছে দাড়ির এক একটি কেশ। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়ে গেল। দরবার সেদিনের মতো এখানেই শেষ।

নিশুতি রাত। নীরবতার চাদরে সারা শরীর মুড়ে অন্ধকার রাত বড় চুপচাপ এগিয়ে চলে, না কি পিছু হাঁটে—কে জানে। আজকের এই তামসী রাত এমনই স্তব্ধ নিশ্চুপ যে, তার চলনের কোনো শব্দ নেই, তার প্রহর পরিবর্তনেরও সাড়া বা ইশারা পাওয়া যায় না। তবু রাত চলতে থাকে পায়ে পায়ে, চলতে থাকে, চলতেই থাকে অবিরাম। জ্বলতে থাকে জোনাকির মতো, ছায়াপথের বুকে নাম-না-জানা নিষ্প্রভ নক্ষত্রের মতো। কি আশ্চর্য রাত আজ—তিগ্রা নদীও যেন কিছুক্ষণের জন্য তার স্রোত থামিয়ে রেখেছে। এমনই শান্ত গম্ভীর সে, যেন কিনারায় তার ঢেউ-এর স্পর্শ লাজুক অথচ উৎসুক প্রেমিকার ভিজে-ভিজে ঠোঁটের নিঃশব্দ আশ্লেষ।

দুর্গ-প্রাসাদের ভিতরে কয়েকটি বাতায়নে আলোর আভাস, অর্থাৎ—জীবনের চিহ্ন। বাইরের দুনিয়া দিকচিহ্নহীন আঁধারে ডুবে আছে। সিংহদ্বারে প্রহরীর দলও খুব সজাগ বা সতর্ক নয় এ-সময়ে। অবিশ্রান্ত পাহারার পরিবর্তে তারা চাইছে কোথাও একটু বসে দু-একটা কথা কিছু গাল-গল্প সহকর্মীদের সঙ্গে সেরে নিতে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমে ঢুলে পড়ছে। রক্ষীদের এ-রাতের অবস্থার বিবরণ শুনে কিন্তু ভাবা ভুল হবে যে কেউ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অনায়াসে দুর্গ-প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে।

অন্তঃপুরের একটি আলোকিত কক্ষ। চল্লিশটি স্তম্ভের উপর নির্মিত পারসিক বাস্তুকলার সুন্দরতম এক নিদর্শন এই কক্ষটি। দেওয়ালের দীপাধারে জ্বলছে উজ্জ্বল অসংখ্য মোমবাতি, প্রতিবিম্বিত হচ্ছে স্তম্ভগুলির মিনে করা সূক্ষ্ম অলঙ্করণের উপর। কক্ষটি শাহেনশাহ-র নিজস্ব বৈঠকখানা। সাজসজ্জায় জমকালো না হলেও সুরুচির পরিচয় বহন করছে। এখানেও বিছানো আছে এক মহার্ঘ আসন। শাহের মাথায় এখন আর সেই অবিশ্বাস্য মুকুট-টি দেখা যাচ্ছে না। এখন আর শাহ কোনো রঙ্গমঞ্চের নায়ক নন। তাঁর বেশভূষা এখন বেশ নম্র, সাধারণ ও বিনীত। তাঁর চেহারায় এখন এক উদাসীন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। শাহ নিশ্চিত কারো প্রতীক্ষায় আছেন।

ধীর আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলেন এক রক্তাম্বর ভূষিত পুরুষ। তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। অগণিত মোমবাতির উজ্জ্বল আলোকে দেখা যাচ্ছিল তাঁর আজানুলম্বিত ধূসর দাড়ি, রক্তিমাভ গায়ের রঙ, বাজপাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ম খড়্গ নাসিকা, আয়ত দুটি চোখ, চওড়া কপাল। লোকটি নিঃসন্দেহে সুপুরুষ। তিনি যদিও আসনাসীন শাহেনশাহ-কে দরবার-কক্ষের সভাসদ-দের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন না, কিন্তু যেভাবে তিনি নত করলেন তাঁর মাথা এবং হাত দুটি সংলগ্ন করলেন বুকের সঙ্গে, তাতে বোঝা গেল যে তিনি রীতি অনুযায়ী শিষ্টাচার পালন করতে চান।

আগন্তুককে দেখামাত্র শাহেনশাহ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সম্ভবত শাহেনশাহ-ও চাইছিলেন না যে, দরবার-কক্ষের মতো এখানেও প্রণিপাতের পুনরাবৃত্তি হোক। সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ হতে বেশী সময় লাগলো না। শুরু হলো কাজের কথা।

পাঠক অবশ্যই জানেন যে এই দুই পুরুষের মধ্যে প্রথম জন সাসানী-বংশীয় সম্রাট পিরোজের পুত্র কোয়াত্। আগন্তুক ছিলেন বামদাতের পুত্র মজ্দক্। কোয়াত্ আসল প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন—"আমি এই বিশাল রাজ্যের অধিপতি, অথচ রাজ্যের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক, আমার রাজধানীতে কি ঘটছে সে-খবরটুকুও আমার জানা নেই।"

"—আপনার এতে কোনো দোষ নেই। কোনো কিছুকে নিজের চোখ দিয়ে না দেখে অপরের চোখ দিয়ে দেখা, এ তো শাহেনশাহদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অভ্যাস। আপনি সেই পুরনো রেওয়াজের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসবেন কি করে?"

—"কিন্তু এটাও তো সম্ভব নয় যে হাজার হাজার মানুষ নিষ্ঠুর নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, আর আমি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব।"

—"তিস্পোনের জনসাধারণ যে আজ প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে বেঁচে আছে, আবার হাজার হাজার মানুষ যে সেই সংকটেরই যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারিয়েছে, সে খবর অবশ্যই আপনি এতদিনে পেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যের সঙ্গে পরিচয় শুধু কথা ও খবরের মাধ্যমে হওয়াটা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা উচিত। তবেই প্রতিকারের জন্য নির্ভুল পদক্ষেপ সম্ভব। নিজের চোখে দেখলে সংকল্প দৃঢ়তর হয়, কর্মশক্তি গতিবেগ পায়।"

—"কিন্তু শাহেনশাহ-র জীবন যে বড়ই পরাধীন!"

—"হ্যাঁ, এবং সংকটময়-ও বটে! শাহেনশাহ-র নিজের কোনো বিছানা থাকে না, নির্দিষ্ট শয়নকক্ষ থাকে না। রাতের বেলায় সে আজ এ-ঘরে শোয়, তো কাল ও-ঘরে।"

—"কারণ নিকট-আত্মীয়রাই সাধারণত তার প্রাণ নেবার ফিকিরে থাকে, নানা হীন ফন্দী আঁটে। শাহেনশাহ কোনো অলস মুহূর্তেও পাণপাত্রে ঠোঁট ঠেকাতে পারে না। সেখানেও বিষের ভয়!"

—"নগরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে আপনি ভয় পাচ্ছেন। ভাবছেন—জানাজানি হয়ে যাবে, আপনাকে হয়ত বা কোনো গুপ্তঘাতকের সম্মুখীন হতে হবে। তবে আমার উপরে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে নির্ভয়ে আসুন। চলুন, মানুষ দেখে আসি।"

—"বামদাতের পুত্রের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনি ধর্মাধীশ পদের অধিকারী ছিলেন। শাহেনশাহ-র পরেই সর্বোচ্চ পদ—ঐশ্বর্যে এবং

মর্যাদায়। কিন্তু আপনি সব কিছু ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ, মানব-মুক্তির ডাক, জগতের হিতসাধনের কামনা আপনাকে উতলা করে তুলেছিল।"

—"কিছুই আমি ছেড়ে চলে যাইনি, কোয়াত্। আমার হৃদয়ে সব সময়েই একটা কাঁটার ব্যথা বিঁধতে থাকে, তুষের আগুন জ্বলতে থাকে ধিকিধিক। আমার চারিপাশের মানুষ যখন নানা সন্তাপে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আমি একা কি করব শান্তিবারি নিয়ে, করুণাধারায় স্নান করে? সে তো চরম স্বার্থপরের কাজ। প্রকৃত মানুষের নয়।"

—"আমি প্রকৃত মানুষের মতো হৃদয় পেতে চাই। আপনিই আমাকে সেই হৃদয় দিতে পারেন। আপনার উপরে পূর্ণ আস্থা আছে আমার।"

—"আমার উপরে আস্থা থাকলেও নগরের প্রত্যেক মানুষকে বিশ্বাস করাটা উচিত হবে না। অন্তত আমি সকলকে বিশ্বাস করি না। তাই এই সাধারণ পোশাকেও শাহেনশাহ-র পক্ষে নগরের পথে বার হওয়া নিরাপদ নয়। আসুন, আমরা ছদ্মবেশ ধারণ করি। সাধারণ গেঁয়ো গোমস্তার ছদ্মবেশ।"

দুর্গের প্রাকার সংলগ্ন একটি ছাদ। আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন গোমস্তা। পরনে তাদের মলিন পোশাক। সামনে, অনেক নীচে, নানা আলোকমালায় সজ্জিত সুবিশাল তম্পোন নগর বিস্তৃত হয়ে আছে। সেদিকে হাত বাড়িয়ে তর্জনীকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে বয়স্ক মানুষটি বললেন—"এই আপনার রাজধানী তম্পোন ও তাকে ঘিরে সাতটি উপনগর। দেখুন, সামন্ত প্রভু ও শ্রেষ্ঠী-দের প্রাসাদে নানা রঙের আলোর ছটা। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে, তাই নয়? কিন্তু ঐ প্রাসাদগুলির পিছনেই আছে অখণ্ড তমসার রাজ্য, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষদের বস্তি-ঝুপড়ি। ভারতীয় শাস্ত্রে একুশটি নরকের নাম লেখা আছে। আপনার রাজ্যে নরকের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। স্বর্গও যে নেই তা বলছি না। অনন্তকালব্যাপী সুখভোগের সব উপকরণই আছে সে-সব স্বর্গে। কিন্তু সুখভোগের সংজ্ঞা তো সকলের কাছেই এক নয়। সে যাই হোক, চাঁদ উঠতে বেশী দেরি নেই। নগরের উপর থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সরে যাবে আঁধারের আলখাল্লা। যদিও সেই চাঁদের আলো উজ্জ্বল হবে না বেশী, তবু পথ চলতে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচা যাবে। চলুন, এবার আমরা এগোই। প্রথমে কোথায় যাবেন, স্বর্গে, না নরকে?"

—"স্বর্গের তুলনায় নরক বোধহয় আমাদের অনেক কাছে। চলুন, নরকই দেখে আসি।"

নরক জায়গাটি ঠিক কেমন সে আমরা জানি না, তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তম্পোনের এই উপনগর অম্পানবর-এর তুলনায় সে জায়গাটি খুব বেশী খারাপ নয়। চতুর্দিকে অন্ধকার আর নীরবতা। রাস্তা ধূলিধূসর। সাবধানে না চললে গভীর গহ্বরে পা ঢুকে যাবার ও হাঁটু ভাঙবার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে শতকরা একশ' ভাগের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, যেটা আপাতদৃষ্টিতে

রাস্তা মনে হয়, তা আসলে উঁচু-নীচু নর্দমা, যা ইদানীং ভরাট হয়ে গেছে নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে। সেই পথ বা নর্দমাটির দু ধারে ছোট ছোট কুটির। এই নিশ্ছিদ্র আঁধারেও কুটিরগুলির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। একটি কুটিরের ভাঙা জানালা দিয়ে দেখা যায় ক্ষীণ আলোর রেখা। যে মানুষটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত ধরে এগিয়ে গেল সেই কুটিরের দিকে। কুটিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ নয় শুধু ভেজানো ছিল আলগা-ভাবে—আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ক্ষীয়মাণ প্রদীপের শিখা বাইরের বাতাস পেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল—একটি কঙ্কাল বসে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। কিন্তু কঙ্কালটি যে জীবিত মানুষের তা বোঝা গেল যখন সে কায়ক্লেশে মাথা তুললো দরজার দিকে, এবং তার চোখের কোটর থেকে দুটি নিষ্প্রভ মণি সহসা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বয়স্ক মানুষটি নীচু গলায় তাকে কিছু বললেন। 'আমার অন্তরজাগর' বলে অভিবাদন জানিয়ে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু ততখানি শক্তি তার ছিল না। অন্তরজাগর সেই চেষ্টা থেকে তাকে নিরস্ত করলেন। তারপর তরুণ সঙ্গীটিকে উদ্দেশ করে বললেন—'এই বৃদ্ধটি তস্পোন নগরের একজন বিখ্যাত মাননীয় চিত্রশিল্পী। কিন্তু এ-দেশে শিল্পীদের ঝুলিতে কিছু শিরোপাই শুধু থাকে, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত তারা। প্রাসাদ-দুর্গের দরবার-কক্ষে মহান্ শাপুর ও রোম-সম্রাট ভেলারিয়ন-এর যে কালীন-চিত্রটি দেওয়ালের শোভা হয়ে বিরাজ করছে, সেটি এঁরই পুত্রের শিল্পকৃতি। অথচ দেখবেন তাতে নাম লেখা আছে কোনো সামন্ত প্রভুর বংশধরের। ছেলেটি দুর্ভিক্ষের অন্যতম বলি হয়ে গেল। এঁর একটি সুন্দরী কন্যাও ছিল। হয়ত শরীর বেচে সংসারের জন্য, প্রাণের জন্য কিছুটা অন্নসংস্থান করতে পারতো। কিন্তু সে রকম জীবন তার কাম্য ছিল না। সংযমের প্রেমে পড়ে শেষ পর্যন্ত যমের দুয়ারে কড়া নাড়তে হলো তাকে। অশক্ত বৃদ্ধ পিতা এখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন, যমকে গালি দেন বিড়বিড় করে, আর শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করেন।"

কঙ্কালসার বৃদ্ধটি চুপচাপ দুই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্তরজাগর তাঁর ঝুলি থেকে কিছু ফল বার করে দিতে গেলে বৃদ্ধটির স্তিমিত দু-চোখে যেন আলোর ফুলকি দেখা গেল। শিশুর মতো হাসলো সে। একটিও দাঁত অবশিষ্ট নেই তার, মাড়ি খসে খসে পড়ছে। হাতের ইশারায় সে ফলগুলি অন্য কাউকে দিতে বললো। তারপর অবসাদে নিষ্প্রভ সেই শিল্পীটির চোখদুটি ধীরে ধীরে বুজে এলো। সে ঘুমোবে।

মানুষ দুটি ব্যথিত হৃদয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে এলো পথে। দিগন্তে তখন অট্টালিকা সারির পিছন থেকে বেরিয়ে আসছিল হলুদ থালার মতো চাঁদ। বিধবা যুবতীর রূপের মতো অকারণে ক্রমশ বিকীর্ণ হচ্ছিল তার রোশনাই।

তবু এই ঘন অন্ধকারময় বস্তি-ঝুপড়ির পথ বা নর্দমায় সে আলো পেঁছাতে এখনো অনেক দেরি আছে।

পরের যে কুটিরটিতে তাঁরা প্রবেশ করলেন সেটি একজন বাস্তু শিল্পীর। ঘরে ঢুকতেই দেখা যায় তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের এক সাকার রূপ—একটি মর্মর প্রাসাদের নমুনা, যাতে রোমক, ভারতীয় ও ইক্ষুমানীয় বাস্তুকলার অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। সেই তরুণ বাস্তুশিল্পীর মৃত্যুশয্যার শিয়রে রাখা আছে নমুনাটি, পাশে বসে আছে তরুণী স্ত্রী। অন্তরজাগরের সঙ্গী যুবকটি শুধু এক ঝলক মর্মর প্রাসাদের নমুনাটিকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তাতেই সে বুঝতে পেরেছিল সেই বাস্তুশিল্পীর চিন্তার গভীরতা, তার শৈল্পিক মাত্রায়ণ, তার জ্যামিতিক জ্ঞান, তার রুচির পরিশীলন। স্ত্রী-র কাছ থেকে অন্তরজাগরের আগমন-সংবাদ শুনে সে অবিচলিতভাবে বললো—"আর কোনো কষ্ট নেই, অন্তরজাগর। কষ্ট তো শিগগিরই শেষ হতে চলেছে। বাবা গেছেন, মা-ও চলে গেলেন। এবার তো আমাদের দু-জনের দিনশেষে ডেরা বদলাবার পালা।"

—"কিন্তু আমি যে অন্ন পাঠিয়েছিলাম সকলের জন্য?"

—"হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীর শিশু পুত্র-কন্যা যে অনশনে মারা যাচ্ছিল, অন্তরজাগর। আপনিই তো বলেছিলেন আমাদের, অপরের দুঃসময়ে কাজে লাগাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম! তার থেকে বড় কিছু এদুনিয়াতে নেই! থাকতে পারে না।"

অন্তরজাগরের তরুণ সঙ্গীটি নীরবে শুনছিল সবকিছু, আর দেখছিল সাধারণ গরীব মানুষের কত কাছাকাছি পেঁছে গেছে, কত নিকট-আত্মীয় হয়ে উঠেছে তার এই অসমবয়স্ক বন্ধুটি।

পরের কুটিরটি জনৈক চর্মকারের। আমরা যাদের চামার বা মুচি বলে থাকি। মানুষটির ক্ষুধার্ত ও ব্যাধি-জর্জর শরীর দেখে মনে হয় এই দুনিয়ায় সে আর অল্পক্ষণেরই মেহমান। অন্তরজাগরের কাছ থেকেই জানা গেল যে রত্নখচিত শাহেনশাহী মোজার [অভিজাত শ্রেণীতে ব্যবহৃত এক ধরনের মূল্যবান পাদুকা] নির্মাণে এই চর্মশিল্পীটি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশেষ করে রাজপুরুষদের ছোরা ও তরবারির সুদৃশ্য এসকোবার্দ-এর [ইংরাজীতে শব্দটি গৃহীত হয়েছে 'স্ক্যাবার্ড' রূপে] বহিরাবরণে চামড়া ও মণি-মুক্তার সূক্ষ্ম শিল্পকৃতির জন্য এই মানুষটির নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তক্ষশীলা, মগধ, কান্দাহার, কাহিরা [কায়রো, মিশর], এথেনিয়া [গ্রীস বা যবন দেশ] ও রোমের শিল্পীমহলে। পেটের জ্বালায় তাকে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম জলের দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখন নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে শুধু বসে থাকা, আর কান পেতে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা।

তন্তুশিল্পী ও মৃৎশিল্পকারদের বস্তির মধ্য দিয়ে দু-জনে এগিয়ে চলেছেন।

চাঁদের আলো এখন উজ্জ্বলতর। বস্তি পার হয়ে এসে অন্তরজাগর একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন, পিছনে কোয়াত্। এটি ছিল মুদির দোকান। খুব বড় নয়, মাঝারি মাপের ব্যবসায়ীর দোকান। আজ দোকানের তাক আলমারি সব খালি পড়ে আছে। দোকানের মালিক এক সময়ে মোটামুটি ভালোই অর্থ উপার্জন করেছিল। আর তার সঙ্গে দুদিনের জন্য কিনে রেখেছিল সোনা-চাঁদি। অন্নের দাম যখন চার-পাঁচগুন বেড়ে গেল, শ্রেষ্ঠী ও সামন্তদের কাছে সে তার সমস্ত মজুত অন্ন বিক্রি করে দিলো। সে ভেবেছিল আনাজ ও অন্নের এই আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক ব্যাপার। মুনাফা যখন ঘরে আসছেই তখন সব মজুত মাল বেচে দিয়ে আরো কিছু সোনা-চাঁদি কিনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বড় মজুতদারদের পরিকল্পনা সে বুঝতে পারেনি। দেশের সমস্ত আনাজ ও অন্ন যখন শ্রেষ্ঠী-সামন্ত গোষ্ঠীর করায়ত্ত হয়ে গেছে, ততদিনে এই ছোট ব্যবসায়ীটির ব্যক্তিগত ভাঁড়ারও প্রায় খালি। সে যখন পরিচিত বড় ব্যবসায়ীদের কাছে গম কিনতে গেল, সহসা অনুভব করল সেই একই দামে সে দু-লুন [দু-মাস। লুন = চাঁদের পাক্ষিক গতি] আগেই সোনা কিনেছে। ক্রমশ সে দেখল যে জিনিস কিছুদিন আগেও এক দামে [⅛ দ্রাখ্‌ম] পাওয়া যেত, তার মূল্য এখন দ্রাখ্‌মের [১ দ্রাখ্‌ম = ৬·৩ গ্রেন চাঁদির চাকতি] হিসাবে চড়ে গেছে। আর দ্রাখ্‌মের হিসাব চড়ে গেছে দিনারে [১ দিনার = ১৩·৬৯ গ্রেন সোনার চাকতি]। সোনার মূল্যে অন্ন ও আনাজ খরিদ করতে করতে ছোট ব্যবসায়ীটির তহবিল শূন্য হয়ে গেল একদিন। কৃষক বা মজুরের তুলনায় সে অনেক বেশী দিন সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে পেরেছিল বটে কিন্তু শেষে সে অনুভব করে যে, দিনার ধনের প্রতীক হলেও তা খাওয়া যায় না, এবং অন্নই মানুষের প্রকৃত ধন।

পথ চলতে চলতে অন্তরজাগর তাঁর নীরব সঙ্গীটিকে বললেন—"আকাশ থেকে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে, যে মাটির মালিক আপনি, যে মাটির বুক মাড়িয়ে আপনি হাঁটছেন। দেখুন, আপনার ছায়া আগে আগে হেঁটে চলেছে, আর সেই ছায়ার নীচেই জ্বলছে মহারৌরব, ভারতীয় শাস্ত্রের চতুর্থ নরক। আপনি নরকের দু-একটি দৃশ্য তো দেখলেন, যদি ইচ্ছা হয় আপনার রাজধানীর দু-একটি স্বর্গের শোভাও উপভোগ করতে পারেন। চলুন, নদীর ওপারে বেআদের্শীর উপনগরে যাই।"

নদী পার হয়ে বেআদের্শীর উপনগর। কিন্তু সহসা অন্তরজাগর কি যেন ভেবে অন্যদিকে বাঁক নিয়ে প্রবেশ করলেন দর্জনীতান্ এলাকায়। সত্যিকারের নরক যদি দেখতে হয় তো এখানে আসুন। সব কিছুই পাবেন এখানে—তপ্তকুর্মি, কৃমিভোজন, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, সারমেয়ার্দন—নরকের বিভিন্ন রূপ। [ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে নরকের একুশটি স্তরের নাম, যথাক্রমে, তামিস্র—অন্ধতামিস্র—রৌরব—মহারৌরব—কুম্ভীপাক—কালসূত্র—অসিপত্রবন—শূকর-

মুখ—অন্ধমুখ—কৃমিভোজন — সন্দংশ — তপ্তকুর্মি — বজ্রকণ্টকশাল্মলী—বৈতরনী—পুয়োদ—প্রাণবোন—বিশমন—লালভক্ষ—সারমেয়াদর্ন—অবীচী—অয়ঃপান। মহান্ মজ্দক-এর, বা অন্তরজাগরের আদি গুরু 'মানী' ভারতীয় শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধ ও তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে, তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইরানে, বিশেষ ক'রে তৎকালীন রাজধানী তস্পোনে, এক দিকে যেমন 'মানী' প্রবর্তিত মজ্দকী ভাবধারা-র প্রতি অনেকে আনুগত্য প্রকাশ করেন, অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মনে তখনও ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অবিচল ছিল—অনুবাদক।] রাজধানীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এলাকা ছিল দর্জনীতান্। অধিকাংশ গৃহে গৃহী নেই। চারিদিকে গলিত শবের স্তূপ। শবদেহগুলির বর্তমান মালিক সারমেয়-বাহিনী, ক্ষুধার্ত কুকুরের দল, যারা কিছুকাল আগেও ছিল গৃহপালিত। কোয়াত্ ভয় পাচ্ছিলেন। কুকুরের দল, তাঁকে ও অন্তরজাগরকে চলন্ত মৃতদেহ ভেবে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

দর্জনীতান্ মূলত সৈনিক শ্রেণীর মানুষদের এলাকা। শান্তিকালীন সময়ে সেই সৈনিকেরাই নগর-নির্মাণ, পোত-নির্মাণ এবং রাজপথ-নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হতো। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি পরিবারের দশজন পুরুষের মধ্যে ছ-জনই কোনো না কোনোভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতো। আজ সেখানে ছিল শুধু মৃতদেহ, আর হাহাকারের বাতাবরণ। মৃতদেহগুলিকে চেটেপুটে খেয়ে চলেছে অসংখ্য কুকুর, খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ছে, জেগে উঠে খাচ্ছে আবার, ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনধিকারী কুকুরের উপর।

এবার তাঁরা পৌঁছালেন রাজধানীর স্বর্গ-স্বরূপ এলাকা বেআর্দেশীর বা সেলুকিয়া উপনগরে। কথিত আছে যে গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস মহল্লাটির গোড়াপত্তন করেছিলেন, তাই আজও অনেকে বেআর্দেশীর-এর পরিবর্তে সেলুকিয়া বলে থাকে। এখানে সারি সারি তিনতলা-চারতলা অট্টালিকা। মধ্যবর্তী রাজপথ প্রশস্ত, সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন। এখন অর্ধেক রাত। চাঁদ মধ্য গগনে। চতুর্দিকে তীব্র আলোর প্লাবন, যেন দুধে স্নান সেরে এসেছে সমস্ত মহল্লা। অট্টালিকার ভিতর থেকে উজ্জ্বল দীপের রোশনাই দেখা যায়, আর শোনা যায় নারীপুরুষের আমোদ-প্রমোদের কলগুঞ্জন, এবং মাঝে মাঝে অট্টহাসি।

অন্তরজাগর একটি দরজায় মৃদু করাঘাত করে ডাকলেন—"ডোরা"! সুন্দরী যবন দেশীয় এক গণিকা দরজা খুলে দিলো, বলল—'লোক আছে"। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গিয়ে এক পলক তাকিয়েই সে চিনতে পারল অন্তরজাগরকে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে সে তাকিয়ে থাকলো তাঁর দিকে।

অন্তরজাগর হেসে বললেন—"জানি, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। কিন্তু আমার এমন একটা গুপ্ত স্থান চাই যেখান থেকে আমি ও আমার সঙ্গীটি পরিচিত কয়েকটি মানুষ বা অমানুষ-কে অলক্ষ্যে থেকে দেখতে পারি।" গণিকাটির পক্ষে সেরকম ঠাঁই খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল না।

অন্তরজাগরের তরুণ সঙ্গীটি হতবাক হয়ে দেখলেন—ডোরার শয়নকক্ষে একটি আসনে বসে আছেন ধর্মাধীশ মগোপতান্—মগোপত। তাঁর সাদা দাড়ি, সাদা পোশাক, সাদা কটিসূত্র পড়ে আছে আসনের সামনে মেঝেতে। কোল জুড়ে বসে আছে শ্বেত-শুভ্রা যবনী ডোরা, অথচ ধর্মাধীশের পুরুষাঙ্গ তখনও শিথিল। সম্ভবত তার উচ্ছ্রিত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। সোনার পানপাত্র থেকে লাল মদ চুমুক দিতে দিতে মাঝেমাঝেই তিনি তাঁর পুরুষাঙ্গকে পুরুষকার দেবার চেষ্টা করছেন, এবং সেই অঙ্গবিশেষের অসাড়তা-কে ঢাকবার জন্য বলছেন—"মজ্দক্‌পন্থী-রা নিপাত যাক! জীবনের এই সুন্দরতম মুহূর্তে শুধু তুমি থাকো, ডোরা—আর আমি থাকি! তোমার সঙ্গসুখ ও স্পর্শসুখও স্বর্গসুখের সমান!"

হ্যাঁ, ইনিই ইরান রাজ্যের ধর্মাধীশ, মুখ্য রাজপুরোহিত। এঁর বাণীতে আর ভগবানের দৈববাণীতে কে কবে ফারাক করতে পেরেছে। হ্যাঁ, ইনিই বর্তমান ইরানের ধর্ম-সংরক্ষক।

আরেকটি ঘরে রাজধানীর ও রাজসভার প্রসিদ্ধ নর্তকী বর্দকা-র [লাল গোলাপ] প্রখর যৌবন এবং অয়রান্-অস্পাহপতের প্রবলপৌরুষ পরস্পরের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠেছে। বহু যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতির কণ্ঠহার এখন দুলে দুলে উঠছে কামার্তা রূপসী নর্তকীর গলায়।

রাজপথে অন্তরজাগর ও তাঁর সঙ্গী। পথ সুনসান। এক ঝলক বাতাস বয়ে আনে হাস্নুহানার উগ্র সৌরভ। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিশির, হয়ত বা কারো অশ্রুকণা। অন্তরজাগর তাঁর সঙ্গীর দিকে না তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন—"এখানে কিন্তু নরকের আগুনের আঁচ পেঁছাতে পারেনি। তা বলে যে কোনো আঁচই এদের ঝলসে দেবে না একদিন, সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। জনসাধারণ আজ বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। তার প্রমাণ আপনি দরবার-কক্ষেই পেয়েছেন। মানুষ বড় কাঁদছে, কোয়াত্! আর আপনাকে ঘিরে থাকে যে সমস্ত সভাসদ-সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, তারা হেসে চলেছে বীভৎস আনন্দের পৈশাচিক অট্টহাসি! আপনি যদি দেখতে চান তবে চলুন। এই বিলাস-নগরীতে আজ রাতে রাজ্যের পাঁচ জন মন্ত্রী, সাত জন সামন্ত প্রভু এবং বেশ কয়েকজন রাজকুমার হাজির আছেন। আসুন, স্বচক্ষে দেখে যান আপনার আপনজন-দের কীর্তিকলাপ!" জবাবে কোয়াত্ শুধু মাথা নাড়ালেন। না, আর কিছু দেখতে চান না তিনি, আর সহ্য হবে না তাঁর।

তিক্রা নদীর সেতু পার হচ্ছেন তাঁরা। নদী নীরবে প্রবহমাণা। অন্তর-

জাগর সহসা দু-হাতে তাঁর সঙ্গীটির কাঁধ ধরে চোখে চোখ রেখে বললেন—"পৃথিবীর মাটি মানুষকে যতখানি অন্ন দেয়, তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার করে, তার ভাগের অন্ন ছিনিয়ে নেয়। অথচ, প্রত্যেক মানুষেরই তো ধনী হওয়ার জন্মগত অধিকার আছে। তাহলে কেউ ধনী কেউ নির্ধন কেন থাকবে! পৃথিবীর বুকেই স্বর্গকে নামিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে, কোয়াত্—যদি মানুষে মানুষে প্রভেদ ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, যদি সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।"

গুপ্তপথ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে দু-জনে অন্তঃপুর পর্যন্ত এলেন। তারপর কোয়াতের হাতে মৃদু চাপ দিলেন অন্তরজাগর, চোখে চোখ রেখে নীরবে হাসলেন, মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—"শব্‌বখের" [শুভরাত্রি], এবং চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আজকের রাত কি করে আর শুভ হতে পারে! আজ কোয়াত্ বিনিদ্র রজনী যাপন করবেন, তাঁর হৃদয়ে বারবার বিঁধতে থাকবে কুলকাঁটার দংশন। তাঁর চোখের সামনে কখনো ভেসে উঠবে নগ্ন বিকৃতকাম বৃদ্ধ মগোপতানু-মগোপতের অশ্লীল ছবি, আবার কখনো তিনি দেখবেন বেওয়ারিশ লাশের মালিকানা নিয়ে কুকুরদের মরণপণ লড়াই। নরকের আগুনের আঁচ তাঁকেও স্পর্শ করবে।

দরবার ও অন্তঃপুরের একটি নিভৃত কক্ষে আমরা আগেই প্রবেশ করেছিলাম। আসুন, এবার কোয়াতের শয়নকক্ষে প্রবেশ করি। কামরাটি খুব বড় নয়, কিন্তু সাজ-সজ্জায় অতুলনীয়। সমস্ত কামরাটি চন্দন-কস্তুরী-গোলাপ-পদ্ম-নাগিস-যূঁই ইত্যাদির মধুর সুগন্ধে আমোদিত হয়ে আছে। পালঙ্কের পায়াগুলি হাতীর দাঁতের, তার উপর সোনার কারুকার্য। দুগ্ধফেনিভ শয্যা বিছানো রয়েছে পালঙ্কের উপরে, চারিদিকে ঝুলছে মুক্তার ঝালর। মোমবাতির মৃদু আলোর স্পর্শে মাঝেমাঝে বাঘের চোখের মতো নীলাভ দ্যুতি বিচ্ছুরিত করছে সেই মুক্তারাজি।

এই সুন্দর প্রকোষ্ঠে, এই সুরভিত বাতাবরণেও কোয়াতের মুখমণ্ডল গম্ভীর, তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার বলিরেখা। কাছেই বসে আছেন বাম্বিশনান্-বাম্বিশ্ন [মহারাণী] সাম্বিক্। তাঁর মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার। কিন্তু এ-সব বাহুল্য মাত্র। মহারাণী সাম্বিক্ স্বয়ং রূপের নিরিখে সহস্র রত্নভূষণের থেকেও উজ্জ্বলতর। ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, শঙ্খসদৃশ গ্রীবা, তনু-অঙ্গ, হিমশ্বেত গাত্রবর্ণ, রক্তিম কপোল, বাদামি আঁখিতারা, কোমল সুবর্ণ রেখার মতো ভ্রু-লতা, আয়ত পদ্মনেত্র, আজানুলম্বিত কেশরাশি—সব মিলিয়ে তিনি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি—যা দেখলে বুকের ভিতরটা দুলে ওঠে। এই অপরিমেয় সৌন্দর্যের উত্তপ্ত সান্নিধ্যে বসেও কোয়াত্ আজ উদাসীন, গভীর চিন্তায় মগ্ন। মহারাণী সাম্বিকের দৃষ্টি কোয়াতের উপর নিবদ্ধ। তিনি যেন পড়ে নিতে চাইছেন দয়িতের চিন্তার ভাষা। মধুর স্বরে তিনি ডাকলেন—“খতা!” [খতা = ঈশ্বর, প্রভু]। কিন্তু কোয়াত্ নিরুত্তর। কম্পিত কণ্ঠে মহারাণী আবার ডাকলেন—“খতা—পাতেখ্শাহ। ক অপায়েত?” [প্রভু, শাহেনশাহ। কি হয়েছে?]। তবু কোনো জবাব নেই কোয়াতের। সাম্বিক্ খুবই বিচলিত হয়ে মধুর কম্পিত কণ্ঠে বললেন—“ব্রাত! [ভাই!] আমি আপনার সহোদরা, সুখ-দুঃখের সহধর্মিণী। [উল্লেখনীয়, ইরানে এবং সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ ছিল একটি সমাজ-স্বীকৃত প্রথা। রাজনৈতিক কারণে প্রথাটি বিশেষভাবে পালন করা হতো সামন্ত-প্রভু ও রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। তাতে রাজবংশে বহির্জগতের অনুপ্রবেশ ঘটতো না, এবং উত্তরাধিকারী রাজপুরুষ অপেক্ষাকৃত স্বস্তিতে সিংহাসনে আরূঢ় থাকতে পারতেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দশকে মহামান্য মানীর শিষ্য অস্তরজ্রাগর [মজদক্] প্রথাটি লোপ করবার চেষ্টা করেন। সাময়িক সফলতা পেলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টায় তিনি বিফল হন। প্রথাটি বর্তমান কালেও অল্প-বিস্তর অনুসৃত হয়ে থাকে। সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে না হলেও পিতৃব্যের পুত্র-কন্যার মধ্যে বিবাহ এখনো

বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত। উদাহরণ, মুসলমান আক্রমণের ফলে যে-সব পারসিক ভারতে চলে আসে, যারা বর্তমানে পার্সী নামে পরিচিত, তাদের মধ্যে এখনো প্রথাটি মান্য করা হয়। মজদক্ সম্ভবত জিন্-তত্ত্বের বিচার করেই প্রথাটির বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়—অনুবাদক]। আপনি কোনো কথা বলছেন না কেন? গত রাত্রে দেখা দৃশ্যাবলী কি বিকল করেছে আপনাকে?"

কোয়াত চমকে উঠে মহারাণীর দিকে তাকালেন—"গত রাত্রের কথা তুমি কি করে জানলে?"

—"আমি জানি। রাজধানীর সাধারণ মানুষ কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সেও আমি জানি অনেক আগে থেকেই।"

—"তবে বলোনি কেন আমাকে? আগে যদি বলতে, কিছু কিছু প্রাণ তো বাঁচানো যেত, কষ্টের ভার কিছুটা তো লাঘব করা যেত। তুমি কি দেখনি, সম্বিক্, গত রাত থেকেই আমি কতখানি বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে আছি।"

—"হ্যাঁ, দেখেছি। এখনো দেখছি। আর ভাবছি কি উপায় করা যায়।"

—"উপায় করা সহজ কাজ নয়, সম্বিক্। কাল রাতে যাদের আমি দেখেছি, বিনা দোষে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সেইসব মানুষদের ভুলে যাওয়া আরও কঠিন। আমি তো মাত্র কয়েকজনকে দেখেছি। সারা দেশে হয়ত কয়েক লক্ষ মানুষের দশা ঐ-রকমই। কে জানে, কত লক্ষ মা পুত্রহীনা হয়েছেন, কত স্ত্রী হয়েছেন বিধবা। আর এ-সবের মূল কারণ—অন্নাভাব। আজ এ-দেশে প্রাণের থেকে অন্নের দাম বেশী, অথচ অন্ন যে অপ্রাপ্তব্য তাও নয়। সম্বিক্, আমার সম্বিক্, এগুলি মৃত্যু নয়, হত্যা। সুপরিকল্পিত হত্যা। আর সেই সমস্ত হত্যার জন্য দায়ী আমি।"

—"না প্রভু। সমস্ত হত্যার জন্য একা আপনিই দোষী নন। কিন্তু এ-দেশের হাজার হাজার খুনীর মধ্যে আপনিও একজন। প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ খুনী তো তারা, যাদের গৃহে শাহেনশাহ যদি একবার পদধূলি দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজস্ব মকুব হয়ে যায়, জাতে উঠে যায় তারা, রাজ-ঐতিহাসিক তাদের বংশ নাম লিপিবদ্ধ করে নেন। তাদের আপনি খেতাব দেন, জায়গির দেন, সিংহাসনের নিকটস্থ পংক্তিতে বসবার অধিকার দেন। খুনীরা তো সব সময়েই আপনাকে ঘিরে থাকে—অথচ আপনি তাদের স্বরূপ জানেন না।"

—"তুমি কি আমার মন্ত্রিমণ্ডলীর কথা বলছ, সম্বিক্?"

—"শুধু মন্ত্রিমণ্ডলী কেন, স্বামী। তারা তো আছেই, আপনার অধীনস্থ সেনাপতিরা, সামন্ত প্রভু-শ্রেষ্ঠী-রাজকুমার-জায়গিরদার-ইজারাদার-দরইজাদার, কার কার নাম বলব, কে লিপ্ত নেই গণহত্যার এই হীন ষড়যন্ত্রে। আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর অনুচরের দলই তো দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে। এত লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে চারিদিকে যে চিল-শকুনেরও খাবার ফুরসত নেই। ওদিকে

শ্রেষ্ঠী-সামন্ত গোষ্ঠীর গুদামে গম-চাল ভরে আছে পাহাড় প্রমাণ।”

“তুমি যা বলছ, সম্বিক্‌, সে যেন অন্তরজাগরের কথারই প্রতিধ্বনি।”

—“হতে পারে। কারণ, তিনিই আমাকে চোখ খুলে দেখতে শিখিয়েছেন, তাঁরই অশেষ করুণার ফলে আমি সত্য-মিথ্যায় প্রভেদ করতে শিখেছি।”

—“আমার অগোচরে। অথচ আমরা বসবাস করি একই প্রাসাদে, একই কক্ষে। আমরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁর করুণা থেকে আমি কেন বঞ্চিত হলাম, রাণী?”

—“এ-প্রশ্নের উত্তর কেবল তিনিই দিতে পারেন, স্বামী। তবে আমার মনে হয়, আপনি শাহেনশাহ বলেই প্রথমে বিবেচিত হননি। কিন্তু অন্তরজাগরের হৃদয় যেমন বিশাল, অন্তর্দৃষ্টিও তেমনই প্রখর। এখন তো আর আপনার কোনো ক্ষোভ থাকা উচিত নয়।”

—“না, ক্ষোভ নেই কোনো। শুধু ভাবছিলাম, বড় দেরি হয়ে গেল তাঁর মহান্ হৃদয়ের স্পর্শ পেতে। কাল রাত্রে আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম নগরের শিল্পীসমাজ, দরিদ্র মজদুর, সামান্য দাস-দাসীরা পর্যন্ত সকলেই কতখানি আপন ভাবে তাঁকে, কতখানি বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। অথচ, উনি ঠিক রাজ পরিবারে না জন্মালেও মগোপতান্-মগোপত্ বামদাতের ঐশ্বর্য কোনো রাজা-মহারাজার থেকে কম ছিল না।”

—“উনি সেই ঐশ্বর্যের বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে মুক্তপুরুষ হতে পেরেছেন, আর আপনি শাহেনশাহী বিলাস আড়ম্বরের চোরাবালিতে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছেন—এইসব ভেবে আক্ষেপ হচ্ছিল আপনার। তাই নয়?”

—“হ্যাঁ, হচ্ছিল। ছদ্মবেশে নগর পরিক্রমার কথা উনি যখন বললেন, আমার বুকের ভিতরটা তখন ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। সে ভয় প্রাণের ভয়। নগরের পথে যখন বেরিয়ে পড়লাম, এক-একটি গলির মোড়ে জমাট-বাঁধা অন্ধকারে পিছন থেকে মনে হচ্ছিল এই বুঝি সামনে এসে দাঁড়ালো কোনো গুপ্তঘাতক। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভয় অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে লোকটি আমার পাশাপাশি পথ হাঁটছেন, তাঁর জিম্মায় আমার প্রাণ সুরক্ষিত থাকবে, তিনি কখনোই আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না।”

—“এবং সে জন্য আপনাকে তাঁর উপযুক্ত হতে হবে।”

—“অবশ্যই। জিম্মেদারী সব সময়েই দ্বি-পাক্ষিক হওয়া শ্রেয়। আমি কিন্তু এ-কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করে নয়, সত্যি-সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি জানি, যাদের উপর জিম্মা দিয়েছিলাম, সেইসব আধিকারিকদের অধিকাংশ আমার আদেশ কার্যত মানে না। দোষ আমারই, সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনোদিন কথা বলিনি, আর তাদের-আমার মাঝখানের লোকগুলো চিরকাল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে। রাজতন্ত্রে এটাই সম্ভবত নিয়ম। তাই এত হানাহানি, ভুল বোঝাবুঝি।”

—"রাজা তো আবহমান কাল থেকে মাঝখানের লোকগুলোর, আধিকারিকদের ক্রীড়নক হয়ে এসেছে। আধিকারিকদের নেতা রাজাকে হত্যা করে নিজে রাজা হয়ে বসে, দোহাই দেয় সমাজতন্ত্রের, তারপর সে সমাজ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব মুছে ফেলে।"

—"অন্তরজাগর তাহলে যা বলছেন··· ?"

—"হ্যাঁ, সেটাই প্রকৃত সমাজতন্ত্র! জনগণের সমাজতন্ত্র, যাকে গণতন্ত্র-ও নাম দেওয়া যায়। জনগণকে বাদ দিয়ে তো আর সমাজ হতে পারে না! কিন্তু থাক এ-সব কথা। দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন পন্থা ঠিক করলেন?"

—"এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি, সম্বিক্। আজ যদি সামন্ত-শ্রেষ্ঠীদের আদেশ দিই গুদাম খুলে দিতে, মজুত করা চাল-গম প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিতে, তারা আমার আদেশ মানবে বলে বিশ্বাস হয় না। উল্টে হয়ত বিদ্রোহ-ই শুরু করে দেবে!"

—"সামন্ত-শ্রেষ্ঠীদের সঞ্চিত অন্নের কথা দূরে থাক, আপনি যদি রাজকীয় অন্নভাণ্ডারও খুলে দেবার আদেশ দেন, তাহলেও তারা বিরোধিতা করবে। কারণ, তাহলে তারা দেশের সমস্ত সোনা-চাঁদি নিজেদের কুক্ষিগত করতে পারবে না!"

—"সোনা-চাঁদি! এক একটি দিনারে পর্যন্ত মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে! সহস্র শিল্পী ও কারিগর মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ কিসান-মজদুর মারা গেছে···"

—"কিসান-মজদুর নেই, কাজেই এ-বছর যাও-বা কিছু ফসল ফলেছিল, আগামী বছর একেবারেই নিষ্ফলা যাবে!"

—"ঠিক তাই, সম্বিক্। আচ্ছা, বলতে পারো, ধনরত্নের পরিবর্তে যারা যাবতীয় সুখ কিনতে চায়, মানুষই যদি না থাকে তবে তাদের সুখ-সামগ্রীর যোগান কে দেবে?"

—"অতীতেও বহু মহাপুরুষ সবার উপরে মানুষকে স্থান দেবার কথা বলেছেন। তাঁরা বিবেককে জাগ্রত করবার কথা বলেছেন, সহৃদয় ও সংবেদনশীল হতে বলেছেন। দেশ ও জাতির স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিতে বলেছেন। মহান্ তাঁরা—মানুষমাত্রেই নিজের নিজের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করুক, এর বেশী তো তাঁরা কিছু চাননি! তবু তাঁদের কথা কি শুনেছে কেউ?"

—"জানি না। হয়ত শোনেনি কেউ। তবে নিজের মনের নিরিখে বলতে পারি যে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা যায়।"

—"যোগাযোগের দরুন হয়ত একজন শাহেনশাহ-র হৃদয় পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার অগণিত মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনা বহু যুগের কঠোর পরিশ্রমের কাজ। আপনার চিন্তাধারা যে আপনার পুত্রের হৃদয়েও উত্তরাধিকারসূত্রে বহমান সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।"

—"তাহলে উপায় ?"

—"উপায় করে নিতে হয়, স্বামী। তার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে নিতে হয়। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, সে ক'দিন আগে এলেই বা অসুবিধেটা কি? আপনি তো স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করে পঞ্চাশ হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আপনার প্রাসাদে এসে পেঁছেছিল। এখনো অমন অনেক পঞ্চাশ হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ আছে আপনার রাজ্যে। আপনি তাদের পাশে-দাঁড়ান, বন্ধু হয়ে, সমব্যথী হয়ে—দেখবেন সাধারণ মানুষই সমস্ত সঙ্কটমোচনের একমাত্র উপায়।"

কোয়াতের মুখমণ্ডল থেকে ক্রমশ দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যেতে থাকে।

—"অন্তরজাগরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত হবে মনে হয় ?"

—"অবশ্যই তাঁর পরামর্শ প্রয়োজনীয়, কিন্তু দেশের এই সঙ্কটকালে সব রকম প্রতিকারমূলক সিদ্ধান্ত নিতে হবে শাহেনশাহকে—এবং একবার সেদিকে পা বাড়ালে আর পিছিয়ে আসা যাবে না।"

—"সামন্ত-শ্রেষ্ঠী-সেনাপতি সকলেই প্রবল বিরোধিতা করবে সে আমি জানি, সম্বিক্। বংশানুক্রমে সাসানী-রা বিলাসী, কিন্তু তারা কাপুরুষ নয়। এগিয়ে যেতে যেতে পিছোনোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

—"পিছিয়ে আসার দরকারই হবে না, প্রভু। জনসাধারণ অগণিত, অশেষ, অমর। পাঁচ হাজার দশ হাজার মারা পড়লেও কিছু আসবে-যাবে না। আর সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণকে কিসের পরোয়া। দেশের সেনাবাহিনীর সকলেই তো গরীব ঘরের। তারা কিছুতেই আপনজনের উপরে অস্ত্রাঘাত করবে না। সামন্ত-শ্রেষ্ঠীদের ভাড়াটে-খুনীর দল জনস্রোতের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। তাই বলছিলাম, নিজেকে একা ভাববেন না। শুভকাজে আপনার সঙ্গী দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, অন্তরজাগর থাকবেন আপনার পাশে, আমি থাকব, আমি থাকব চিরকাল!"

কোয়াত্ উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন সম্বিকের কাছে। চিবুকে আঙুলের স্পর্শে মুখ তুলে ধরে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকলেন সম্বিকের মায়াবী চোখে চোখ রেখে। আর রাণীর রক্তিম কপোলে তখন সূর্যোদয়ের লালিমা, দু-চোখে আনন্দের গঙ্গা-যমুনা। সযত্নে সেই যুগল অশ্রুধারা মুছে দিয়ে কোয়াতের দুই বাহু আবেষ্টন করল সম্বিকের কম্পিত তনুদেহ, তাঁর ওষ্ঠ স্পর্শ করলো অগ্নিভ দুটি ঠোঁট। এইভাবে তাঁরা জেগে উঠতে থাকলেন।

তস্পোন নগরে আজ এসেছে এক নবচেতনার ফাল্গুন মাস। শুধু নগর এলাকা থেকেই নয়, জমকালো অট্টালিকা সারির অন্তরালে ঢাকা আছে যে-সব গরীব মানুষদের বিবর্ণ জরাজীর্ণ বস্তি, যেমন আমাদের পূর্বপরিচিত মহোজ্জা ও দর্জনীতানু, সেখান থেকেও মৃত্যুর করাল ছায়া দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। বিগত কয়েক মাসের অভুক্ত মানুষগুলির চিমসে শরীর এখনও শীর্ণ ও দুর্বল, তবু তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের উজ্জ্বলতা। কথা প্রসঙ্গে প্রত্যেক মানুষের মুখেই কখনো না কখনো উচ্চারিত হচ্ছে বামদাতু-পুত্র অন্তরজাগর মজদকের নাম। সেই উচ্চারণ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় সিক্ত। তিগ্রা নদীর সেতু দুটির উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে অবিরাম জনস্রোত। একটি সেতু নগরে আসবার জন্য, অপরটি নগরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে যাবার জন্য। একটি সেতু দিয়ে অসংখ্য ঝোলা, টুকরি, চ্যাঙারি নিয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে। অন্য সেতুটির উপরে মাথায় বোঝা নিয়ে ঘর-ফেরতা জনতার ভিড়।

রাজকীয় অন্নাগারের সামনে সারিবদ্ধ মানুষের ভিড়। তিল ধারণের স্থান নেই সেখানে। হাজার হাজার মানুষ, অথচ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য আজ কোনো বল্লমধারী সশস্ত্র সান্ত্রীর দেখা মেলে না। শুধু জনাকয়েক রক্তাম্বর পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করছে সেই বিশাল জনসমাবেশকে। তাদেরই একজন উঁচু গলায় সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন—"আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। শান্তি বজায় রাখুন। সকলের জন্যই গম-চাল মজুত আছে শাহেনশাহ-র শস্যাগারে। অন্তরজাগর শাহ-কে বলেছেন যে, গুদামে অন্ন মজুত থাকতে দেশের জনসাধারণ যদি অনাহারে মারা যায়, তাহলে তা ঘোর অন্যায়, জঘন্য অপরাধ। শাহ সে-কথা স্বীকার করেছেন। তিনিও বলেছেন যে রাজকীয় অন্নাগারে সঞ্চিত অন্ন আপনাদেরই পরিশ্রমের ফসল; তাতে আপনাদের পূর্ণ অধিকার আছে।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—"সামন্তদের গুদামেও তো কম অন্ন মজুত করা নেই। সেগুলো খোলা হচ্ছে না কেন? সে অন্ন কি আমাদের পরিশ্রমের ফসল নয়?" রক্তাম্বর পুরুষটি ধীরভাবে উত্তর দিলো—"অবশ্যই। এ-দেশের সমস্ত ফসল তোমার ও তোমাদের মতো মেহনতী মানুষই ফলিয়েছে। আজ দ্যাখো, মগোপতানু-মগোপতু ও অস্পাহপতু-এর প্রাসাদ থেকেও অন্ন বিতরণ করা হচ্ছে। এইভাবেই এক জায়গায় অনেক মানুষের ভিড় ক্রমশ নানা স্থানে ভাগ হয়ে যাবে। তস্পোনের সমস্ত অন্নাগারের দরজা খুলে যাবে।" জনতা তুমুল হর্ষধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। রক্তাম্বর পুরুষটি দু-হাত তুলে সকলকে শান্ত হবার জন্য ইশারা করলেন। তিনি কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে আবার বলতে শুরু করলেন—"হ্যাঁ, তস্পোনের সমস্ত বন্ধ অন্নাগার একে একে খুলে যাবে। কিন্তু আপনাদের সকলকে মনে রাখতে হবে

যে এটা লুটের ব্যাপার নয়। অন্ন দেশের সমস্ত মানুষের, কাজেই প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি পরিবার যেন সেই অন্নের ভাগ পায়; এখানে যেন অদূরদর্শী লোভী মানুষেরা মৌরসীপাট্টা না জমাতে পারে। অন্তরজাগর আপনাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনারা কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য নেবেন না। প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু প্রয়োজন মতো প্রত্যেক পরিবারের জন্য শস্য বিলি করা হবে। তিনি এ-কথাও বলেছেন যে আগামী ফসল ওঠা পর্যন্ত, যা এখনো পাঁচ-ছ' মাস দেরি আছে, কোনো মানুষ যেন অন্নের অপচয় না করে। আরও একবার নিশ্চিত মৃত্যুর কব্জা থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগ হয়ত আমরা নাও পেতে পারি।"

গত কয়েক মাসের মধ্যে কত লক্ষ মানুষ যে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে, তার হিসাব পেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিপীড়িত অভুক্ত অসহায় জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিল শুধু অন্তরজাগরের অনুগামী এই রক্তাম্বর সম্প্রদায়। কয়েক দশক ধরেই তাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছিল—এরা ধর্মদ্রোহী, স্বভাবে পশুবৎ, অপরের ধন-লুণ্ঠনে বিশ্বাসী। লোকে এ-সব কথা শুনতো এবং সরল মনে বিশ্বাসও করতো। কিন্তু আকাল শুরু হবার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষই রক্তাম্বরদের কথা শুধু পুরোহিত সম্প্রদায়ের মুখে শুনেছে, তাদের স্বচক্ষে দেখেনি। কিন্তু অকালের মুখোমুখি হয়ে তবে সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারলো যে পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের থেকে কতখানি দূরে, এবং অপরিচিত রক্তাম্বর সম্প্রদায় তাদের কত আপনজন। রক্তাম্বরদের প্রথম গুরু মানী বলেছিলেন তাঁর অনুগামীরা যেন কখনও দুঃখী ও ক্ষুধার্ত মানুষের জাতি-ধর্মের বিচার না করে। ভগবান ও শয়তানের মধ্যে শতসহস্রবৎসর ব্যাপী যে যুদ্ধ চলছে, একদিন শয়তান আকামেনু সেই যুদ্ধে পরাজিত হবে। বর্তমান গুরু অন্তরজাগর বলেন যে সে লড়াই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ধর্মের অর্থ শুধু পূজা-পাঠ-ভজন নয়, প্রকৃত ধর্ম তাই, যা মানুষের চরিত্রকে ধারণ করে থাকে। মানুষের চরিত্রের প্রধান উপাদান সহনশীলতা, সহমর্মিতা, জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবার ভাবনা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই পরিবারের সদস্য, এই ভাবটিই মূল, সেই ভাব না থাকলেই অভাব দেখা দেয়। পুরোহিত সম্প্রদায় মূলত মূর্খ হলেও ব্যবসা-বুদ্ধিতে চিরকালই ধূর্ত। এ-কথা সর্বকালে সর্বদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তারা বুঝতে পেরেছিল যে সর্বসাধারণ যদি মানী বা অন্তরজাগরের ভাবধারাকে অনুসরণ করে, তাহলে তাদের যুগযুগান্তরব্যাপী শোষণের ধারা মুছে যাবে। তাই দেরেস্তদীন-এর [মানী প্রবর্তিত ধর্ম] বিরুদ্ধে তারা নানা ধরনের অপপ্রচার জারি রেখেছিল।

দুর্ভিক্ষের ফলে জনসাধারণ যখন দিশেহারা, তখনই তারা প্রথম জানতে পারলো 'দেরেস্তদীন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ—মানবধর্ম। এমন একটা সময়

এসেছিল, যখন অনেকে সামান্য কয়েক দ্রাখ্‌ম-এর বিনিময়ে বাধ্য হয়ে স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত-আব্রু বেচে দিয়েছে। নিজেদের স্বাধীনতা খুইয়েছে দাসখতে টিপসই দিয়ে। আর পুরোহিতের দল রব তুলেছিল—দাস হতে পারো, কিন্তু নারীর সতীত্ব যেন বজায় থাকে। আসলে নারীর সতীত্বহরণের দায়িত্বকেও তারা একচেটিয়া করে নিতে চেয়েছিল, পূজা-পাঠের অধিকারের মতোই। সে অধিকারও তারা পেতে পারতো, কিন্তু মানুষকে ছলনা করবার জন্য কিছুটা অন্তত ভালোবাসার ছল করতে হয়। যারা অপ্রেমের অসুখে ভোগে, দেশে দেশে কালে কালে, তারা জাতির চরম দুঃসময়েও মানুষের কাছাকাছি আসতে পারেনি। তারপর এলেন অন্তরজাগর ও তাঁর অনুগামীরা। ধর্মব্যবসায়ী-সামন্ত-শ্রেষ্ঠীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল তারা। তাদের ধারণা ছিল সেনাবাহিনীর সাহায্যে অনায়াসেই শায়েস্তা করা যাবে বেয়াদব জনগণকে। দেখা গেল যে সেনাবাহিনীর একজনও কেউ নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে রাজী হলো না। আজ তস্পোনের ধনিককুল ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে।

শাহী প্রাসাদের একটি কক্ষে নগরের কয়েকজন প্রমুখ সামন্ত, শ্রেষ্ঠী, সথ্রোধার [ক্ষত্রিয়] ও অথ্রাবন বসে আছে। প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের রেখা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে কি তারা? কুর্সির হাতল সজোরে চেপে ধরে আছে সবাই, তাই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। কোয়াত্ বসেছেন একটি ছোট সিংহাসনে, তাঁর বেশভূষা এখন রাজকীয় নয়, অতি সাধারণ। তাঁর সামনের আসনে বসেছেন মগোপতান্-মগোপত্ এবং অস্পাহপত্। স্পষ্ট বোঝা যায় যে এরাই সামন্ত-শ্রেষ্ঠী-ধনিক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আজ শাহেনশাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

মগোপতান্-মগোপত্ ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—"অপবিত্র পাপী এই মজদক্টা ধর্মদ্রোহী, আকামেনুর অনুচর। জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলে শস্য লুট করাচ্ছে। তস্পোনের ভদ্র ও মার্জিত মানুষগুলি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। আগে কখনও আমরা এ-ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি।"

—"আগে কি কখনো এমনটি হয়েছে, মহামান্য ধর্মাধীশ, যে ভদ্র ও মার্জিত মানুষদের অন্নাগার ভরপুর থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে?"

—"কিন্তু এমনও তো কখনও হয়নি যে চোর-ছ্যাঁচোড়, বেশ্যা ও তাদের দালালদের পালনপোষণের জন্য ধনিক শ্রেণীর খাদ্য-লুণ্ঠন শাহী অনুমতি লাভ করেছে! অনেকে তো সরাসরিই প্রশ্ন করছে—দেশ ও জাতির এই চরম দুর্দিনে আমাদের রক্ষাকর্তা দেবাদিদেব পাতেখ্শাহ কোথায় চলে গেলেন!"

—"দেশ ও জাতি সকলকে নিয়েই তৈরী মহামান্য ধর্মাধীশ, শুধু ধনিক

শ্রেণীকে নিয়ে নয়। আর যারা এ-ধরনের প্রশ্ন করছে তারা আপনাকে মাধ্যম না করে আমাকেই সরাসরি প্রশ্ন করতে পারে। আরো একটি কথা—আমি কোথাও চলে যাইনি, আমি আছি, মানুষের মধ্যে।"

—"আমরা তাহলে মানুষের মধ্যে গণ্য হচ্ছি না?"

—"অবশ্যই হচ্ছেন, মহান্ ধর্মাধীশ, সকল মানুষের মধ্যে। তাছাড়া, এ-সব হলো রাজনীতি বা দেশ শাসনের ব্যাপার। আপনি এর মধ্যে আসছেন কেন? ও হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার ধর্মপত্নী জানতে চেয়েছেন তিনি অমাবস্যার দিন পেঁপে খেতে পারবেন কি না আর, অন্তঃপুরের এক যুবতী দাসীর নিতম্বে অনেকগুলি স্ফোটক দেখা দিয়েছে। ঠিক কবে চিকিৎসার জন্য ডাকলে রাজবৈদ্যের তরুণ ভাগিনেয়টির নারী-নিতম্ব দেখে চিত্তবিকার ঘটবে না, তা যদি কৃপা করে গণনা…"

অম্পাহপত্ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি সহসা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন—"আমার মনে হচ্ছে রক্তাম্বরদের কথাই ঠিক। স্বয়ং বগান্-বগ পাপী মজদকীদের শস্যাগার লুণ্ঠনের আদেশ দিয়েছেন।"

—"আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, অম্পাহপত্। আমি, শাহেনশাহ কোয়াত্, কাকে কবে কী আদেশ দিই, দিয়েছি বা দেবো, আপনি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন না। আর যদি করেন, তাহলে আগে অস্ত্রাগারের চাবি, যে রাজকীয় প্রাসাদে আপনি থাকেন তার চাবি, এবং রাজ-তরবারি জমা দিয়ে যাবেন। প্রশ্ন করবেন তার পরে।"

অম্পাহপত্ কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেলেন। তিনি জানেন এ-সব অনুগ্রহের জন্যেই আজও তিনি জীবিত আছেন। একবার অধিকারচ্যুত হলে তাঁর অধীনস্থ কোনো সেনাপতি বা সামান্য সৈনিকও তাঁকে হাসতে হাসতে হত্যা করবে—এবং তাঁর মৃতদেহের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। মগোপতান্-মগোপত্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছদ্ম-অনুগত্য প্রকাশ করে বললেন—"তাহলে, প্রভু, তস্পোন কি একেবারেই রক্তাম্বর-দের হাতে চলে যাবে? দেশকে যে ধ্বংস করে দেবে তারা। ধর্মাধর্মের কোনো বিভেদই থাকবে না যে।"

অনুত্তেজিত কণ্ঠে কোয়াত্ বললেন—"আপনি ধর্মাধর্মের বিভেদ নিয়ে বৃথাই ভাবছেন, মান্যবর। অনেক ধার্মিক মানুষেরই তো ধর্মস্থান বলতে আছে শুধু বেশ্যা ডোরার প্রকোষ্ঠ, আর পবিত্র নীর বলতে আছে তার উচ্ছিষ্ট সুবর্ণপাত্রের কয়েক ফোঁটা লাল মদ।"

ধর্মধীশের চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিহ্বা মুখের মধ্যেই শুকিয়ে গেল যেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই দুরবস্থা দেখে ফিচেল হাসলেন গোঁফের আড়ালে, তারপর বললেন—"আমি বলতে চাই যে সবকিছুই ব্যবস্থা অনুযায়ী হওয়া উচিত। লুটেরাদের হাতে সব ক্ষমতা দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া, রাজকীয় আধিকারিক ছাড়া অন্য কারোর উপর এ-সব ব্যবস্থার ভার…"

—"লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যখন মারা যাচ্ছিল, তখন আপনার অধীনস্থ আধিকারিকরা সেই বুভুক্ষুদের জীবনরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল? আপনি চুপ করে আছেন, কারণ আপনি জানেন যে নিজেদের ধনসম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি ছাড়া তারা কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। আর আপনি সবকিছু জেনেও দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও, আমাকে জানাননি কিছু। আজ বড় লুটেরার ভয় ঢুকে গেছে আপনাদের সকলের মনে, তাই নয়? যারা এই প্রাসাদ-দুর্গ বানিয়েছে, যারা কালীনকার [কার্পেট নির্মাতা], যাদের রেশম ও মখমলের সূক্ষ্ম কাজ সারা বিশ্বে আদৃত, যারা আপনাদের ক্ষেতে ফসল ফলায়—তাদের আপনি লুটেরা বলছেন? মনের গভীরে নেমে দেখুন তো, লুটেরা তারা, না আপনার আধিকারিক বা আপনারা সকলে।"

শাহেনশাহকে তাঁর দরবারের লোকেরা কখনও এতটা উত্তেজিত হতে দেখেনি, এত কটু কথাও শোনেনি তাঁর মুখে। সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কোয়াত্ ক্রমশ শান্ত হন।

—"আপনারা মজদকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সেটাও অসত্য।"

এক তরুণ ক্ষত্রিয় বলে উঠলেন—"রক্তাম্বর সম্প্রদায়ের লোক খাদ্য লুট করছে, এটা সর্বৈব মিথ্যা প্রচার, মাননীয় কোয়াত্। তারা খাদ্যবণ্টন করছে ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত সুব্যবস্থিত রূপে। কোথাও কোনো বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেনি। বরং তাদের দেখে আপনার আধিকারিদেরই শেখা উচিত, কিভাবে হাজার-হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।"

—"আপনি কে, তরুণ?"

—"আমি ইতিহাস চর্চা করে থাকি, মহান্ কোয়াত্। আপনার দাস।"

—"আপনি জনসাধারণের মনের কথা জানেন?"

—"হ্যাঁ, জানি, কোয়াত্। আজ জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ভাবনা নেই বললেই চলে। সাধারণ মানুষ আজ ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে সর্বজনীন স্বার্থের কথা ভাবতে শিখেছে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এ এক আশ্চর্য ঘটনা, এবং সে-জন্যে ধন্যবাদ দিতে হবে মহান্ অন্তরজাগরকে আর আমাদের প্রিয় কোয়াত্কে।"

ধর্মাধীশ তরুণের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"এ সমস্ত যাদু, মায়াজাল। মজদক্ নিজে মহাপাপী, এবার সে দেশের যুবকদেরও মায়াজালে ফাঁসিয়ে নিচ্ছে। এবার শুরু হবে আকামেনুর রাজত্ব।"

কোয়াত্ মৃদু হাসলেন। ধর্মাধীশ, অস্পাহপত্, সামন্ত ও শ্রেষ্ঠীদের উপর একে একে নজর ফিরালেন। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো শোনা গেল—

—"হয়ত। হয়ত আকামেনুর-ই রাজত্ব স্থাপন হবে এই প্রিয় জন্মভূমিতে আমার। আকামেনু-র প্রতিভূদের তো দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। যদি,

আমি হেরেই যাই, এমন কি অন্তরজাগরও হেরে যান; বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধুর স্বপ্ন তো কোনোদিন হারিয়ে যাবে না চিরতরে। তাই লড়াই করা ভালো। লড়তে পারা ভালো।"

সহসা কোয়াত্ উঠে দাঁড়ালেন। ঘোষকের প্রতীক্ষা না করেই বলে উঠলেন—"বরখাস্ত!" এবং কারোর দিকে দৃকপাত না করে দরবার ছেড়ে চলে গেলেন। উপস্থিত সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকলো। ধর্মাধীশ ও অস্পাহপত্ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

শীত ঋতু এখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে। তিগ্রা নদী প্রস্থে এখন আগের মতো স্ফীত নয়। তবু তার মাঝখানের প্রবহমান জলধারা খরস্রোতা। সারাটা দিন ধরে পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাতের সময় ততটা ঠাণ্ডা পড়েনি, কারণ বাতাস তখন থমকে গিয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বরফের আস্তরণ গলতে শুরু করে, বইতে থাকে হিমশীতল হাওয়া। পথঘাট এখন কর্দমাক্ত। হু হু বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে তম্পোন নগরের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে নিজের নিজের ছাদের নীচে।

দুর্গ-প্রাসাদের অন্তঃপুর সংলগ্ন বিশাল শাহেনশাহী ভোজগৃহ। তার চতুর্দিকে সুরম্য উদ্যান। পথগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো। সামনের আঙিনাটি শ্বেতপাথের অচ্ছাদিত। তুষারপাত হয়েছিল এখানেও, বাগিচার পথগুলি ও আঙিনা এখনো ভিজে ভিজে রয়েছে, কিন্তু কোথাও কাদার চিহ্নমাত্র নেই।

প্রাসাদের ঘরে ঘরে জ্বলছে পিতলের তাওয়ায় কাঠকয়লার আগুন। প্রাসাদের বাসিন্দারা পোশাকের উপরে পরে আছে উলের আজানুলম্বিত আলখাল্লা। শীতের হিমেল হাওয়া তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। এখন ফুল ফোটার সময় নয়, তবু আজ প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে সৌরভের সমারোহ। ফুল না ফুটুক তম্পোনে, বা নিকটবর্তী দেহাতে, বিশাল এই সাম্রাজ্যে কোথাও না কোথাও তো আজ বসন্ত! আর যে সাম্রাজ্যে ঘোড়ার ডাকপ্রথা দু-দিনের মধ্যে তিনশ' মাইল দূরের খবর দেওয়া-নেওয়া করে সেখানে বসন্তের ফুলবন তুলে আনা এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়।

অন্তঃপুর ও ভোজগৃহের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে দীর্ঘ এক বর্ণাঢ্য অলিন্দ, যার পুরো বিস্তার জুড়ে একধারে রয়েছে শাহী রন্ধনশালা। জায়গাটি নানা ব্যঞ্জনের মধুর গন্ধে আমোদিত। জলপাই তেলে প্রস্তুত উষ্ণ মাংস, শীতল মাংস, পক্ষী-মাংস, মেষ-মাংস, বাছুরের মাংস সোনার থালায় আলাদা সাজানো রয়েছে। অন্যদিকে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে সিরকার সঙ্গে মাখামাখি করা কবুতর, তিতির, হাঁসের ভাজা মাংস। বাতাবরণে ভাসছে বাসমতী চালের সুগন্ধী ভাতের ঘ্রাণ। ঝলসানো মাংসের সোঁদা সোঁদা গন্ধে জল এসে যায় জিভে। শুধু ইরানী খাদ্য নয়, দেশ বিদেশের নানা সুখাদ্য, যার মধ্যে ইতালীয়-গ্রীক-খুরাসানী-চীনা-ভারতীয় সবই খুঁজলে পাওয়া যাবে, পংক্তিবদ্ধ করে সাজানো হচ্ছে। মধু ও ক্ষীর দিয়ে তৈরী দেহাতী পিঠেও আছে সে তালিকায়। স্ফটিক-নির্মিত পানাধারে রাখা আছে কঙ্গ-অরঙ্গ-মার্ভ-আলবন্দ-আসুদ ও কপিশ-প্রদেশের প্রসিদ্ধ রক্তিমাভ-সোনালি-শ্বেতাভ মদিরা। সারিবদ্ধ অসংখ্য রত্নখচিত সোনার পানপাত্রের প্রত্যেকটির উপরে শাহী প্রতীকচিহ্ন উৎকীর্ণ করা আছে। অপ্সরাতুল্য অন্তঃপুরিকার দল ভোজন-বেদীর চতুর্দিকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত।

মহারাণী সম্বিকা তাদের দলনেত্রী। উৎকৃষ্ট পান-ভোজনের সঙ্গে সুন্দরী নারীর এক অদৃশ্য যোগাযোগের কথা অনেক কবিই লিখেছেন। রন্ধনশালাও যে প্রমীলা-রাজ্যের মতো মনোহারি হতে পারে, তা আজকের এই দৃশ্য না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন। আমি, এই কাহিনীর লিপিকার, যে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম তা কল্পনানির্ভর। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্যই জানেন যে, কল্পনা বাস্তবের মোকাবিলা করতে অক্ষম।

ভোজন-বেদী সাজানোর কাজ শেষ হবার ঠিক কয়েক পল পরেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করলেন শাহেনশাহ কোয়াত্। সমস্ত অন্তঃপুরিকা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে অভিবাদন জানালো তাঁকে। কিন্তু কোয়াতের দৃষ্টি যেন সুদূরে নিবদ্ধ, তাঁর মন যেন অন্য কোনো চিন্তায় মশগুল। মহারাণী এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরাতে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন, চারিদিকে নজর বুলোতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়লো ভোজন-বেদীর উপর। এই বিপুল আয়োজন দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন—"আমার পনীর-পালং-এর সব্জি আর যবের রুটি আছে তো?" সম্বিকা শাহের হাত চেপে ধরলেন আরো জোরে, মধুর হেসে বললেন—"শুধু শাক আর যবের রুটি! অনেকদিন ঐ-সবই তো খেয়েছেন আপনি। এখন আর তার দরকার নেই। আজ আপনার রাজ্যে একটি মানুষও ভুখা নয়। অঢেল খাদ্য আছে সকলের ঘরে। তাই এই বিপুল আয়োজন, পাতেখ্-শাহ। যে খাদ্যে আপনি অভ্যস্ত ছিলেন, এখানে তার বাড়তি কিছু নেই। আজ এ-সব খাদ্য গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।"

—"সে আমি জানি, সম্বিকা। দোষ যদি থাকতো কোনো, এত আয়োজন কখনোই করতে না তুমি। কিন্তু আবার ভাবছি, নতুন করে অপচয়ের পথে ফিরে যাচ্ছি না তো আমরা!"

—"না, খতা! রন্ধনশিল্পীরা আজ অনেক মাস পরে সুযোগ পেয়েছে ভালো-মন্দ রান্না-বান্না করবার। তাই আর-না, আর-না বলতে বলতেও কয়েকটা পদ তারা বেশীই করে ফেলেছে। তাছাড়া, আজকের ভোজসভায় আসছেন অন্তরজাগর মজদক্!"

—"মজদক্! তিনি আসছেন? কী সৌভাগ্য! আর কী আশ্চর্য! আজ সারাটা বিকেল-সন্ধ্যা আমি তাঁরই কথা ভেবেছি!"

—"উনি কিন্তু আমিষভোজন করেন না, মদ্যপানেও ঘোর অরুচি তাঁর।"

—"তাহলে এত আয়োজন কেন করলে, রাণী? তিনি যা-কিছু অপছন্দ করেন, আমরাও না-হয় সে-সব থেকে নিবৃত্ত থাকতাম!"

—"অন্তরজাগর এ-দেশের খাদ্য-অভ্যাস সম্পর্কে অনবহিত নন, প্রভু! আর তিনি মোটেই নিজের পছন্দ-অপছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেবারও পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, তাঁর সঙ্গে আসছেন বীর সিয়াবকুশ্ এবং মিত্রবর্মা।"

—"আহা, সেই সিংহ-হৃদয় তরুণ সিয়াবকুশ্! কিন্তু, মিত্রবর্মা কে?"

—"ভুলে গিয়েছিলাম তাঁর কথা আপনাকে জানাতে। মিত্রবর্মা ভারতের এক রাজকুমার, অন্তরজাগরের প্রিয় সাথী। তিনি অবশ্য এখন আর রাজকুমার নন, সবকিছু ত্যাগ করে পর্যটকের জীবনযাপন করেছেন, এবং বর্তমানে অন্তর-জাগরের পন্থাবলম্বী হয়েছেন। মিত্রবর্মা ভারতীয় হলেও তাঁর মা ছিলেন নাহাবন্তের কারেন-পহলব বংশের মেয়ে। দেখুন, ওই তাঁরা আসছেন।"

তিনজন অতিথি ভোজগৃহে প্রবেশ করলেন। রক্তাম্বর অন্তরজাগর এগিয়ে এলেন ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে। তাঁর পিছনে দু-জন দীর্ঘকায় তরুণ। একজন গৌরবর্ণ, তাঁর দাড়ি রেশমের মতো উজ্জ্বল ও কালো, অন্য যুবকটির শরীর অধিকতর পেশীবহুল, চোখ স্বপ্নিল গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল। কোয়াত্ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। অতিথিরা সম্ভবত তাঁকে অভিবাদন জানাবার শিষ্টাচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোয়াত্ সে সুযোগ তাঁদের দিলেন না। সম্বিক্ সকলকে নির্দিষ্ট আসনে মুখোমুখি বসালেন। এক-এক করে মদিরার চষক [পানপাত্র] ও থালি সাজানো হতে লাগলো।

অন্তরজাগর ও তাঁর সঙ্গীদের ভোজনের দিকে ততটা লক্ষ্য ছিল না, যতটা ছিল আলাপ-আলোচনার দিকে। অন্তরজাগর প্রাসাদের ভোজসভায় হাজির হয়েছেন, এ আনন্দ কোয়াত্কে উচ্ছল করে তুলেছিল। তিনি মজদক্কে উদ্দেশ করে বললেন—"অন্তরজাগর! বহুদিন আমি অন্ধ ছিলাম, আপনিই আলো দেখিয়ে আমার চোখ ফুটিয়েছেন। লোকে বলে আপনি নাকি ধর্মদ্রোহী, অথচ আমি আপনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি প্রকৃত দেরেস্তদীনের [সদ্ধর্মিতা] রূপ।"

—"কি বললেন, কোয়াত্? দেরেস্তদীন! আপনি কি জানেন যে আমাদের পয়গম্বর মানী প্রবর্তিত পন্থার নাম দেরেস্তদীন?"

—"মানী বেদীন [ধর্মদ্রোহী]। প্রসিদ্ধ চিত্রকার মানী?"

—"হ্যাঁ। তবে তিনি বেদীন নন, দেরেস্তদীন। সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করবার জন্য এ-দেশে পুরোহিতকুল এবং বিদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকের দল তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়েছিল। দু-শ' পনেরো বছর আগে তিগ্রা নদীর তীরে, মসন নগরে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফাতক হামদানী, মা ছিলেন অশ্কানী [পার্থিয়ান] রাজকুমারী। মানী জগৎসংসারের সেবা-কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, নিজের ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসের সমস্ত উপকরণকে তিনি বর্জন করেছিলেন।"

—"আরও বলুন তাঁর সম্বন্ধে। কোন ধর্মে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কি তাঁর ধর্ম-নীতি।"

—"জন্মসূত্রে মানী ছিলেন জরথুস্ত্রী। জরাথুস্ত্র-কে তিনি ত্যাগ করেননি কখনও। তাঁকে মানী পয়গম্বর রূপে স্বীকার করতেন। কিন্তু অপরাপর ধর্ম-গুলির প্রতি কখনও কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি বলতেন—

প্রত্যেক যুগেই ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, মানুষের মধ্যে সত্য-ন্যায়-সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কখনো তিনি আসেন ভারতের শাক্যমুনি বুদ্ধের নাম গ্রহণ করে, কখনো ইরানে আসেন স্পিতাম জরাথুস্ত্র নামে, আবার পশ্চিমদেশে যীশুখৃষ্ট রূপে। মানী ছিলেন তাঁর যুগের পয়গম্বর, আমরা তাঁরই ভাবধারা ও নীতির অনুগামী।"

—"এ-সব জানা ছিল না আমার। মাঝে মাঝে নিজের উপরেই বড় ক্ষোভ হয়, এত কম জানি বলে। নেকে আমাকে বলেছে, যে বামদাত্-পুত্র মজদক্ নতুন এক ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। হোক না কেন নতুন, সেই ধর্মই তো আমার চোখের সামনে থেকে আঁধারের পর্দাটাকে সরিয়েছে।"

—"না, কোয়াত্! এটা কোনো নতুন ধর্ম নয়! মানী অপ্রকট হবার পরে আরো অনেক মহাপুরুষ তাঁর ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, সেই ভাবধারাকে আরো সুসংস্কৃত করেছেন, যুক্তিগ্রাহ্য করেছেন। আমাদের দেশেরই ঋষি বাভন্দক্, যাঁকে দ্বিতীয় জরাথুস্ত্র বলা হয়, ইতালীর পীসা নগরে জন্মেছিলেন। মানীর ভাবধারা তিনি প্রচার করেছিলেন সারাটা রোম রাজ্যে। তাতে তিনি নিজস্ব কিছু ধারণার সংযোজনও করেছিলেন। যেমন, তাঁর মতে, ধর্ম শুধুমাত্র পরলোকের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। ধর্মের প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে যার সুফল মানুষ পাবে ইহলোকে, তার জীবনকালেই। এইভাবেই ধর্ম বা নীতিভাবনা মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যাবে।"

—"ধর্মের প্রয়োগের কথা বললেন আপনি, কিন্তু ধর্ম যখন কোনো বস্তু-বিশেষ নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ কোন মাধ্যমে হওয়া সম্ভব?"

—"কেন? প্রেমই সেই মাধ্যম, যে প্রেমের কথা বলেছিলেন ভারতের ঋষি বুদ্ধ!"

—'শাক্যমুনি বুদ্ধের নাম শুনেছিলাম সেই ছেলেবেলায়, যখন আমি কেদারীয় রাজধানী ভরক্শা-তে আমার ভগ্নীপতির আশ্রয়ে বাস করতাম।"

—"কেদারী বংশের [শ্বেত-হূন] রাজত্ব ভারতের সীমানার মধ্যেও অনেক-দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কেদারী রাজ্যেও বৌদ্ধের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আমাদেরই মতো রক্তবস্ত্র ধারণ করে, এবং জীবে-দয়া ও পারস্পরিক প্রেমভাবের প্রচার করে।"

—"অথচ, জানেন, আমাকে মগোপতু বলেছিলেন যে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুগামী-রা বগ্-কে [ঈশ্বর] মানে না!"

—"বুদ্ধ এবং তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে বন্ধু মিত্রবর্মা আমার থেকে বেশী জানেন। আমি শুধু এ-টুকুই জানি যে, প্রাণিজগতের মধ্যে মৈত্রী-ভাবের সংরক্ষণ, দুঃখীজনের প্রতি করুণা এবং দুষ্টজনের প্রতি উপেক্ষার ভাব বজায়

রেখে নিজের মনকে সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখা বৌদ্ধদের অবশ্যকর্তব্য বলে জ্ঞাত। মিত্রবর্মা, আমি কি ভুল কিছু বললাম?"

মিত্রবর্মা এতক্ষণ চুপচাপ অন্তরজাগর ও কোয়াত্-এর কথোপকথন শুনছিলেন, আর মাঝেমাঝে থালি থেকে দু-এক গ্রাস মুখে তুলছিলেন। অনায়াসভাবে শুদ্ধ তম্পোনী ভাষায় [তৎকালীন ইরানী নাগরিকদের পরিশীলিত ভাষা] তিনি বললেন—"হ্যাঁ, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের ভাবনা যারা শেখে, তাদের শিশুদের প্রারম্ভিক রেখা টানা শেখার মতোই ঈশ্বরতত্ত্ব বা দেব-দেবী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করতে হয়…"

—"শিশুকাল থেকেই?"

—"হ্যাঁ, কারণ বয়স ও জ্ঞান বাড়বার পর থেকে কাল্পনিক ভগবান বা দেব-দেবীর কোনো প্রয়োজন থাকে না। তখন প্রয়োজন হয় মানুষের অন্দর-মহলের সৎপুরুষকে জাগিয়ে তুলবার। সেই সৎপুরুষই মানুষের মনে মৈত্রী-করুণা-সহিষ্ণুতা ও সেবাভাবের সঞ্চার করেন।"

পান-ভোজন কিছুক্ষণ চলতে থাকে নীরবে। সম্বিক্ মিত্রবর্মার থালি পানপাত্র ভরে দিতে গেলে তিনি হাত দিয়ে চষক ঢেকে নেন। সিয়াবক্শ্ যদিও আমিষ আহার গ্রহণ করছিলেন, অন্তরজাগরের মতো তিনিও মদিরা পানে বিরত ছিলেন। মিত্রবর্মা দু-তিন পাত্র মদিরা পান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আচরণে তার কোনো প্রভাবই পড়েনি। অন্তরজাগর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন —"শাক্যমুনি সাম্যকে মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়বস্তু ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর উপদেশ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ বহু দূরদেশে বিস্তার পায়। সাম্য-ভাবনার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন যে 'তোমার-আমার' ভাবটিকে পরিহার করতে হবে, এবং সমস্ত ধন-সম্পত্তি হবে সংঘের, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ মানুষের চিত্তকে মলিন করে। আমাদের পয়গম্বর মানী যখন ভারতে গিয়েছিলেন, তখন সম্ভবত সেখানে সম্রাট ধর্মাশোকের রাজত্বকাল, বা তার কাছাকাছি সময়। বুদ্ধের ভাবাদর্শ মানীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে মানী দেরেস্তদীনেও গুজীদ্গান [ভিক্ষু] সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন, যাঁরা পরিবারহীন হবেন, যাঁদের কাছে একদিনের অধিক খাদ্য ও একবছরব্যাপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক সঞ্চিত থাকবে না।"

কোয়াত্ খুবই মন দিয়ে শুনছিলেন অন্তরজাগরের কথা। পলকে পলকে তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তিত হচ্ছিল। তিনি অনেকটা যেন আপনমনেই বলে উঠলেন—"আপনি তো বলছেন 'তোমার-আমার' পরিহার করবার কথা, ভিক্ষু-জীবন অনুসরণ করবার কথা—কিন্তু এ-সব তাত্ত্বিক বোধ জনসাধারণের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়।" অন্তরজাগর হাসলেন—"সে-রকম মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সঠিকভাবে বোঝাতে পারলে

মানুষের বোধায়ত্ত হবে না, এমন কিছুই জগৎ-সংসারে নেই। নতুন সামাজিক গড়নের কথা বলতে গেলে বাধা তো আসবেই, তাতে হতাশ হলে চলবে কেন! এটাই তো তার প্রকৃত সময়। তাছাড়া, মানুষের দুঃখ দূর করবার অন্য কোনো উপায়ও তো নেই।"

—"কিন্তু, আমি শুনেছি, আপনি নাকি বৈবাহিক সম্বন্ধকে মানেন না?"

—"ভুল শুনেছেন। আমি স্ত্রী-কে সম্পত্তি বলে মানি না। মিত্রবর্মা, তুমিই বলে দাও এ-বিষয়ে কি আমাদের মতামত।"

মিত্রবর্মা বিন্দুমাত্র সংকোচ করলেন না। স্পষ্ট ভাষায় বললেন—"স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কবিধি সমস্ত দেশে সমস্ত কালে একই রকম থাকে না। দেখুন না, আপনার যিনি পত্নী, তিনিই আবার জন্মসূত্রে আপনার সহোদরা ভগিনী। আমাদের দেশে, ভারতে, ভ্রাতা-ভগিনীর এ-ধরনের সম্পর্ক রীতি-বিরুদ্ধ। আবার আমাদেরই বিশাল ভারতের হিমালয় অঞ্চলে [হিমবন্ত বা হিমাচল] ছ-সাতজন ভাই থাকলেও তাদের পত্নী থাকেন একজনই।" সিয়াবক্‌শ্‌ ভোজ-গৃহে প্রবেশ করার পর থেকে একেবারেই নীরব ছিলেন। বৎতর মাংসের একটি নরম হাড় একধারে সরিয়ে রেখে তিনি সহসা বললেন—"আর আমাদের মুলুকে একজন পুরুষ অনায়াসে চারজন পত্নীর স্বামী হতে পারে।" অন্তরজাগর হাসলেন। বড় মায়াবী সেই হাসি তাঁর—"তাই তো কথায় বলে, একদেশে যা নিষিদ্ধ, তাই অন্যদেশে বিহিত।" মিত্রবর্মা বলতে লাগলেন—"যবনদেশীয় প্লাতোন [প্লেটো] বলেছিলেন যে শুধু মহান্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে চললেই 'আমার সম্পত্তি—তোমার সম্পত্তি' জাতীয় ভাব নর-নারীর মন থেকে মুছে যেতে পারে না। স্ত্রী-জাতি সম্পর্কেও যদি এমন ভাব থাকে 'এ আমার—ও তোমার', তাহলে সেই ভাব পরবর্তী প্রজন্মের বালক বালিকার মধ্যেও অবশ্যই সঞ্চারিত হবে। এরূপ হতে বাধ্য, কারণ জন্মবধি শিশুরা দেখবে তাদের বাবা মা-রা বলছেন 'এ-আমার, ও-তোমার'। তাই জগৎ-কল্যাণের কাজে মানুষ তখনই তার পূর্ণ-শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারে, যখন তার সন্তান-সম্পর্কে নিজস্বতাবোধ থাকবে না।" কোয়াত্‌ এ-কথা শুনে যেন খুব অবাক হয়ে গেলেন—"তার মানে প্লাতোন বলতে চেয়েছিলেন যে জগৎ-সংসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকবে না। সবাই সাধু-সাধ্বী হয়ে যাবে।"

অন্তরজাগর বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। প্লাতোন ছিলেন ব্যবহারিক দার্শনিক। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে নারী-পুরুষ জিতেন্দ্রিয় তখনই হতে পারে, যখন সে একাকী জীবনযাপন করবে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কের বিরোধিতা তিনি করেননি, কিন্তু উচ্চতর জীবনাদর্শের কথা তিনি বলে গেছেন সারাটা জীবন, এবং নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে 'তোমার-আমার' ভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সেও তিনি চেয়েছিলেন।"

মিত্রবর্মা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—"ধারণাটা প্রচলিত লোকাচার-

বিরোধী। কিন্তু জন-মঙ্গলের এটাই শ্রেষ্ঠ পথ। ইরানে যখন মজদক্ এ-ধরনের ভাবাদর্শ প্রচার করছেন তখন মানুষ যে তাঁকে ভুল বুঝবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম থেকেই যদি ইরানী সমাজে ভগিনী-বিবাহ, ভাগিনেয়ী-বিবাহ, ভ্রাতুষ্পুত্রী-বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন না থাকতো, তাহলে হয়ত অন্তরজাগরের উপদেশ ইরানী জনসাধারণ সহজে মেনে নিতে পারতো। বর্তমান অবস্থার উপর তাঁর বিশেষ জোরও নেই। অবশ্যই তিনি এটাকেই, অর্থাৎ বিবাহ-প্রথাকেই, দেশের বা জাতির প্রথমতম সমস্যা মনে করেন না। মানুষের প্রধান সমস্যা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সর্বদেশে সর্বকালে।"

—"আমি, আপনাদের মজদক্ মানুষের অনেক সমস্যার কয়েকটাকে মাত্র দূর করতে চেষ্টা করছি। পরবর্তীকালে অন্য কেউ আসবেন, তিনি আরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও বহু সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু বর্তমানকে উপেক্ষা করে স্বর্ণময় অতীত বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা বাতুলতারই নামান্তর। প্রতিটি সংকটময় যুগেই ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকবে, তাই বর্তমান কালই আমাদের প্রধান উপজীব্য বিষয়। অথচ, সমকালীন মানুষ পরস্পরকে সবসময়েই অবিশ্বাস করে। তাই আমাদের সংঘর্ষে কে যোগ দেবে সেটাই বড় কথা।"

শাহেনশাহ কোয়াত্ পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অন্তরজাগরের দিকে। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন যে এই মানুষটি আর যাই করুন না কেন, মিথ্যা বলছেন না।

—"আপনার পথে আমি থাকবো, অন্তরজাগর। তাতে আমার রাজত্ব যায় তো যাক। আমার সম্বিকাও একই পথের পন্থী, তাই না সম্বিকা?"

—"হ্যাঁ, অন্তরজাগরের কৃপায় আমি চিরকাল আপনার পাশাপাশি থাকবো, যতদিন আপনি সৎপথে থাকবেন।"

—"সম্বিকা, যতদিন তুমি পাশে থাকবে, আমি অন্তরজাগরের কৃপায় নতুন দীপ জ্বালাবার চেষ্টা করবো। বাধা তো সামনে আসবেই, কিন্তু এমন কোনো বাধা আছে কি যা জয় করা যায় না?"

মিত্রবর্মা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন, অথচ এমনই সংযত সেই ভারতীয় পুরুষটি যে উচ্ছ্বাসের কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল না—

—"ঠিকই বলেছেন, কোয়াত্। কোনো বাধাই সামনের পথ আটকে রাখতে পারে না। তাই বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় আমাদের নিজেদের সবকিছু সঁপে দিতে হবে।"

এক নীরব প্রতীক্ষায় কোয়াতের ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠলো। সেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের উপর কোমল হাতের স্পর্শ রাখলেন মহারাণী সম্বিক্।

ভোজগৃহ জুড়ে তখন খুশীর জোয়ার বয়ে চলেছে।

এখন বসন্ত। তিগ্রা এখন আগের মতোই প্রশস্ত। তার দু-কূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে অপ্রতিহত খর জলধারা। শীতের হিমশীতল আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতি এখন আনন্দের নবসাজে সজ্জিত। হুফারত উপত্যকায় গাছে গাছে কোমল কিশলয়ের সম্ভার। যে-দিকে তাকানো যায় গাঢ় হরিৎক্ষেত্র জাজিম বিছিয়ে রেখেছে। ঘাসের বুকে নাম-না-জানা অগণিত ফুলের কেয়ারী নানা রঙের নকশা এঁকে রেখেছে। অথচ, প্রকৃতির এই মনোহর পরিবর্তনের লেশমাত্র চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তম্পোন নগরের কোনো গলি বা রাজপথে, নাগরিকদের কারো বাড়ির আঙিনায়। যে-সব দোকান আগে দেশ-বিদেশের পণ্য সামগ্রী ও ক্রেতাদের ভিড়ে সারাটা দিনমান জমজমাট থাকতো, আজ সেখানে শুধু মাছির ভনভনানি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গলি বা রাজপথ দিয়ে যারা চলাচল করছে, তাদের অধিকাংশই বল্লমধারী সান্ত্রী। সাধারণ মানুষও যে যাতায়াত করছে না এমন নয়। কিন্তু তাদের চলাফেরায় দেখা যাচ্ছে এক ধরনের সন্ত্রস্ত হাবভাব। পরস্পর পরিচিত হলেও কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। শুধু অর্থপূর্ণ নীরব দৃষ্টিবিনিময় করে যে-যার নিজের গন্তব্যের দিকে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে। চতুর্দিকে এত ফুল, এত আগন্তুক যাযাবর পাখিদের ডাকাডাকি, তবু বাতাবরণে এক ধরনের ভীতিকর থমথমে ভাব বিদ্যমান। কিন্তু নগরের গলি ও রাজপথে যে নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, নগরবাসীদের ঘরে ঘরে কিন্তু ঠিক তেমনটি দেখা যাবে না। সেখানে সর্বত্র বিরাজ করছে উৎকণ্ঠা, চাপা উত্তেজনা। মানুষগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেনি কোথাও, কোনো ঘরে। খুবই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে তারা পরস্পরের সঙ্গে নীচু গলায় আলাপ-আলোচনায় মগ্ন। কোনো আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখামাত্র মৌনতা অবলম্বন করছে তারা।

বলাশাবাদ অঞ্চলে একটি অতি সাধারণ গৃহের আসবাবহীন কামরায় চারজন বসে আছে। স্পষ্ট বোঝা যায় খুবই উৎসুকভাবে তারা কারো প্রতীক্ষা করছে। তাদের মুখে গভীর দুশ্চিন্তার বলিরেখা আঁকিবুকি কেটে গেছে। কিছুক্ষণ পরে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ সন্তর্পণে কামরায় প্রবেশ করলো। তার পরনে বস্ত্র বলতে কয়েকটা ছেঁড়া ন্যাকরার ফালি মাত্র। মানুষটি একবার চকিতে পিছনে আঙিনার দিকে দৃষ্টিপাত করে দরজা বন্ধ করে দিলো। যে লোকগুলি প্রতীক্ষা করছিল তাদের মধ্যে একজন উতলা হয়ে প্রশ্ন করল—"মেহরদাত্‌! বলো, কি হলো? প্রাণ সুরক্ষিত আছে তো?"

—"হ্যাঁ, আমাদের যিনি প্রাণ, তিনি সুরক্ষিত আছেন। তম্পোন নগর থেকে অনেক দূরে পেঁছে গেছেন তিনি। এত দূরে, যেখান পর্যন্ত মগোপতানু-মগোপতু বা গজুনস্পদাতু-এর [রাজকীয় সামরিক বিভাগের গোয়েন্দা বাহিনী

ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান পরিচালক] সাঁড়াশীর মতো বাহু পেঁছাতে পারবে না। সিয়াবক্‌শ্‌-ও তাঁর সঙ্গে আছেন।"

চারজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ মানুষটি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো —"সিয়াবক্‌শ্‌ সঙ্গে আছেন সেটাই মস্ত ভরসার কথা। আর তম্পোনের কী খবর ? এখনো কি চলছে গণহত্যা, এখনো কি নগরের পথে পথে রক্ত-নদী বইছে ? ঘরে ঘরে এখনো কি শোনা যাচ্ছে শিশু ও নারীকণ্ঠের আর্তরোল ?"

—"রাজধানী মৃত্যুপুরীর মতো নীরব হয়ে গেছে। ভীষণ তুফান, ভয়ংকর ঝঞ্ঝার পরে সমুদ্র যেমন নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে যায়। সারা নগর জুড়ে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র রাজকীয় সান্ত্রীবাহিনী।"

বৃদ্ধ মানুষটি বলে উঠলেন—"কিন্তু তারা তো ইরানী নয়। ইরানী হলে তারা কি ভাই-বিরাদরের শরীরে অস্ত্রাঘাত করতো ?"

—"ঠিকই বলেছেন আপনি। ইরানী অজাতান থেকে শুরু করে পাঁচ-হাজারী মনসবপত্‌ [মনসবদার] কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে ভাই-এর রক্তে হাত কলঙ্কিত করেনি। অনেক সময় জোর করেই হত্যা করানো হয়েছে তাদের দিয়ে। তারপর আবার প্রাথমিক অবাধ্যতার কারণে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে। এখন যারা সান্ত্রী বা সৈনিক, তাদের অধিকাংশই খুরাসানী বা অন্য কোনো সীমান্তবর্তী এলাকার লোক। গজ্‌নস্পদাতের এই ভাড়াটে সৈন্যের দল ইরানী ভাষায় কথা বলতে পারে না, বুঝতেও পারে না। এখন তারা অবশ্য অনেকটা শান্ত।"

—"অনেক রক্তের মূল্য নিয়ে তবে শান্ত, তাই নয়, মেহরদাত্‌ ?"

—"হ্যাঁ, অনেক রক্তের মূল্য! আকালের দিনগুলির প্রতিশোধ বেশ ভালোভাবেই নিয়েছে ওরা। অন্তরজাগরের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত মানুষকেও ওরা কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে তিগ্রার স্রোতে। যারা অন্নাগার থেকে খাদ্য বণ্টনের কাজে নিযুক্ত ছিল, তারা ও তাদের পরিবার আজ নিশ্চিহ্ন বললেই চলে। তিগ্রায় এখন অনেক জল, প্রবল স্রোত। নয়ত মৃতদেহের স্তূপ পড়ে থাকতো নগরের পথে পথে।"

—"পবিত্র তিগ্রা নদীতে শবদেহ ভাসানো তো অত্যন্ত গর্হিত ধর্মবিরোধী আচরণ!"

মেহরদাত্‌ অনেক দুঃখেও হাসলো—"আপনার বয়স তো অনেক হলো, কাকা। দুনিয়াদারি আপনাকে শেখাতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবু আপনিই ভেবে বলুন দেখি, দীন-বেদীনের ফারাক কি ওরা করেছে কখনো ? ওদের কাছে তো স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ মাত্রেই দীন [ধর্ম], বাকী সব বেদীন [অধর্ম]। আমাদের মহামান্য ধর্মাধীশ স্বয়ং আদেশ দিয়েছিলেন যেন লাশগুলিকে তিগ্রার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাতে না কি মৃতপাপীদের

আত্মা শান্তি পাবে। পাঁচদিনব্যাপী অবিরাম হত্যালীলা বন্ধ হয়ে এখনো চব্বিশ ঘণ্টা কাটেনি।"

বৃদ্ধ মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর কটিদেশে লুকানো একটি ক্ষুরধার ছোরা বের করে আঙুল দিয়ে তার ধার পরীক্ষা করতে করতে বললো—"বুঝলে শোরমুজ, আমরা শুধু পড়ে পড়ে মারই খেলাম। অথচ, আমাদের সম্মিলিত বাহুবল কি কম ছিল?" শোরমুজ মাথা নেড়ে সায় দিলো —"হ্যাঁ, কাকা। এ-কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি যে আমাদের হিংসার পথকে পরিহার করতে বলেছেন। এমন-কি বীর সিয়াবকুশ্-ও তাঁকে বলেছিলেন 'রক্তপাতের হিসাব রক্ত দিয়েই চুকিয়ে দেওয়া যাক। কিন্তু অন্তর-জাগর কিছুতেই রাজী হননি।"

মেহরদাত্ বলে উঠলেন—"সেই রাজী না হওয়াই প্রমাণ করে তিনি কত বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল। রক্তপাতের হিসাব রক্ত দিয়েই চুকানোর ব্যাপারটা শুনতে বা ভাবতে ভালো লাগে, কিন্তু সত্যি সত্যিই কি কিছু করতে পারতাম আমরা? প্রথমত, আমাদের উপর আক্রমণটা ওরা করলো আকস্মিকভাবে। দ্বিতীয়ত, কেদারীয় রাজা, রোমান কাইজার ও হুনদের খাগান [রাষ্ট্র-প্রধান] সকলেই পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে একসঙ্গে এ-দেশের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন শাহেনশাহ মগোপতান-মগোপত্ এবং তার খুনী চেলা-চামুণ্ডাদের সমর্থন ও সৈনিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করে দিলো। মহামান্য কোয়াতের কনিষ্ঠ জামাস্প-কে সিংহাসনে বসানো হয়েছে, এ-খবর আপনারা সকলেই জানেন। জামাস্প মানুষ হিসাবে খারাপ নন, কিন্তু মানসিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। ধর্মাধীশ বা গজ্নস্পদাতের মতো ধুরন্ধর লোকদের পাল্লা সামলে কতদিন টিকে থাকবেন তিনি? ওরা তো এখন থেকেই বলতে শুরু করেছে—কত হাতী গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!"

বৃদ্ধ মানুষটি আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—"ঠিকই বলেছ, ভাই মেহরদাত্! এ-রকম সময়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা নিছক হঠকারিতা হতো! শুনলাম, আজ নাকি শাহেনশাহী দরবার কক্ষে বিরাট উৎসব ছিল?"

—"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে মহামান্য কোয়াতের দরবারে যেমন ভিড় হতো, আজ তার অর্ধেকও ছিল না। আজ সাধারণ মানুষদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি সভা-কক্ষে। জামাস্প আজ ধর্মাধীশ ও গজ্নস্পদাতের নির্দেশে তাদের খুনী চেলা-চামুণ্ডাদের নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।"

"ছিঃ!"—শব্দটি চারজনের মুখ থেকে প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল।

মেহরদাত্ বলল—"উপায় ছিল না অন্য কোনো। জামাস্প তো সিংহাসন পেয়েছেন শুধু সাসানী বংশের দ্বিতীয় রাজপুত্র হিসাবে। মেহরান শাপুর এবং কারেন-পহলব জরমেহর সোখা দু-জনেই সাসানী-বংশীয় রাজকুমার।

মেহরান আবার ধর্মাধীশ এবং গজ্‌নস্পদাতের প্রধান সহচর। ওদিকে জরমেহত্র-কে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো হয়েছে। কাজেই রাজবংশেও রক্তপাত আসন্ন মনে হচ্ছে।"

—"তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাজবংশীয়রা সাধারণত স্বজন হন্তারক হয়েই থাকে। ওটা রক্তের দোষ।"

—"এখন আমাদের আগামী কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে দেখতে হবে বন্দী কোয়াতের ভাগ্যে কি ঘটে। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জামাস্প, গজ্‌নস্পদাত-কে নখ্‌বীর [বীরোত্তম, পুরুষোত্তম] খেতাব দিয়েছেন। মহামান্য কোয়াত্‌-কে আজই দরবার-কক্ষে পেশ করা হতো। কিন্তু গজ্‌নস্পদাত, ধর্মাধীশ, শাপুর এবং প্রধানমন্ত্রী সকলেই চাইছিলেন যে, আগে ঘটার উৎসবটা শেষ হোক, ততদিনে কোয়াত্‌ কারাগৃহে বাস করতে থাকুন, পালাবার তো পথ নেই কোনো। তারপর না হয় তাকে নিয়ে বিচারের প্রহসন করা যাবে।"

—"মেহরদাত্‌, দরবারে আজ কি কি হলো বলো। ওরা এখনো যখন তোমাকে সন্দেহ করেনি, গোয়েন্দা বিভাগের এবং প্রাসাদরক্ষী দলের একজন উচ্চ আধিকারিক হিসাবে তুমি নিশ্চয় উপস্থিত ছিলে সেখানে।"

—"ছিলাম বৈকি। সামন্ত-শ্রেষ্ঠীদের মুখে আজ হাসির বানভাসি নেমেছে। জামাস্প-এর সামনে বহু মূল্যবান সামগ্রী ভেট হিসাবে পেশ করা হয়েছে. সেনাপতিরা দিয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতির ঘোড়া-দমস্কে [দামাস্কাস] নির্মিত তরবারি ও বর্শা, ধনিকরা সভাগৃহের কালীন সোনা ও রুপোয় হলুদ ও সাদা করে দিয়েছে, কবিরা গেয়েছে প্রশস্তিগীত।

—"শেষ পর্যন্ত জাতির অলংকার, উচ্চ শিক্ষিত কবিরা…"

—"রাজতন্ত্রে কবিদের অন্য আর কি কাজ। তাদের পানপাত্র যারা সব সময়ে পূর্ণ করে দেয়, তাদেরই প্রশস্তি-গীত গায় তারা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জামাস্প-এর অন্তঃপুরে একদিনে এক হাজারেরও উপর সুন্দরী নারী আমদানী করা হয়েছে। ডোরা, গুলনাজ ইত্যাদি রাজনর্তকী, যারা প্রকৃতপক্ষে বেশ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়—তাদের জন্য আলাদা মহল তৈরীর আদেশ হয়েছে। আখতারমারান-এর [জ্যোতিষী] দল বিশাল এক একটি পাঁজিকা খুলে হাত-পা নেড়ে সম্ভব-অসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"

—"অন্তরজাগরের সময় থেকে সাম্য ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই জ্যোতিষী ও পুরোহিত গোষ্ঠীর রুজি-রোজগারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। আর এখন তো রাজত্ব ওদেরই।"

—"প্রায় তাই। আবার প্রাসাদরক্ষীদের মধ্যে পুরানো সকলকে বাতিল করে গজ্‌নস্পদাতের লোকজনকে রাখা হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এখন গজ্‌নস্পদাত। তারই আদেশে বিগত তিনদিন তিনরাত্রি যাবত প্রাসাদে সঙ্গীতানুষ্ঠান চলছে অবিরাম। আর

চলবে নাই বা কেন? এতদিনের কাঁটা, এতদিনের প্রধান শত্রুর যে পতন ঘটেছে।"

বৃদ্ধ মানুষটি সজল চোখে পরিহাস করবার চেষ্টা করলো—"হ্যাঁ, কি করে ভুলবে ওরা যে কোয়াত্-কে বন্দী করতে পারলেও আসল মানুষটিকে তারা করায়ত্ত করতে পারেনি, তাঁর প্রমুখ দুই শিষ্য—সিয়াবক্শ্ ও মিত্রবর্মা—তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে। নোংরা শেয়ালের দল, মনে রেখো, তোমাদেরও একদিন লেজ গুটোতে হবে, খুব শিগ্গিরই!"

রক্তের হোলিখেলা শেষ হলে চলেছিল তুমুল পান-ভোজন ও উৎসবের সিলসিলা। ক্রমে সে-সব উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এলো। হত্যালীলায় যাদের উপর অস্ত্রাঘাত করা সম্ভব হয়নি, এবারে শুরু হলো তাদের নিয়ে বিচার-প্রহসন। দাতবর [ন্যায়াধীশ] উচ্চ ন্যায়াসন থেকে ঘোর অন্যায় রায় দিতে থাকলেন। সাক্ষীরা ঈশ্বরের নামে, জরাথুস্তের নামে, জাতি-ধর্মের সংরক্ষক সকল দিব্যাত্মাদের নামে শপথ নিয়ে বলতে লাগলো যে পীরোজ-পুত্র কোয়াত্ বেদীন, তার গুরু মজদক্ বেদীন। তারা দেশবাসী ও ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যারা সেই বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তা করেছে, তারাও বিশ্বাসঘাতক, তারাও নীচ ও ঘৃণ্য ধর্মদ্রোহী। ইত্যাদি।

একদিকে যখন দাতবরগোষ্ঠী ন্যায়কে বাজারের বেশ্যার মতো দুয়ারে দুয়ারে নাচিয়ে ফিরছে, আসুন আমরা দাতবরান-দাতবরের [মহা ন্যায়াধীশ] এজলাসে প্রবেশ করি, কারণ সেখানে কাঠগড়ার ভিতরে অভিযুক্ত আসামী আজ ভূতপূর্ব শাহেনশাহ মহামান্য কোয়াত্।

মগোপতান্-মগোপত্ ভূতপূর্ব শাহেনশাহ-র বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে তা ভীষণ। সাসানী বংশ মূলত পুরোহিত বংশ। সেই বংশের সন্তান, উপরন্তু রাজ্যের শাহেনশাহ হয়েও কোয়াত্ ধর্মদ্রোহী বামদাত-পুত্র মজদক্-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। ধর্মের এ হেন দুশমনকে শায়েস্তা করবার একটি মাত্র বিধি—প্রাণদণ্ড। কিন্তু প্রাণদণ্ডের নির্ণয় ন্যায়াধীশ ঘোষণামাত্র করতে পারেন, তাকে কার্যকরী করবার আদেশ দিতে পারেন একমাত্র শাহেনশাহ স্বয়ং। গজ্নস্পদাত একান্তে বর্তমান শাহেনশাহ জামাস্প-কে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবার সলাহ্ দিয়েছেন, অনুনয় করেছেন, এমনকি হুম্‌কিও দিয়েছেন। যতই হোক, কোয়াত্ শাহেনশাহ জামাস্প-এর অগ্রজ। তাই তিনি বস্তুত ক্রীড়নক হলেও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে পারেননি। অগত্যা ধর্মাধীশ ও গজ্নস্পদাত চেষ্টা করলেন যাতে কোয়াতের চোখদুটি জ্বলন্ত শলাকার দ্বারা উৎপাটিত করার আদেশ জারি করা যায়। জামাস্প রাজী হলেন না তাতেও। শেয়ালের দল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। জামাস্প অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রকট করলেন কিভাবে দেশের বহিঃশত্রু আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সামান্যতম সুযোগ পেলেই যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। তাই তিনি দেশের স্বার্থে কোয়াত্‌কে অনুশ্বর্ত বা বিস্মৃতি-কারাগারে পাঠাবার আদেশ দিলেন।

মন্ত্রিমন্ডলী, সামন্ত-শ্রেষ্ঠী এ-আদেশে খুশীই হলো. কারণ তারা জানতো যে বন্দী একবার বিস্মৃতি-কারাগারে প্রবেশ করেছে, তাকে আর কোনোদিন নীল আকাশের নীচে দেখা যায়নি।

কোয়াত্‌ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিস্পৃহতার সঙ্গে বিস্মৃতি-কারাবাসের আদেশ শুনলেন। কোনো বিকৃতি দেখা গেল না তাঁর মুখমণ্ডলে। তিনি শুধু ভাবছিলেন : বিগত বারো বছরের রাজত্বকালে কেবল শেষ দুটি বছরই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে মানসিক শান্তিতে, সেদিন থেকে যেদিন তিনি অন্তরজাগরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। খেদ কোনো ছিল না তাঁর মনে, শুধু ভাবছিলেন দু-বছর সময়টা বড় কম ছিল। আর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, অকামেনুর এইসব ছোট-খাটো অনুচরদের এত শক্তি কখনও থাকতে পারে না যে তারা ঈশ্বরের অনুগামীদের উপর চিরকাল রাজত্ব করবে। যে আগুন অন্তরজাগর ইরানের বুকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, ধর্মাধীশ ও গজ্‌নস্পদাত যত চেষ্টাই করুন, তা কখনও নিভে যাবে না, নিভে যেতে পারে না।

সেই অটল বিশ্বাসের দিব্য জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে কোয়াত্‌ অন্ধকার বিস্মৃতি-কারার দিকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু মানুষের যাত্রা কখনও আলো থেকে আঁধারের দিকে নয়, সে সর্বদাই ক্ষুদ্রতর আলো থেকে বৃহত্তর, বৃহত্তর থেকে সর্বত্রব্যাপী আলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

সূর্যাস্ত যখন প্রায় হতে চলেছে, এমন সময় দু-জন স্ত্রী-পুরুষ ইস্তখার নগরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চললো। স্ত্রীলোকটির পরিধানে ছিল নানা রঙের সুতির সূক্ষ্ম কাজ করা ঢিলেঢালা অথচ গলা-বন্ধ কাঁচুলী, আঁটোসাঁটো কোমরবন্ধের নীচে ঝুলছিল গাঢ় হলুদ ঘাঘরা। দেহাতী বা পাহাড়ী তরুণীরা সাধারণত যে ধরনের কঙ্কন ও গলার হার পরে থাকে সে-ধরনেরই অলঙ্কার শোভা পাচ্ছিল স্ত্রী-টির সুডৌল হাতে ও মরালসদৃশ কণ্ঠ-দেশে। তবু সে যে ইরানী নয় তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার কাঁচুলীর চিকনের কাজে, ঘাঘরার বনাবটে, চুলের কবরীবন্ধে, মাথায় বাঁধা রুমালের উপর ছাপানো চিত্রকারিতা দেখে। নগরে প্রবেশ করবার পরক্ষণেই চার-পাঁচজন প্রৌঢ় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য, নিবাস-প্রদেশ ইত্যাদি প্রশ্ন করেছিল। স্ত্রী-টির সঙ্গে যে দীর্ঘদেহী পুরুষটি নীরবে পথ চলছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে লোকগুলিকে দু-একটি পরিচিত নাম বলে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সরে যায়, যাবার আগে অভিবাদন জানাতে ভোলে না। অবশ্য নগরে নবাগত কাউকে প্রশ্ন করবার অধিকার তাদের ছিল, কারণ ইস্তখার দেবী ভগবতী অনাহিতার পবিত্র ধাম, ইরান বা পারস্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান, যেখানে সুদূর সৌগ্দ দেশ থেকে ভারতের সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এলাকার ভক্তজন দেবীর দর্শন-পূজনের জন্য দলে দলে এসে ভিড় করতো, এবং লোকগুলি ছিল সেই সর্বজন-মান্য তীর্থস্থানের কাক, বা পাণ্ডা। ইস্তখার নগরের অর্থনীতি মূলত নির্ভর-শীল ছিল দর্শনার্থী যাত্রীদের যাতায়াতের উপর, এবং পাণ্ডা বা তীর্থ-পুরোহিত সম্প্রদায় যাত্রীদের যথাসম্ভব সেবা ও সহায়তার কাজকে নিজেদের কর্তব্য মনে করতো।

ইস্তখার শুধুমাত্র বিখ্যাত তীর্থস্থানই ছিল না। এই নগর ছিল ইরানের দ্বিতীয় রাজধানী। প্রায় পৌনে তিন-শ' বছর আগে [২৮শে এপ্রিল, ২২৪ খৃঃ] অত্রখত্র [প্রথম আর্দেশীর] সাসানী রাজবংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন এই ইস্তখার নগরে। দেবী অনাহিতার সম্মুখে রাজকীয় শপথবাক্য উচ্চারণ করে তবে তিনি মাথায় রাজমুকুট ধারণ করেছিলেন। প্রথম আর্দেশীর-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত সাসানী বংশের প্রত্যেক শাহেনশাহর অভিষেক হয়েছে ইস্তখার নগরে, দেবী অনাহিতার মন্দিরে। বস্তুত, এই নিয়মটি পালন না করলে কোনো সাসানী শাসককে বাস্তবিক শাহেনশাহ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো না।

যাত্রী দু-জন পাথরে বাঁধানো রাজপথ ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাদের দ্বিধাহীন চলন দেখে মনে হয় নগরের মানচিত্র সম্পর্কে তারা যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল। ক্রমশ চন্দন-ধূপধুনা-গুগ্‌গুল ইত্যাদির মিলিত সুগন্ধে

বাতাবরণ ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। প্রধান অগ্নিশালা ও দেবী অনাহিতার মন্দির বেশী দূরে নয়, তা এই সুগন্ধ থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে নগরের পথে। দিকে দিকে দীপ জ্বলে উঠছে দু-একটি করে। স্ত্রী-পুরুষ রাজপথ ছেড়ে প্রবেশ করলো একটি সংকীর্ণ গলিপথে। কিছুক্ষণ ধীর গতিতে চলে তারা এসে দাঁড়ালো একটি দরজার সামনে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তারপর স্ত্রীলোকটির নীরব সম্মতি পেয়ে পুরুষটি দরজায় করাঘাত করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রদীপ হাতে এক বৃদ্ধা দরজা খুলে দিলো। অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষকে সামনে দেখেও বৃদ্ধা এমনই কলকণ্ঠে তাদের স্বাগত জানালো, যেন তারা কতদিনের চেনা-জানা আপনজন। ইস্তখারের তীর্থ-পুরোহিতদের গৃহে অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ও তাদের স্বাগত জানানো কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যাত্রীদের কাছে মালপত্র বিশেষ ছিল না। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুবই ক্লান্ত তারা। বৃদ্ধা অতিথিদের একটি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন কামরায় নিয়ে গেল। যেতে যেতে অসংখ্য প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিল যে যাত্রীরা সৌগ্দ প্রদেশের বাসিন্দা। যাত্রীরাও কথাপ্রসঙ্গে সৌগ্দ-এর নানা স্থানের উল্লেখ করলো। আইবর-এর শাসক গুর্গীন, অনেক মগোপত ও আতরপতের নামও তাদের মুখ থেকে শোনা গেল। সৌগ্দ, আইবর ও আর্মেনিয়া পাশাপাশি অবস্থিত রাজ্য। বৃদ্ধার পক্ষে রাজ্যগুলির ধর্মাধীশ ও পুরোহিতদের সকলকে আলাদা আলাদাভাবে চেনা বা জানা সম্ভব ছিল না। তবে যাত্রীদের মুখে বিভিন্ন মগোপতের নাম শুনে সে প্রসন্ন হলো।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধার ডাক শুনে দীনক-নাম্নী এক দাসী ঘরে প্রবেশ করে অতিথিদের অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত অভ্যস্ত হাতে বিছানা তৈরী করে দিলো, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম জল ও অন্যান্য জরুরী ব্যবস্থাদি করে ফেলল। যাত্রীরা সুস্থির হয়ে বসলে তাদের সামনে সাজানো হলো থরে থরে আপেল, আঙ্গুরগুচ্ছ, বেদানা—এবং পানপাত্র ও লাল মদের সুরাহী।

বৃদ্ধা সহজে অতিথিদের ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। তাছাড়া সকল সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মতো সেও কথা বলতে ভালোবাসে। খুব কাজের কথা নয়, এক কথায়, যাকে গাল-গপ্পো বলা হয় সেইসব।

—"তোমরা বাছা আসতে দেরি করে ফেলেছ! মাসখানেক আগে এলে দেখতে পেতে একটা উৎসবের মতো উৎসব! আমাদের ধর্মসংরক্ষক মহামান্য শাহেনশাহ জামাস্প অভিষেক ও রাজ-বরণ উৎসবে এসেছিলেন এখানে! মুকুট ধারণ করলেন ভগবতী অনাহিতার মন্দিরে! সে কি জাঁক-জমক সারাটা ইস্তখার জুড়ে! দেশের বড় বড় সব সামন্ত শ্রেষ্ঠী সেনাপতিই তখন এখানে! মগোপতান্-মগোপত্ গুলনাজ, আহা কি স্বর্গীয় রূপ তার, পিছনে পিছনে বরহর-অত্রোপত্-মারেস্পন্দান-মিত্রোবরাজ-মিত্রোক্‌বিদ্ সমস্ত ছোট-বড় ধর্মাধীশ

ও পুরোহিত চলেছেন, যেন চাঁদ আর চারিদিকে সব নক্ষত্র! নগরের যে কি শোভা তখন সে আর কি বলব! শুধু ফুলই ফুল পথের মোড়ে মোড়ে, চন্দনের সুবাস! কে যেন বলছিল, দূরে ছাই, নামটা ভুলে গেলাম, হ্যাঁ তা সে যেই হোক —বলে কি না ভারত থেকে দশ হাজার মন চন্দন কাঠ আনানো হয়েছে! আমি তো বাছা বাপের কালে এমন তাজ্জব কথা শুনিনি! বলে কি না দশ হাজার! তা হতেও পারে, কি বলো বাপু, যতই হোক রাজ-রাজড়ার ব্যাপার-স্যাপার—সে আমাদের মতো ছাঁদা-বাঁধা পূজারী কি করে বুঝতে পারে, অ্যাঁ? আহা, এমন দিন কি আর বারবার আসে! তাই বলছিলাম, তোমরা বাছা মাসখানেক আগে এলেই ভালো করতে!"

বৃদ্ধাটি অতিথিদের কথা বলবার কোনো সুযোগ দেবে বলে মনে হচ্ছিল না। এবার সে সম্ভবত দম নেবার জন্য একটু থামলো। পুরুষটি উত্তর দিলো— "আমরা অভিষেক উৎসবের আগেই পেঁছাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনেক দূরের পথ, উপরন্তু রাস্তা খারাপ। ওদিকে আবার হম্‌দান শহরে পেঁছে অনাহিতা-দুখ্‌ত [দুখ্‌ত=কন্যা] অসুস্থ হয়ে পড়লো ··"

—"বাঃ, অনাহিতা-দুখ্‌ত! খুব সুন্দর নাম তো! রূপ ও নামের এমন মিল বড় একটা দেখা যায় না। তাহলে তোমাদের দেশেও দেবী অনাহিতাকে ভক্তিটক্তি করা হয়?"

মেয়েটি এতক্ষণ কথা বলেনি। মধুর হেসে জবাব দিলো—"দেবীর প্রসাদেই জন্মেছিলাম আমি। তাই এই নাম। ভাই মাহপত্‌-এর পর মা-বাবার আর ছেলেপুলে হয়নি, তাই তাঁরা দেবীর দুয়ারে মিন্নত [মানত] করেছিলেন। তারপরেই আমি এলাম। কোনোদিন দর্শন হয়নি দেবীর, ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয়ে ওঠেনি···"

—"তোর ইচ্ছায় কি হবে রে বেটি! তিনি ডাক না দিলে কেউ কি আর তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে? তুই ভাগ্যবতী, তাই ডাক পেয়েছিস। সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে তোর, কোনো চিন্তা করিস না! দুঃখ তো আমার বোনঝি ফর্জিন্দাকে নিয়ে! মাত্র বিশ ক্রোশ দূরে গ্রাম, বয়স হয়ে গেল এক কুড়ি পাঁচ, এখন অবধি দেবী দর্শন করে উঠতে পারলো না! অবিশ্বাস, শুধু অবিশ্বাস! যত নষ্টের গোড়া হলো ঐ বেদীন বামদাত্‌-পুত্র মজদক্‌! ফর্জিন্দা শুনলাম সেই বেদীন হতভাগাটার চেলী হয়েছে! আরে দ্যাখ্‌ মাগী দ্যাখ্‌! সেই কোন সোগ্দ দেশ থেকে কোহ্‌কাফের খতরনাক পাহাড় ডিঙিয়ে তোর চেয়ে বয়েসে ছোট একটা মেয়ে দেবী দর্শন করতে চলে এসেছে, আর তুই কি না কোথাকার এক বিধর্মী শয়তানের আরাধনা করছিস! মরন হয় না তোর! গতরে পোকা পড়ে না, হারামজাদী!"

দুঃখে ক্ষোভে বুড়ি প্রায় কেঁদে ফেলে। অতিথিরা তার কথাবার্তার এক ধরনের গ্রামীণ রস পাচ্ছিল, তাই তারা বিরক্ত বোধ করেনি। বৃদ্ধার সামনেই

পান-ভোজন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ব্যাপারে অত কথার মধ্যেও বুড়ি যে সজাগ দৃষ্টি রাখেনি, এমনও নয়। মাহ্‌পতের কাছ থেকে জানা গেল যে সে বুড়ির ছেলে আতুরফর্ণবগ্‌কে ব্যক্তিগতভাবে চেনে। আতুরফর্ণ বগ্‌দের [দেবী-দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ পুরোহিত, যারা দেবতাতুল্য শ্রদ্ধেয়] মধ্যে এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে সে ইস্তখার নগরে নেই, সপরিবারে রাজধানী তস্পোনে গেছে। শাহেনশাহ জামাস্প-এর অভিষেক উৎসবে যে সমস্ত আতরপত্‌ ও পুরোহিত দান-দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা অধিকাংশই এখন বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় রাজ-দরবারে হাজিরা দিচ্ছে। তাই আতুরফর্ণ এক সপ্তাহের মধ্যে ইস্তখারে ফিরে আসুক, বা এক বছর পরে, তাতে কিছু আসে-যায় না। অতিথিরা যতদিন থাকতে চান থাকবেন, দাসী দীনক তাদের খিদ্‌মতের জন্য সর্বদাই হাজির থাকবে। থাকা-খাওয়ার দক্ষিণা তো নামমাত্র, সেটা সপ্তাহান্তে দিতে পারলে উত্তম, মাসকাবারী দিলেও অসুবিধা নেই।

অনাহিতা-কন্যার আগ্রহে বৃদ্ধা জানালো যে ইস্তখারের মতো পবিত্র তীর্থ-ভূমিকেও ধর্মদ্রোহী মজদক্‌পন্থীরা তাদের উপস্থিতির দ্বারা অপবিত্র করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। শাহেনশাহ কোয়াত্‌ নিজেই যখন পশুদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন, তখন সাধারণ প্রজাদের চারিত্রিক বিচলন হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, আরো বছর-কয়েক কোয়াত্‌ যদি মসনদে থাকতেন, তাহলে দেবী অনাহিতার রোষে ইস্তখার অবশ্যই ছারখার হয়ে যেত। তবে কি না ধর্ম সর্বদাই অধর্মের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। তাই দেবী মন্দিরে আবার আগের মতোই যাত্রীদের আগমন হচ্ছে, ভগবতী অনাহিতা কিছুকাল নিদ্রিত থেকে আবার জেগে উঠেছেন।

অনাহিতা-কন্যা ধীর কণ্ঠে বললো—"ভালোই হয়েছে যে ধর্মদ্রোহী মজদক্‌ আজ ইরান থেকে বিতাড়িত। শুনেছি সে না কি কুকুরের মতো এখানে-ওখানে আশ্রয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।"

বৃদ্ধা এ-কথা শুনে খুবই খুশী হলো—"তোকে আমি বলে দিলাম মেয়ে, ভগবতী অনাহিতার আশ্রয় যে ত্যাগ করেছে, এই দুনিয়ায় কোথাও তার ঠাঁই জুটবে না। মরুক হারামজাদা। দেশে আবার আনন্দের দিন ফিরে এসেছে, সেটাই বড় কথা। মজদকের উস্কানির ফলেই দাস-দাসীরা হুকুম মানতো না, পালিয়ে যেত। মনে হয়েছিল প্রভু-ভৃত্য বলে দুটো আলাদা শ্রেণীই বুঝি থাকবে না। চাকর থাকবে না, বান্দা-বাঁদী থাকবে না। দেবী অনাহিতার অশেষ কৃপা, কষ্টের দিন দূর হয়েছে। আজ অন্তত ইস্তখার নগরে একজনও মজদক্‌পন্থী অবশিষ্ট নেই।"

—"সবাই চলে গেছে?"

—"আরে মেয়ে, যেতে দিলে তবে তো যাবে। এক মাস পর্যন্ত দেবী মন্দিরের প্রতিটি প্রবেশদ্বারে হাজার হাজার মজদক্‌পন্থীদের কাটা মুণ্ডু টাঙিয়ে

রাখা হয়েছিল। পাপী বিধর্মীদের উচিত শাস্তি, তাই নয়? এই তো সংতাহ-খানেক আগে সেগুলোকে নামিয়ে গুঁড়ো করে ফসলের ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো! আজ মজদকের নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করে না ভয়ে। কে যেন সেদিন বলছিল, তাকে না কি কির্মানে কারা যেন মেরে ফেলেছে। হে ভগবতী, যেই বলুক, খবরটা যেন সত্যি হয়। দেশে শয়তানের অনুচর যত কমে যায়, ততই মঙ্গল!"

অতিথিরা চুপ করে গেল। বৃদ্ধা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল—"আমি বড় বেশী বকবক করছি, তাই নয়? সকলেই বলে আমি বড্ডো বেশী বকি। তোমাদের কষ্ট দিলাম।"

—"না, না! এটা কোনো কষ্টের ব্যাপারই নয়!"

—"তোমরা ক্লান্ত। আজকের রাতটা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে মন্দিরে যেও। তাহলে আমি এখন যাই।"

বৃদ্ধা চলে যায়। যাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে নীরব দৃষ্টি বিনিময় করে। আজ রাত্রে তাদের ঘুম আসবে কি আসবে না, সে আমরা জানি না।

ইস্তখারের অনাহিতা মন্দির কবে তৈরী হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলবে যে, যখন পৃথিবী-আকাশ জল-স্থল সৃষ্টি হয়নি, তখন থেকেই দেবী এখানে বিরাজ করছেন। মন্দিরের আয়-ব্যয় ও সম্পদ-বৈভবের উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র হবে, কারণ বিগত পৌনে তিন-শ' বছর যাবত সাসানী সাম্রাজ্যের যাবতীয় সম্পদকে দেবী অনাহিতারই সম্পদ জ্ঞান করা হয়েছে। অত্রখত্র বা প্রথম আর্দেশীর-এর পিতা পাপক ছিলেন দেবীর প্রধান পূজারী। প্রথম আর্দেশীর সাম্রাজ্য স্থাপনের অনেক আগে থেকেই দেবী অনাহিতা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পুরোহিত বংশ যখন তৎকালীন পার্থিয়ান সম্রাট বংশকে পরাজিত করে সাসানী সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করলো, তখন সাধারণ মানুষের মতো প্রথম আর্দেশীর, প্রথম শাপুর, বেহরাম প্রভৃতি সাসানী সম্রাটরা সকলেই মেনে নিয়েছিলেন যে দেবীর প্রসাদেই সাসানীদের এত বাড়বাড়ন্ত। মধ্য এশিয়ার মন্দিরগুলির মধ্যে বিশালতা, শিল্পসৌন্দর্য ও বৈভবে অনাহিতাধাম ক্রমে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে। মন্দিরের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্য-বৃদ্ধির কাজে প্রত্যেক সাসানী সম্রাট তাঁর পূর্বজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন। মন্দিরটি তাই আজকের দুনিয়ায় সম্ভবত বৃহত্তম উন্মুক্ত ধনাগারে পরিণত হতে পেরেছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ যেন একটি পৃথক নগর। দেবী দর্শনের জন্য মূল প্রকোষ্ঠে প্রবেশের আগে দর্শনপ্রার্থীরা পথাম দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়, যাতে তাদের অপবিত্র নিশ্বাস দেবীর শরীর স্পর্শ না করে। ব্যবস্থাপক ও দ্বাররক্ষীরা সকলেই যুবতী নারী, এবং তারা সকলেই আপাদমস্তক নিরাবরণ, কারণ দেবী

স্বয়ং দিগম্বরী। কিন্তু মূর্তিটি যবন [গ্রীক] ভাস্কর্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। এমনই কোনো ভাবুক শিল্পমন ও শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয় মূর্তিকারের ছেনি-হাতুড়ির অন্তরালে কাজ করেছিল, অচ্ছোদ সরোবরের ঢেউ-এর ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল মর্মরগাত্রে যে, সেই নগ্ন মূর্তি দর্শকের মনে কোনোপ্রকার পাপচিন্তা বা বিকার আনতে পারে না। সেই ভাস্করের নাম কেউ জানে না, তবে নিশ্চিতরূপেই তিনি ছিলেন এক মহান্ কলাকার।

—"কিন্তু এই পরিচারিকা ও রক্ষীদল সকলে নগ্ন কেন? পুরুষটি প্রশ্ন করলো।

—"দেব নগ্ন, তাই হয়ত সেবিকারাও নিরাবরণ। কিন্তু কি সুন্দর তারা সকলেই, তাই নয়? আলুলায়িত দীর্ঘ কেশভার, সুঠাম সুছাঁদ দেহবল্লরী, করুণ কোমল মুখভাব—দেখেছ?"

—"হ্যাঁ, তবে দেবী মূর্তি নগ্ন বলে সজীব সেবিকারাও সকলে নগ্ন থাকবে, এটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগছে। এটা অবশ্যই কোনো পুরুষ মগোপতের বিধান, এবং এর পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে সেটা কিন্তু ভাববার বিষয়।"

—"ব্যাখো, মাহপত—কয়েকটি লোক আড়চোখে নগ্ন নারী শরীরগুলিকে দেখছে, আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি-সব আলোচনা করছে। এভাবেই হয়ত শুরু হয়ে যায় ধর্মের নামে ব্যভিচার।"

—"নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের রসায়ন কাজ করে বলে শুনেছি। এক ভারতীয় বিদ্বান ব্যাপারটি একবার আমাকে বুঝিয়েছিলেন। সেটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাকে দোষ দেওয়া যায় না, নতুবা সৃষ্টিই লোপ পেয়ে যাবে। এখানে যা দেখছি, এই প্রদর্শনপরায়নতা, তাকে একেবারে কামগন্ধহীন ভাবতে পারছি না। এ-সব আচার থেকেই ক্রমশ মনে মালিন্য আসে, কদাচার শুরু হয়ে যায়।"

—"ধর্ম পতিত হয়ে যায়।"

—"না, প্রকৃত ধর্ম, যা আমাদের সর্বদা ধারণ করে থাকে, সে কখনও পতিত হয় না। ধর্মের নামে অনেক ধরনের আচার-ব্যবহার প্রচলিত হয়ে থাকে পৃথিবীর সব দেশেই। সেগুলির পিছনে যে যুক্তিজালই খাড়া করা হোক, মানুষের কামপ্রবৃত্তিকে তারা উস্কে দেয়, আর শুরু হয় ব্যক্তি থেকে সাম্প্রদায়িক ও তারপর সমূহ চরিত্রস্খলন। পতন একবার শুরু হলে সহজে সে থামতে চায় না। যেমন ধরো, ভারতে বহু মন্দিরে আমি দেখেছি নারী যোনির রূপ-রেখার মধ্যে প্রোথিত করা আছে বিশাল পুরুষ লিঙ্গ। হ্যাঁ, শরীরের অন্য কোনো অবয়ব নয়, শুধু প্রাকৃতিক রূপে উৎকীর্ণ করা যোনি ও লিঙ্গ! বলা হচ্ছে, সেগুলি না কি ফলনশীলতার প্রতীক। মেনে নিচ্ছি সে কথা, কিন্তু তাতে কি প্রকারান্তরে মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা পাশবিক প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে তাতিয়ে তোলা হচ্ছে না?"

দু-জনের অর্ঘ্য-অর্পণ ততক্ষণে হয়ে গেছে।. ঠিক সেই সময় যজমানদের সঙ্গে হাজির হলো বাড়িওয়ালী বৃদ্ধা ও দাসী দীনক। দু-জনের বাক্যস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। বৃদ্ধা সস্নেহে তাদের হাত ধরে নিয়ে গেল মূল বেদিকার একেবারে সামনে। তল্লীনভাবে সকলের মঙ্গলকামনা করলো, এবং তারই অনুরোধে স্বয়ং মন্দিরের হেরপত্ [মোহন্ত] স্তোত্রপাঠ করলেন।

প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেল মন্দির প্রদক্ষিণ করে বৃদ্ধার নির্দেশে স্থানে স্থানে ভেট চড়াতে। বৃদ্ধা বিশেষ বিশেষ স্থানগুলির মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণনা করছিল। স্ত্রী-পুরুষ ও অন্যান্য যজমানেরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেগুলি শুনছিল।

সন্ধ্যার পর দু-জন একান্তে বসে দিনমানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। বৃদ্ধা তখন নবাগত যজমানদের নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীটি আস্তে আস্তে চিন্তামগ্ন স্বরে বললো—"এ-সব দেখে আমার ধারণা হচ্ছে, মাহপত্, যে পুরোহিতগোষ্ঠী নিজেরা মুনাফা লুটবে বলে মন্দিরগুলোকে অধিকার করে বসে আছে, আর ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের মনের হীনতম প্রবৃত্তিগুলিকে খুঁচিয়ে দিয়ে তাদের বোকা বানাচ্ছে। এ এক বিশাল বেড়াজাল, এর থেকে নিস্তার নেই মানুষের।"

—"হয়ত নেই, তা বলে মানব-মুক্তির মধুর স্বপ্নকে আমরা তো অবহেলা করতে পারি না। তাছাড়া, এতটুকু দেখেই হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কি করে? ভারতের পুরোহিতগোষ্ঠীর কার্যকলাপ দেখলে তো তাহলে বোবা হয়ে যাবে তুমি। ধর্মের নামে যা-কিছু ভারতে চলে, পৃথিবীর ইতিহাসে সে অনাচার ভ্রষ্টাচারের কোনো নজির নেই। এখানে তো তবু আমাদের বুড়ির মতো, মন্দিরের মোহন্তের মতো অনেক সরল ও বিশ্বাসী মানুষ আছে। কিন্তু ভারতে? সেখানে সরলতা চাপা পড়েছে এক অচলায়তনের নীচে, বিশ্বাস হারিয়ে গেছে হিমালয়ের অজানা অচেনা মৃত্যুপুরীসম গিরিপথে। তাই এবার থেকে যখন কোনো ধর্মস্থানে যাবে, সেখানে ধর্ম খুঁজো না, খুঁজো ভাস্কর্য, শিল্পকৃতি। সে-সবের মধ্যেই আছে মানুষ, তার প্রকৃত চরিত্র। এখানে যেমন আছে গ্রীক ভাস্করের অমর ভাস্কর্যশিল্প—দেবী অনাহিতার মর্মর মূর্তি। মূর্তি আছে বলেই তাঁর দেবী মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ আছে। মূর্তি যেদিন নষ্ট হয়ে যাবে, দেবীরও সেদিন জাত মারা যাবে।"

পাঁচ মাস সময় পার হয়ে গেছে। যে দু-জন তীর্থযাত্রীকে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম ইস্তুখার নগরের সেই বৃদ্ধার বাড়িতে, তাদের আজ আমরা দেখতে পাবো নগরের একান্ত প্রান্তে অন্য এক বাগান বাড়িতে। এখন তারা আর বৃদ্ধার আশ্রয়ে থাকে না।

তাদের বর্তমান বাড়িটি সুসজ্জিত, এবং তার অবস্থান খুবই সুন্দর পরিবেশে। চারিদিকে ফল ও ফুলের বাগিচা। প্রচুর পরিমাণে জলের ব্যবস্থা। কামরাগুলি বড় এবং পরিচ্ছন্ন। বাড়িটি তস্পোনবাসী কোনো সামন্ত-প্রভুর, যে আবার বৃদ্ধার যজমান! বৃদ্ধার সহায়তা না পেলে যাত্রীদের পক্ষে এ-ধরনের বাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না। আলাদা বাড়ি যাত্রীদের দরকার ছিল, কারণ তারা যে ব্রত পালন করছে সে-জন্য এক বছর প্রত্যহ তাদের ভগবতী অনাহিতার দর্শন-পুজন করা আবশ্যক। বৃদ্ধাও দেখেছিল যে যাত্রীদের হাত বেশ দরাজ, তাই ছেলের হাতে তাদের তুলে না দিয়ে সে চেয়েছিল তারা যেন তারই যজমান থাকে। এ-ব্যাপারটাতে যাত্রীদেরও সায় ছিল মনে মনে। আলাদা বাড়িতে তারা অনেক বেশী নিশ্চিন্ত মনে আলাপ-আলোচনা করতে পারবে। তাছাড়া আতুরফর্ণবগ ও তার স্ত্রী-পুত্রাদি এসে পড়লে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে হবে, এবং যেহেতু যাত্রীরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় দেয়নি, যে কোনো সময়ে অভিজ্ঞ আতুরফর্ণের কাছে সেটা ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকবে। এইসব বিচার করে মাহপত ও অনাহিতা-কন্যা সুযোগ পাওয়া মাত্র এই বাড়িটি নিয়েছিল, মাসিক ভাড়া বেশ কিছুটা অধিক হওয়া সত্ত্বেও। অবশ্য ভাড়ার টাকা সেই প্রবাসী সামন্তপ্রভু পাচ্ছে, না বৃদ্ধা—সে-কথা বলা মুশকিল।

অনাহিতা-কন্যার পোশাকে-প্রসাধনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। সোগ্দ প্রদেশ থেকে আগত কিষাণ-কন্যার যে রূপ আমরা দেখেছিলাম, তাতে এখন নাগরিকতার রক্তিমাভ প্রলেপ পড়েছে। অবশ্য নাগরিকতার সংস্পর্শে এসে যে ধরনের কৃত্রিমতা সাধারণত সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আবিল করে থাকে, তার কোনো ছায়াপাত অনাহিতা-কন্যার চেহারায় দেখা যায় না। বরং এত প্রসাধনের বাহুল্য হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় সে যেন সুখী নয়, কোথায় যেন বিষাদের কাঁটা তার তরুণী-হৃদয়ের হরিষকে অহর্নিশ দংশন করে চলেছে। তাই তার মুখমণ্ডলে লালিমার আভাস দেখা গেলেও চোখ দুটি নিষ্প্রভ।

মাহপত আসে যায়। অনাহিতা-কন্যা এমনই তল্লীন থাকে কোনো গভীর চিন্তায় যে সে কিছু জানতে পারে না। মাহপত পুরুষ, তার মধ্যে পুরুষোচিত প্রফুল্লতার কোনো অভাব নেই। তাছাড়া সে অভিজ্ঞ, দুনিয়া চষে বেড়ানো মানুষ। মাঝে মাঝে সেই আশাবাদী প্রফুল্ল উপস্থিতিই যেন জাগিয়ে দেয়

তাকে। মৃদু স্মিত হাসি খেলে যায় অনাহিতা-কন্যার ঠোঁটে। অথচ যেন সে হৃদয়ের ভারকে শরীরে বহন করতে পারে না। তাই অনায়াসে সে তার মুখ লুকিয়ে ফেলে মাহপতের প্রশস্ত বক্ষপটে।

—"মন তো অধীর হতেই পারে, অনাহিতা! কিন্তু মনের চেহারাটা মুখে কেন ফুটে উঠবে?"

—"চেষ্টা তো করি প্রাণপণ, মাহ—কেন যে পারি না!"

—"সেটা তোমার দোষ নয়, অনাহিতা! দিল্ হী তো হ্যায়, ন সংগ ন খীস্ত! হৃদয়, হৃদয় শুধু, মর্মর নয়, পাথরও তো নয়!"

অনাহিতা-কন্যা জানে এখন ধৈর্য হারানোর সময় নয়। যে দায়িত্বভার নিয়ে তারা এগিয়েছে, তাতে সংযম ও ধৈর্য হারালে সব কিছু বিফলে যাবে। পাঁচ-পাঁচটা মাস কেটে গেছে ইস্তখার নগরে, কোনো নিশ্চিত পথের নিশানা পাওয়া যায়নি এখনো। কিন্তু মাহপত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে, পথ আছে, খুঁজে নেবার দেরি শুধু, আর মানুষ যখন হাল ছেড়ে দেয়, অসফল তো কেবল তখনই হয়। বছর খানেক হতে চললো এক ভয়ংকর ঘূর্ণিবাত্যার মুখোমুখি হয়েছিল তারা। মনে হয়েছিল তাদের অবস্থা যেন খড়কুটোর মতো আশ্রয়হীন, ঠিকানাহীন। তবু আজ মাহপতের মনে হয়, অচিন্তনীয় ক্ষতি তাদের হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একেবারে সমূহ সর্বনাশ হয়নি। সে জানে সর্বনাশ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ উদ্দেশ্য তাদের মহৎ। তাই যখন মাঝেমাঝেই অনাহিতা-কন্যা নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার প্রয়াসে মাহপতের বুকে মুখ লুকায়, সে তাকে আশ্বাস দেয়, সাহস দেয়—"ভেবো না, ভেবে ভেবে অমন আকুল হয়ে প'ড়ো না, অনাহিতা! দেখো তুমি, সফল আমরা হবোই! আমি স্বর্গে বিশ্বাস করি না, তবু বলছি—তোমার এই স্বর্গীয় রূপই হবে আমাদের সফলতার চাবিকাঠি!"

—"বড় ছোট মনে হয় নিজেকে মাঝে মাঝে…"

—"কেন ছোট মনে হয়? তুমি যা করতে চলেছ সে তো শুধু নিজের জন্য নয়! বহুজন হিতার্থে যে কাজ…"

—"না, তা নয়! এই যে প্রসাধনের বাহুল্য, পোশাক-পরিচ্ছদে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন প্রদর্শণপরায়ণতা, এ-সবের জন্যেই মনে মালিন্য আসে মাঝে-মাঝে। এটাও তো…"

—"কঠোর কর্তব্যকে সফল করতে হলে প্রাথমিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, অনাহিতা! ব্যক্তি হিসাবে তুমি কি করতে চলেছ সেটা বড় কথা নয়, বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অনেক মূল্যই মানুষকে দিতে হয়!"

—"পারব তো আমি?"

—"সে তো সময় এলে তখন বোঝা যাবে!"

—"আর কতদিন? আরও কত সময়?"

—"সময় এসে গেছে, অনাহিতা!"

—"তাহলে দেরি কিসের?"

—"আমাদের উপর তুফান এসেছিল প্রায় এক বছর আগে। ঝড় থেমে গেলেও সন্দেহের প্রবাহ কিন্তু চলছিল এতদিন। আমাদের বিপক্ষ এখন ক্রমশ নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ছে। ওরা ভাবছে আমরা শেষ হয়ে গেছি। অধিকাংশ মারা গেছে, বাকী যারা ছিল তারা আদর্শের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওরা জানে না আদর্শে অবিচল কত হাজার নর-নারী এই ইস্তখার নগরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমাদের ভাবধারা জনকল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবধারা। তাই সাময়িক কালের জন্য হয়ত তার গতিরোধ করা যায়, কিন্তু তার অন্তঃসলিলা স্রোত চিরকালই প্রবাহিত হতে থাকবে—এ-কথা ওরা বোঝে না। সময় এসে গেছে, অনাহিতা! ভবিষ্যৎ মানব সমাজের মুখ চেয়ে, আমাদের সকলের প্রিয় অন্তরজাগরের মুখ চেয়ে—তুমি অন্তত নিজের মনকে সংকুচিত ক'রো না। তাতে আমাদের সকলের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে!"

বাইরে বাগিচায় বৃদ্ধার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। অনাহিতা-কন্যা দ্রুত মাথায় রুমাল বেঁধে নেয়। তারপর তারা প্রাত্যহিক পুজো-অর্ঘ্য দেবার জন্য বৃদ্ধার সঙ্গে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়। বৃদ্ধার পিছনে পিছনে চলে একদল নবাগত দর্শনার্থী যজমান।

মন্দির থেকে ফিরবার পথে অনাহিতা-কন্যা ও মাহপত আবার একা হয়ে যায়। মাহপত ফিসফিস করে বলতে থাকে—"অন্তরজাগর সমস্ত প্রাচীন ভাব-ধারার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, তাই ধর্ম-ব্যবসায়ীদের এত বিরাগ। তিনি শ্রেণীভেদহীন সমাজগঠনের কথা বলেন, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে পদমর্যাদা প্রাপ্তির বিরুদ্ধে কথা বলেন—তাই তিনি ধর্মদ্রোহী। এ-সবই যে তাদের স্বার্থের প্রতিকূল ব্যাপার!"

—"হ্যাঁ, মাহপত। মহান্ অন্তরজাগর সাম্যের কথা বলেন, তিনি বলেন সবার উপরে স্থান মানুষের, মানব ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। এ-কথা তো শাক্যমুনি বুদ্ধ বলেছেন, যীশু বলেছেন ···"

—"যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল, আর ইরানের থেকেও জাতিবর্ণভেদের নোংরামি অনেক বেশী বুদ্ধের দেশ ভারতে আজও চলছে।"

—"মুক্তি নেই তাহলে?"

—"আছে, অবশ্যই আছে! অনেক পথ এখনো বাকী আছে চলার, অনেক পতন অনেক উত্থান আছে! তারপর মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে! ততদিন আগুনে জ্বলে জ্বলে মানুষের খাঁটি সোনা হবার পালা?"

—"মানবতাকে এখনো অনেক পথ চলতে হবে"—বিড়বিড় করে আপন মনেই বললো অনাহিতা-কন্যা। মাহপত শুনতে পেল।

হেসে সে জবাব দিলো—"আর প্রতিটি পতনের পর প্রতি যুগে একজন বুদ্ধ, একজন যীশু বা একজন অন্তরজাগর পতিত মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন, সাহায্যের ও সহানুভূতির হাত, যাতে সে উঠে দাঁড়াতে পারে।"

অনাহিতা হাসলো মাহপতের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যার বাতাস ফুলের গন্ধে তখন মদির হয়ে উঠেছে।

কারেন নদীর তীরে একটি ছোট্ট সরাইখানা। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনো ঘন হয়ে নেমে আসেনি। দিনভর চলে চলে ক্লান্ত পথচারীর দল একে একে জমায়েত হচ্ছে রাতের আশ্রয়ের জন্য। সামনের রাজপথটি সরাসরি তস্পোন ও ইস্তখারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে না। এটি প্রকৃতপক্ষে ভারত ও চীনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগসূত্র স্থাপনকারী 'রেশম পথের' [সিল্ক রুট] একটি অংশ। এ-পথে বণিকদেরই যাওয়া-আসা বেশী। সরাইখানার সামনেই একটি ছোট্ট জনবসতি আছে। ইরানের অধিকাংশ পার্বত্য অঞ্চলের মতো এই এলাকাটিও আদিগন্ত বৃক্ষ-বনস্পতি-শূন্য। কোথাও এক চিলতে শ্যামল ইশারা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি কারেন নদীর দু-ধারেও নয়, সেখানে শুধু বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে।

বড় মাপের বণিকেরা এই সরাইখানায় বড় একটা রাত্রিযাপন করে না। সাধারণত বড় ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ক্যারাভান থাকে, সঙ্গে থাকে অনেক দেহরক্ষী ও কর্মচারী, আর বাইজী ও নাচনীর হারেম—যাদের সংগ্রহ করা হয় যাত্রাপথের বিভিন্ন শহর থেকে, এক শহর থেকে অন্য শহর পর্যন্ত যাত্রাকালের কড়ারে। তাছাড়া, সেইসব বণিকেরা বড় শহরে রাত্রিযাপন করতেই বেশী পছন্দ করে, কারণ সে-সব স্থানে পানভোজনের ব্যবস্থা ও আয়েস-আরাম অনেক ভালো, অনেক বেশী। রাজ-কর্মচারীরা এ-পথে যাতায়াত কালে সরাই-সংলগ্ন গ্রাম-প্রধানের আতিথ্য গ্রহণ করে থাকে। তাতে অনেক টাকা-পয়সা বেঁচে যায় তাদের। পান্থশালার কয়েকটি কামরা সত্যিই খুব ভালো। সেগুলিতে আশ্রয় নেয় ধনী ব্যক্তিরা। দু-তিনটি কামরা এমনও আছে যেখানে গরীব, ভিখারী ও ভবঘুরের দল আশ্রয় পায়। তবে সে কামরাগুলিতে দরজা বা জানালার কপাট নেই, বর্ষার সময় ছাদ ও দেওয়াল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে। সরাইখানার পিছনে যে বিস্তৃত অঙিনা, বর্ষা বা শীতের রাত ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে তারা সেখানেই ডেরা জমায়।

গরীব পথিকদের তিন-চারটি দল আজ সন্ধ্যায় আঙিনায় ডেরা জমিয়েছে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা কিছু শুকনো কাঠ, গোবর ও কাঁটাঝোপ দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে তারা। শীত পড়েনি এখনো, মধ্য-হেমন্ত চলছে তাই আগুনের মৃদু উত্তাপ ভালো লাগে। এক স্থানে দুটি পুরুষ ও একজন মহিলা আগুনের পাশে বসে ওম্ নিচ্ছে। ছেঁড়া-ফাটা আলখাল্লা-পরিহিত একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো, অনুমতি নিয়ে বসলো তাদের পাশে, কাঁধের ঝোলা থেকে একটি শতচ্ছিন্ন কম্বল বের করে বিছিয়ে ফেললো মাটিতে। লোকটির উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল সে ইরানের অধিবাসী নয়। দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ পুরুষটি প্রশ্ন করলো—"আপনার ভাষা শুনে মনে হয়

আপনিও আমাদের মতোই পরদেশী। আপত্তি না থাকলে বলুন কোথায় আপনার দেশ, কি কাজে বেরিয়েছেন পথে।"

আগন্তুক যেন এ-ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতই ছিল। ধূসর দাড়িকে বাগ মানাতে মানাতে সে উত্তর দিলো—"আপনার অনুমান ঠিক, বন্ধু। আমি বিদেশী। জন্মসূত্রে সোগ্দ-এর বাসিন্দা, তবে খুব অল্পবয়স থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি ইরানের পথে পথে, শহরে গ্রামে। নিজের বলতে কিছু নেই, কেউ নেই আমার—তাই আমার জন্য ইরান ও সোগ্দ-এর মধ্যে কোনো তফাত নেই।"

কথা বলতে বলতে লোকটি তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুক চুলকে নিল কয়েকবার। তরুণটি তার ভিতরের পোশাকের উপর দেখতে পেলো একটি লাল চিহ্ন। চিহ্নটি দেখতে পেয়েছিল মহিলাটিও। সে চোখের ইংগিতে অন্য পুরুষটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সেদিকে। পুরুষটি বললো—"হ্যাঁ, ভাই। দু-দিনের জন্য তো আসা এই দুনিয়াতে, তার আবার ঠিকানা! রাজ্য, রাজবংশ সব বদলে যায় দেখতে দেখতে! তখন তোমার আমার মতো মানুষের ঘর-দুয়ার বেবাক পথ হয়ে যেতে আর কতক্ষণ!"

ততক্ষণে আগন্তুক লাল চিহ্নটি লুকিয়ে ফেলেছে আলখাল্লার অন্তরালে, কারণ সে জানে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। তরুণটি হেসে বললো—"অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আপনাকে। অবশ্যই ক্ষুধার্ত আপনি। খেয়ে নিন কিছু। তামাম রাত পড়ে আছে। কথা বলবার অনেক অবসর পাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি উত্তরের দিকে। আপনি যদি সঙ্গী হন তাহলে তিন থেকে আমরা চারজন হতে পারি।"

আগন্তুক অন্য দু-জন পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে অপলক দেখছিল মহিলাটিকে। তরুণটিকে উদ্দেশ্য করে সে বলল—"ধন্যবাদ, বিরাদর। আমি যাব গুন্দেশাপুর। পথে দেরি হয়ে গেল, নতুবা পেঁছে যেতাম আজই। তবে কিনা বেকার মানুষের আজ আর কাল, ও একই ব্যাপার।" বলতে বলতে আগন্তুক তার ঝোলা থেকে বার করলো একটি চামড়ার কুতুপ [পানাধার], শুকনো মেওয়া কিছু, আখরোট ও সিদ্ধ ভুট্টার দানা—"বন্ধুদের এই সুন্দর সান্ধ্য মিলন-উৎসবে সোগ্দী ভিখারীর সামান্য ভেট স্বীকার করুন।" ইতিমধ্যে তরুণটি তার সামনে একটি বড় রুমালের উপর বিছিয়ে রেখেছে কয়েকটি মোটা রুটি এবং আঙুরের গুচ্ছ। চষকে চষকে লাল মদিরা ভরে দিলো সোগ্দী ভিখারী, কানের কাছে কুতুবটি নাড়িয়ে সরল হেসে বললো—"আরো দু-বার করে হয়ে যাবে সকলের।"

মহিলাটি ঝোলা থেকে একটা বড় আকারের মাংসের রান্ বার করে বললো —"তোমরা যদি একটু সবুর করো, তবে আমি বাছুরের মাংসখণ্ডটি ঝলসে দিই। মদিরার মুখে ভালোই লাগবে খেতে।" সকলেই খুশী হলো তার প্রস্তাবে।

তিনজন পুরুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল প্রথম দুজন আর্মেনীয়। ষোলো বছর বয়সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল আগন্তুক। ত্রিশ বছরের ভরঘুরে জীবনে সে আর্মেনিয়া, আইবর, ভারত, ইরান, ও হিমবন্তের [হিমাচল] পথে পথে অনেক ঘুরেছে, অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছে। নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় বিচিত্রিত তার জীবন। ছেলেবেলায় হিমবন্তের পরী, কোহ্‌কাফের দৈত্য, হুন দেশের সামুদ্রিক ড্রাগন ইত্যাদি যে-সব কাহিনী সে শুনেছিল—তার মতে সে-সব নিছক কুসংস্কারপ্রসূত গালগল্প। তাহলে কি দেব-দানবের যুদ্ধ মিথ্যা কথা? হ্যাঁ, পৃথকভাবে দেব বা দানব নামে কোনো কিছু নেই। তারা আছে মানুষেরই মধ্যে, মানুষেরই রূপে। তাদের মধ্যে যুগে যুগে সংঘর্ষ ঘটে বারবার। আর দেব-মানুষ সর্বদাই জয়ী হয়।

তরুণের সঙ্গী পুরুষটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—"তাহলে আপনি বলতে চান যে জগৎ-সংসারে দীনের [ধর্মের] রাজত্ব অবশ্যম্ভাবী?"

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আগন্তুক জবাব দিলো—"হ্যাঁ, দেরেস্ত-দীনের।"

এখন তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি পেঁছে গেছে।

পরদিন সকালে যখন সূর্য উঠছে, ঠিক সেই সময় গুন্দেশাপুর নগরের দক্ষিণ তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেল তিনজন বিদেশী পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে।

গুন্দেশাপুর ইরানের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। তস্পোনের মতো বিশাল নগর অবশ্যই নয়, তবু তার অট্টালিকা সারি, রাজপথ, গলি, নগর-প্রাকার, নগর-দ্বার, উদ্যান ও বিপনিগৃহগুলি রাজধানীর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। দুই নগরের মধ্যে চোখে পড়বার মতো ফারাক একটিই আছে—সেটি এই যে গুন্দেশাপুরে ঝুপড়ি বা বস্তি নেই, এবং এখানকার গলি যথেষ্ট প্রশস্ত, সেগুলেতে নর্দমা ও পথ একাকার হয়ে যায় না।

নগরটি তৈরী করেছে রোমবাসীরা। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই অধিক। প্রথম শাপুর এবং পরবর্তী শাহেনশাহ-রা যতবার যুদ্ধে রোমকে পরাজিত করেছে, ততবার যুদ্ধ-বন্দীদের আগমনের ফলে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে উঠেছে গুন্দেশাপুর। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই ছিল দাস, যারা ইরানে এসে দাসখত থেকে মুক্তি পায়, এবং সঙ্গত কারণেই তারা আর দেশে ফিরে যায়নি। তারাই নির্মাণ করেছে এই সুন্দর শহরটি। বিদ্যা-কলা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুন্দেশাপুর উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। নানা দেশের মানুষ বসবাস করে এই নগরে। রোমানরা অধিকাংশই খৃষ্টধর্মাবলম্বী, ইরানীরা মজ্‌দয়াস্নী, গ্রীক দার্শনিকরা যবন, ভারতীয় জ্যোতিষী ও চিকিৎসকরা

হিন্দু। সব জাতি-ধর্মেরই আলাদা আলাদা দেবালয় আছে এই নগরে। এখানে বিরাজ করে চমৎকার এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

দক্ষিণ নগর-দ্বারে নাম, জাতি, নিবাস ও চেহারার বিবরণ দাখিল করে নিয়ে যাত্রী চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের পেশা লেখা হয়েছিল 'ভবঘুরে ভিখারী'। সৌম্যদর্শী পুরুষটি এখন বাকী তিনজনের পথপ্রদর্শক। অনেক পথ ঘুরে তারা নগরের উত্তর প্রান্তে একটি অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করলো। গলির মাঝামাঝি একটি পুরানো দোতলা বাড়িতে ঢুকে গেল সৌম্যদর্শী পুরুষটি, পিছনে পিছনে বাকী তিনজন। প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরে না গেলে বোঝা যায় না সেগুলি কতখানি সুরুচিসম্পন্নভাবে সুসজ্জিত। কারণ, বাড়িগুলি প্রায় সবই কাঁচা ইটের দোতলা, আর গলি পরিচ্ছন্ন হলেও অন্ধকার। এ-ধরনের স্পষ্ট দৃশ্যমান গরীব এলাকায় সাধারণত অভ্যন্তরভাগও অনুরূপ অগোছালো থাকে। কিন্তু মহার্ঘ্য কালীন, রেশমী পর্দা বা মূল্যবান কাঠে-তৈরী কারুকার্যময় আসবাবপত্র না থাকলেও এ-গৃহের সহজ রুচিশীলতার পিছনে কোনো শিক্ষিত সৌন্দর্যসচেতন মন কাজ করছে, সে-কথা বুঝতে দেরি হয় না।

সৌম্যদর্শী পুরুষটি তাদের একটি কামরায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যখন ফিরে এলো, তখন তার সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ এবং দু-জন তরুণী। আর্মেনীয় অতিথিরা মধ্যবয়স্ক পুরুষটিকে দেখে চকিত হয়ে পড়েছিল, কারণ নগরের দক্ষিণ-দ্বারে সেই লোকটিই তাদের নাম-নিবাস-পেশা ইত্যাদি লিখেছিল। লোকটি তাদের চিনতে পারবার বিন্দুমাত্র সংকেত দিলো না। বরং অতিথিদের প্রশ্ন করতে লাগলো, পথে কোনো কষ্ট হয়েছে কি না, কোনো বিশেষ খাদ্য বা পানীয়ের ব্যাপারে তাদের অসুবিধা বা আপত্তি আছে কি না ইত্যাদি। শেষে সে তরুণী-দুটিকে রেখে সৌম্যদর্শী ব্যক্তিটিকে ডেকে নিয়ে চলে গেল। একজন প্রৌঢ়া এসে খবর দিলো যে, স্নানের জন্য গরম জল দেওয়া হয়েছে।

গুন্দেশাপুর নগরের উত্তর প্রান্তে গলির মধ্যে অবস্থিত সেই বাড়িটির ভিতরে গেলে আজ আর তাকে চেনা যাবে না। এমনিতেই বাড়িটি স্বতন্ত্র, কিন্তু আজ তার রূপসজ্জা শুধু অসাধারণই নয়, বলা যেতে পারে রাজকীয়। প্রত্যেকটি কামরায় এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত মহার্ঘ কালীন বিছানো হয়েছে, জানালায় ঝুলছে রেশমী পর্দা। কামরার চার কোণে সপ্তমুখী দীপাধার রাখা হয়েছে, ঠিক মাঝখানে দুলছে বিশাল আতস কাচের ঝাড়লণ্ঠন। কাচের ঝুরিগুলি হাওয়ার ছোঁয়াতে টুং টাং বেজে চলেছে জলতরঙ্গের মতো।

বর্তমানে এই গৃহে বসবাস করছেন সৌগ্দের এক সামন্ত-কন্যা। তাঁর সঙ্গে অনেক পরিচারক-পরিচারিকা, তবে পরিচারিকাই বেশী। রাজকুমারী যেখানেই যান, সেখানেই সুঘ্রাণের প্রবাহ বাতাবরণকে মদির ক'রে তোলে। হেমন্ত ঋতু না হয়ে এখন বসন্তকাল হলে অসংখ্য ভ্রমর গুনগুন করে বেড়াতো তাঁর যাওয়া-আসার পথে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শুধু আতরের শখই নয়, রাজকুমারী দিনের অনেকটা সময় কাটান নিত্য-নতুন অলঙ্কার চয়ন ও পরিধানে। দাসীরা সকলেই গৃহস্বামিনীর মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট। তিনি কলরব পছন্দ করেন না, তাই দাসীরা নিজেদের মধ্যেও ফিসফিস করে কথা বলে। হেমন্তের শুরুতেই যাযাবর পাখিরা উড়ে গেছে হিমবন্ত পার হয়ে ভারতের রৌদ্রালোকিত নদীবহুল সমতলভূমির দিকে। শুধু রয়ে গেছে শালিক-চড়ুই-কবুতরের মতো ঘরকুণো পাখি। দিনভর শোনা যায় তাদের কিচিমিচি বক্‌বকম্। তবু তারাও শান্ত হয়ে শোনে, যখনি রাজকুমারীর কণ্ঠে শোনা যায় কোনো গানের সুর। আশ্চর্য মোহময় কণ্ঠস্বর তাঁর, যেন শ্রাবণের বিষণ্ণ দুপুরে হঠাৎ নিঃসঙ্গ কোনো কোকিলের গান, যেন ঊষর প্রান্তর বেয়ে কুলুকুলু স্রোতস্বিনী, যেন রোদের স্পর্শ পেয়ে গলে চলেছে তুষার-জমাট হিমবাহের হৃদয়।

সন্ধ্যা আসে। সামনের সুসজ্জিত কামরায় চৌকির নীচে কাঠকয়লার আগুন জ্বলে তাওয়ার উপরে। মখ্‌মলের আসন বিছিয়ে দেওয়া হয় চৌকির পাশে। হাঁসের পালক দিয়ে তৈরী বিশাল কম্বলে ঢাকা হয় চৌকি। আপাদ-মস্তক শরীরকে ঢেকে রাজকুমারী বসেন এক মহামূল্য আসনে। এখন নগরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ আসবেন। এ নগরে বহু সম্ভ্রান্ত বংশ আছে, সুদর্শন পুরুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু রাজকুমারীর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা দু-তিনজনের অধিক নন, এবং তাঁরা সকলেই উচ্চ-পদাধিকারী। কথাবার্তা হতে হতে আসর ক্রমশ পরিণত হয় গানের জলসায়। অতিথিরা রাজকুমারীর কণ্ঠসংগীত ও রূপের প্রশংসায় উচ্ছ্বাস-মুখর হন। অনেক রাত হলে, পান-ভোজনের শেষে, অতিথিরা বিদায় নেন, পরদিন আবার আসবার দৃঢ়নিশ্চয় এবং প্রতিজ্ঞা করে।

নগরের মানুষ শুনেছিল যে সৌগ্দী রাজকুমারী তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন, অনেক তীর্থ ঘুরে কিছুদিন গুন্দেশাপুর নগরে থাকবেন। তাছাড়া, শীতকালে কেউ-সৌগ্দ-এর দিকে যাত্রা শুরু করে না। পথে বিপদজনক কোহ্‌কাফ পর্বত পার হওয়া সবল পুরুষদেরই দুঃসাধ্য মনে হয়, আর ইনি একে তো আদরে লালিত রাজদুলালী, উপরন্তু সঙ্গে রয়েছে প্রমীলা বাহিনী। প্রতিদিন স্থানীয় মগোপত পুজা-পাঠের জন্য আসে। সেও রাজকুমারীর রূপে, গুণে ও আচরণে মুগ্ধ। ক্রমশ সকলেই জেনে গেল যে রাজকুমারী রূপে-গুণে যেমন অদ্বিতীয়া, ব্যক্তিজীবনে তেমনই ধর্মপরায়ণা।

আজকাল বরফ পড়তে শুরু করেছে। কয়েকদিন হলো এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাজকুমারীর সান্ধ্য মজলিসে রোজই হাজিরা দিচ্ছেন। তাঁর পোশাক, বাহন ও পরিচারকদের দেখে বোঝা যায় তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। বিশেষ করে তাঁর পোশাকের পারিপাট্য যে কোনো সামন্ত বা রাজকুমারের পক্ষেও ঈর্ষণীয় মনে হতে পারে। কথা প্রসঙ্গে বোঝা যায় তিনি সঙ্গীত বিদ্যার একজন সাচ্চা জহুরী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। শুধু ইরানী সঙ্গীতই নয়, ভারতীয়-রোমান-সৌগ্দী সঙ্গীতেও গভীর জ্ঞান তাঁর। রাজকুমারী বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত চর্চা করেছেন, শিখেছেন দেশী-বিদেশী অনেক ওস্তাদের কাছে। তিনিও স্বীকার করেন যে এমন সমঝদার শ্রোতা তিনি কখনও কোথাও দেখেননি। প্রৌঢ় অতিথিটি গম্ভীর প্রকৃতির সংযমী মানুষ। প্রশংসায় গলে যাবার মতো পুরুষ নন তিনি। রাজকুমারীও এই ভদ্র, মার্জিত, সুশিক্ষিত মানুষটির সামনে কোনো প্রকার চপলতা প্রকাশ না করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে যখন রক্তিম মদিরার চষক একের পর এক খালি হতে থাকে, উপস্থিত অন্যান্য পুরুষদের বাকসংযমের খোলস আস্তে আস্তে খসে পড়তে থাকে, তখনও সেই সুদর্শন সুবেশ প্রৌঢ় মদিরার মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। রাজকুমারীও এ ব্যাপারে বেশী অনুরোধ করেন না তাঁকে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় যে রাজকুমারী যখন নিজের হাতে কুতুপ থেকে চষক ভরে দেন, তখন প্রৌঢ়টির প্রতিবাদের স্বর ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

শীত ঋতুর আরো দুটি পক্ষ কেটে গেছে। ইদানীং মাঝেমাঝেই ভদ্র পুরুষটি রাতে আর ঘরে ফিরে যান না। কারণ দর্শানোর জন্য হিমবর্ষা তো আছেই। অতিথির প্রতি এমনই আকৃষ্ট হয়েছেন রাজকুমারী যে যাকে আগে গৃহের বাইরে সচরাচর দেখা যেতো না, তিনি আজকাল প্রায়শ যাচ্ছেন অতিথির হাবেলিতে [প্রাসাদে]। অতিথির হাবেলি গুন্দেশাপুর দুর্গের কাছাকাছি, এক মনোরম উপত্যকায়, নগর থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। হাবেলির চতুর্দিকে, সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে, বিস্তৃত ফল-উদ্যান। সামনে ফুল-বাগিচা। বসন্তে সারা উপত্যকা ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। প্রাসাদপতির বড় আক্ষেপ যে সেই

ফুলের সমারোহ তিনি রাজকুমারীকে দেখাতে পারছেন না। তবে শীতকাল যখন এসেই গেছে, বসন্ত তখন আর কতই-বা দূরে?

এদিকে রাজকুমারীর পরিচারক-পরিচারিকার দল ক্রমশ চিন্তিত হয়ে পড়ছে। রাজকুমারী অবিবাহিতা। তাঁর নতুন বন্ধু শুধু পহলব বংশের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বই নন, রাজবংশের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ক আছে। রাজকুমারী যদি তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হয়ে যান, তবে পিতা সানন্দে সম্মতি দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। আপত্তির কোনো কারণও থাকতে পারে না। কিন্তু পরিচারক-পরিচারিকাদের কি হবে? তারা কি দেশে ফিরে যেতে পারবে? প্রথা অনুসারে তাদের তো রাজকুমারীর সঙ্গেই থেকে যাবার কথা। কিন্তু এই প্রবাসে? তারা বসন্ত ঋতু আসবার আগে থেকেই দেশে ফিরবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। কতদিন আর ভালো লাগে বিদেশে! অথচ, রাজকুমারী আজকাল কখনো তিনদিন, কখনো সাতদিন পর্যন্ত ফিরেই আসেন না ঘরে।

পদমর্যাদায় রাজকুমারীর বন্ধু হাজারপত মনসবদার। তাঁর নিজস্ব জায়গীর রাগ [তেহরান] নগরের উপকণ্ঠে। গুন্দেশাপুরের দুর্গ বর্তমানে তাঁরই অধীনে। ইতিপূর্বে তিনি সীমা-সুরক্ষা বিভাগে সেনাপতি এবং প্রাদেশিক বিচার-বিভাগে মুখ্য সচিব হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এ-ধরনের কাজকর্মে বিশেষ রুচি ছিল না তাঁর। তাই তিনি স্বেচ্ছায় গুন্দেশাপুরে দুর্গ ও নিরাপত্তা প্রধানের কার্যভার বেছে নেন। সঙ্গীত-দর্শন-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের ফলেই এই নগরটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বহুজাতিক সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসাবে গুন্দেশাপুর ইরানে বহুকাল যাবত অগ্রণী নগর। তবে এই প্রদেশে তাঁর তুলনীয় উচ্চ পদাধিকারী অন্য কোনো রাজকর্মচারী নেই। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে রাজকুমারীর বিশেষ কোনো ধ্যান-ধারণা নেই, তাই বন্ধু যখন যবন দার্শনিক সোক্রাতো-প্লাতোন [সক্রেটিস-প্লেটো] ইত্যাদির উল্লেখ করেন এবং নানা আলোচনা শুরু করেন, সুন্দরী পড়ে যান বড়ই অস্বস্তিতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রাজকুমারী লক্ষ্য করেছেন যে বন্ধুটি প্রাচীন থেকে শুরু করে হালফিলের সাহিত্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। শুধু ইরানী সাহিত্য নয়, যবন-সৌগ্দী-আর্মেনীয় ও ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ অবাধ। রাজকুমারী মুখে না বললেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যাপারে তাঁর বন্ধু পুরুষটির জুড়ি মেলা ভার।

একটি বিষয়ে রাজকুমারীর মনে খট্‌কা লাগে মাঝে মাঝেই। বন্ধুটি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করেন না। একবার শুধু কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা আছে। তারা থাকে তাদের পিতামহীর কাছে। অন্য এক সূত্র থেকে রাজকুমারী জেনেছেন যে বন্ধু-পত্নী মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে

নিয়ে। অর্থাৎ, প্রথম যখন বন্ধু রাজকুমারীর গৃহে যাতায়াত শুরু করেন, তখনও বন্ধু-পত্নী প্রাসাদে বর্তমান ছিলেন। পরে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পিত্রালয়ে চলে যান। তিনি চলে যাবার পরেই বন্ধু রাজকুমারীকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান, তার আগে সেটা সম্ভব হয়নি। তবে কি স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের মূলে আছেন তিনি স্বয়ং? ভেবে ভেবে রাজকুমারী বড় কষ্ট পান।

শীত ঋতু শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। বন্ধু হাজারপতের আচরণে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। মদিরার মাত্রা বেড়ে গেছে অনেক, আগের সেই সংযমী পুরুষটি যেন হারিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। তার সঙ্গে এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজকুমারীকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

হাজারপতের কাছে সরকারী কর্মচারীদের অধিক আনাগোনা নেই। শুধু একজনই আসে, খবরাখবর দেয় এবং হাজারপতের পরবর্তী আদেশ শুনে চলে যায়। লোকটির নাম মিত্রদাত্। তার প্রতি হাজারপতের ব্যবহার পদমর্যাদার ফারাক থাকা সত্ত্বেও অনেকটা বন্ধুসুলভ। রাজকুমারী বুঝতে পারেন যে গুন্দেশাপুরের দুর্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুর্গাধীশ হাজারপত প্রত্যহ অন্ততপক্ষে একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য দুর্গে যেতেন। বর্তমানে অনেক কাজের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন মিত্রদাতের উপর। মিত্রদাত্ তাঁর খুবই বিশ্বাসভাজন সন্দেহ নেই। সে যখন কোনো খবর নিয়ে আসে, রাজকুমারী পুরুষদের গোপন আলোচনার সুযোগ দিয়ে সরে যান অন্যত্র। সামন্ত বংশে জন্মসূত্রে রাজপুরুষদের গোপনীয়তা সম্পর্কে রাজকুমারী অবিদিত নন।

বসন্তকালের উষ্ণ বাতাস বইবার আগে পর্যন্ত নগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। বন্ধু হাজারপতের প্রাসাদ পাহাড়ী এলাকায় এবং নগর থেকে অনেকটা বেশী উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে হিমবর্ষার প্রকোপ অধিক। রাজকুমারীর প্রতি প্রেম যেমন গভীর হয়ে চলেছে হাজারপতের হৃদয়ে, তেমনই মদিরার প্রতিও তাঁর আসক্তি বেড়েই চলেছে দিনে দিনে। আজকাল দু-জনের জলসা যখন রাতের প্রথম প্রহর থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় তৃতীয় যামে, ততক্ষণে বন্ধু হাজারপত রাজকুমারীর সুগন্ধী কোলে মুখ লুকিয়ে স্বপ্ন দেখেন মদিরার থেকে মদিরতর ভবিষ্যৎ কোনো সুখের দিনের, আর মাঝে-মাঝেই স্খলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—"আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, সোগ্দীন [সোগ্দ-এর কুমারী]! আমি তোমার, আমার সর্বস্ব তোমার।" হাজারপত সুদর্শন হলেও প্রৌঢ়, রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক বিশ বছরেরও অধিক। তবু রাজকুমারী যেন সেই প্রৌঢ়ের প্রেমেই মুগ্ধ হয়ে আছেন।

প্রাসাদের পরিচারক-পরিচারিকারা রাজকুমারীকেই গৃহস্বামিনীর সম্মান দিয়ে থাকে। তাঁর আচরণে অহমিকার লেশমাত্র নেই, তাই দাস-দাসী সকলেই

কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ। তাছাড়া, রাজকুমারীর আর্থিক উদারতা যেন কিনে নিয়েছে তাদের। এমন কি তরুণ সিপাহ্সালার মিত্রদাত্ পর্যন্ত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও রাজকুমারীকে কুর্নিশ ইত্যাদি ভব্যতা দেখিয়ে থাকে, যদিও সারা গুন্দেশাপুর জানে যে সে সহজে কারো সামনে মাথা নত করবার মানুষ নয়।

জ্যোতিষীর দল আজকাল প্রাসাদে আসছে নিয়মিত। আগামী বসন্তে যখন বনতরু সতেজ সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত হয়ে যাবে, উদ্যানে-ভূমিতে বিছানো হবে সবুজ ঘাসের গালিচা, শীতের নির্বাসিত পাখিরা ফিরে আসবে গান গাইতে গাইতে, নাশপাতি গাছের সাদা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবে কালো ভ্রমর—সেই শুভ ঋতুতে হাজারপত ও রাজকুমারীর প্রণয় পরিণয়ে রূপান্তরিত হবে। মহামান্য জ্যোতিষীরা সেই শুভক্ষণের তালাশ করছেন। বসন্ত ঋতু এগিয়ে আসে, আর বন্ধু হাজারপত আরও তল্লীন হয়ে যান সুখস্বপ্নে। তাঁর রক্তের গভীরে, তাঁর অস্তিত্বে প্রবলতর হয়ে ওঠে প্রেয়সী রাজকুমারীর অস্তিত্ব। তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যেতে থাকেন।

অমাবস্যার ঘন কালো রাত। চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও বোঝা যায় না কোথায় সমতল ভূমি, আর কোথায় পাহাড়। কোথায় উপত্যকা, আর কোথায় অধিত্যকা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটিও তারা দেখা যায় না। চারিদিকে প্রকৃতি এক ভয়াবহ স্তব্ধতায় রহস্যঘন। রাত কত হয়েছে, তার উত্তর মিলবে না। বিশেষ করে এই চোরকুঠুরির মধ্যে, যেখানে টিমটিম করে জ্বলছে একটি মাত্র মোমবাতি। আমরা আলো-আঁধারির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দু-জন পুরুষ এবং আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা এক গৌরীকে। তারা কথা বলছে না কেউ। ছোট্ট কুঠুরি। এত নীচু যে বন্ধ দরজার কাছে দণ্ডায়মান পুরুষটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কুঠুরির জানালা-দরজা সব অর্গলিত। দ্বিতীয় পুরুষটি ভূমিশয্যায় বসে আছে। তার চোখ দুটি খোলা, দৃষ্টি স্বপ্নিল, আর চেহারায় এক ধরনের অবিশ্বাসের প্রশ্নচিহ্ন। সে তাকিয়ে আছে নারীমূর্তিটির দিকে—"কেন আসো তুমি? যাও, চলে যাও! আর এসো না, কখনও! তুমি আসো, আবার চলে যাও—আমার বড় কষ্ট হয়, প্রিয়ে।" নারীমূর্তিটি এক কদম এগিয়ে এলো। ধীর মধুর স্বরে বললো—"আমি তোমাকে কষ্ট দিতে আসিনি, প্রিয়তম।"

—"একই কথা তো রোজ বলো তুমি, তারপর মিশে যাও সামনের ঐ দেওয়ালের আঁধারে, আর তোমার স্মৃতি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে হৃদয়ে! এও তো জানি না, আজকে কত তারিখ কোন সাল। শীত করলে বুঝি এখন শীত ঋতু, বৃষ্টির পায়ের শব্দে বুঝি বর্ষাকাল! বাগিচার ঘাসগুলো বেড়ে উঠেছে নিশ্চয়। দিগন্তে কোহ্কাফ পর্বতে এখন শুধু মেঘ আর কুয়াশার জমায়েত। কয়েকদিনের মধ্যেই তিগ্রার জল বিপদসীমা অতিক্রম করে ফুঁসে

উঠবে। আহ্—কেন আসো? বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে পুরানো ক্ষতগুলি কেন তাজা হয়ে ওঠে। কেন বেদনা জাগাও?"

কৃষ্ণবসনা নারী এগিয়ে আসে পুরুষটির কাছে। তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে কপোল চুম্বন করে। পাতলা দীর্ঘ আঙুলে বিলি কাটে পুরষটির বিস্রস্ত চুলে। নীরবে কাঁদে।

—"হায়, আবার সেই স্বপ্ন, সেই মধুর স্বপ্ন, যার কোনো পরিণতি নেই। শুধু মাঝেমাঝে স্পর্শ পাই তার, সেই নিশ্বাসের সুগন্ধ, সৌরভ মিলিয়ে যায় ক্রমে, হারিয়ে যায়। কেউ কখনও বলে না—এ স্বপ্ন মিথ্যা নয়, এ স্বপ্ন সাকার, সত্য!"

—"আজ আমি স্বপ্নে আসিনি, কোয়াত্। স্বয়ং এসেছি, তোমাকে মুক্ত করতে। দ্যাখো!" —সম্বিকা তার নারী শরীরের সমস্ত সম্ভার নিয়ে সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলো কোয়াত্‌কে। তারপর ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললো—"কিন্তু আর দেরি নয়, প্রিয়! এক্ষুনি রওনা হতে হবে। পালাবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক করা আছে!"

আজকের স্বপ্নটা একটু অন্য ধরনের। বিস্মৃতির ঘোর একেবারে না কাটলেও কোয়াত্ অনুভব করতে পারে সে-কথা। ততক্ষণে অন্য পুরুষটি দরজা খুলে ফেলেছে, এবং সম্বিকার হাতের টানে একটি বারান্দা দিয়ে যন্ত্র-চালিতের মতো এগিয়ে চলেছে কোয়াত্। কয়েকটি বারান্দা, কয়েকটি বাঁক, কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, দু-তিনটি চোরদরজা—তারপরই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক লাগে মুখে। কোয়াত্ ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আসে। সম্বিকা তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন করে আবার—"দুর্গাধীশ মদিরার নেশায় চুর হয়ে ঘুমোচ্ছে। মদিরায় যে বস্তুটি মিশিয়েছি, তাতে দু-তিনদিনের আগে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা নেই কোনো। তার মধ্যে তোমাকে অনেক দূর চলে যেতে হবে, কোয়াত্!"

—"আর তুমি, সম্বিকা?"

—"আমার কিছু কাজ বাকী আছে এখনো। চিন্তা ক'রো না তুমি। যাদের সহায়তায় এই কারাগৃহ পর্যন্ত পেঁছাতে পেরেছি, তারাই আমাকে পেঁছে দেবে সঠিক জায়গায়, তোমার কাছে। মিত্রবর্মা এই গুন্দেশাপুর নগরেই আছে!"

কি যেন সহসা মনে পড়ে যায় কোয়াতের—"আর আমার ছেলে? আমাদের কাবুস?"

—'সে আছে অন্তরজাগরের জিম্মায়। যাও, ঘোড়া তৈরী আছে, দেহরক্ষীও আছে সঙ্গে। তোমরা কিন্তু সৌন্দী ব্যবসায়ীর অভিনয় করবে। পোশাক তোমার সঙ্গীরাই দেবে!" কোয়াত্ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সম্বিকা তার ওষ্ঠ চুম্বন করে বাধা দিলো—"এখন আর কথা নয়! কথা হবে, অনেক

কথা, যখন সম্বিকা তোমার কাছে পেঁছাবে আবার। সাবধানে থেকো। বিদায়।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোয়াত্ আলিঙ্গন মুক্ত করলো সম্বিকাকে। তারপর অন্ধকারে দু-জন দুটি পথে অগ্রসর হতে থাকলো।

চারজন অশ্বারোহী উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। বসন্ত সমাগত, কিন্তু এই পাথুরে এলাকায় যেমন শীত ঋতু, তেমনই বসন্ত। শ্যামল শীতল স্পর্শ নেই কোনোখানে।

যাত্রা শুরু হয়েছিল যেখান থেকে, তারপর এখনো যাত্রীদের কোনো বণিক-পথ বা রাজপথ ধরে অগ্রসর হতে হয়নি। এ-পথে কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনাও কম। তাদের যাত্রার প্রথম দুটি দিনমান তারা বনচ্ছায়ে বিশ্রাম করেছে, আর ঘোড়া ছুটিয়েছে রাতভর। এখনো বাধা আসেনি কোনো। পথে তিন জায়গায় ঘোড়া বদল করতে হয়েছে। এখন তারা চলেছে রাজপথ ধরে হমদান নগরের দিকে। এ-পথে রাত্রে চললে সন্দেহ করবে যে কেউ, তাই আজ অশ্বারোহীর দল সকাল থাকতেই রওনা হয়েছিল। এখন সন্ধ্যা। হমদান অনেক দূরে। তাই তারা পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাত কাটাতে মনস্থ করে।

চতুর্দিকে দু-মানুষ উঁচু মাটির প্রাচীর। গ্রামের দুই প্রান্তে দুটি প্রবেশদ্বার। যাত্রীরা জানত না যে ইরানের প্রধানমন্ত্রীও আজ রাতে আশ্রয় নিয়েছেন এই গ্রামেই, এবং গ্রামের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে সর্বত্র রাজকীয় সান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যবর্তী ময়দানে সৈন্যবাহিনীর শিবির লেগে আছে। গ্রামে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বাররক্ষী অশ্বারোহী চারজনকে থামতে বলে। নগণ্য এক গ্রামেও রাজকীয় সান্ত্রীর উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকতে পারে, এ-কথা তারা ভাবেনি। তাই সকলেই ভিতরে ভিতরে বিচলিত হয়ে পড়লেও আচরণে তারা স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করে।

—"আমরা সোগ্দ-এর বণিক। চীন দেশ থেকে রেশম এবং উত্তরের জঙ্গল থেকে চামড়া সংগ্রহ করে আমরা গিয়েছিলাম তস্পোনে শাহেনশাহ-র দরবারে।"

দ্বাররক্ষী দেখলো মালদার আসামী ফেঁসেছে তার হাতে। তাই ধমকের সুরে বললো—"বণিক না কচু! আজকাল হূনদের সমস্ত গুপ্তচরগুলো সোগ্দী বণিকের ছদ্মবেশেই আসে এ-দেশে! আরে কে আছিস! এগুলোকে হাজতে ঢুকিয়ে দে!"

—"কিন্তু কোনো কিছু না জেনেশুনেই আমাদের গুপ্তচর কেন ঠাউরাচ্ছেন আপনি? মুখ্যরক্ষীকে ডেকে পাঠান, অথবা অন্য কোনো দায়িত্বশীল আধিকারিককে! আমরা সারা দুনিয়া চষে বেড়াই, আর যেখানেই যাই, আপনার মতো দু-একটা ধৃষ্ট দারোয়ানের সঙ্গে মোকাবিলা হয়েই থাকে! যান, আপনার আধিকারিক মহাশয়কে ডাকুন! বলবেন যে সোগ্দের রাজা এবং ইরানের শাহেনশাহ বীর জামাস্প বাহাদুর উভয়েরই পাঞ্জা আছে আমাদের কাছে! আমরা এই গ্রামে এসেছিলাম শুধু রাতভর বিশ্রামের জন্যে!"

ইতিমধ্যে অন্য কোনো রক্ষী সম্ভবত খবর দিয়ে থাকবে, তাই হন্তদন্ত হয়ে

রক্ষীদলপ্রধান এসে হাজির হলো—"কি ব্যাপার? এদের আটকে রেখেছ কেন?"

প্রথম দ্বাররক্ষীকে জবাব দেবার সুযোগ দিলো না সোগ্দী বণিক—"আমাদের দুর্ভাগ্য হুজুর, আপনি আগে আসেননি! আমরা কিন্তু সরাসরি হুজুরের সেবায় উপস্থিত হতে চেয়েছিলাম!"

রক্ষীপ্রধান 'সেবায় উপস্থিত' কথাটি শুনে মনে মনে খুবই খুশী হলো—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, বণিক! আপনারা সামনের ঐ খালি কামরায় থেকে যান রাতভর! তবে হ্যাঁ, ভোর হবার আগেই উঠে রওনা হয়ে যাবেন, বুঝলেন? আপনারা বিদেশী, ইরানের মানুষ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যাবেন, সেটা ঠিক হবে না। কামরার সামনে আঙিনায় ঘোড়াগুলিকে বেঁধে দিন, আমার লোক এসে দানা-পানি দিয়ে যাবে। আর, রাতের ভোজন একসঙ্গে, আমার তাঁবুতে, বুঝলেন তো?"

হ্যাঁ, সোগ্দী বণিক এটাই তো বুঝতে চেয়েছিল। আঙিনায় ঘোড়া বেঁধে তারা প্রবেশ করলো রক্ষীপ্রধানের তাঁবুতে। স্বর্ণমুদ্রায় একশ' দীনার এবং এক থান রেশম তারা ভেট চড়ালো তাকে। অন্ধকারে, দীপের আলোয়, চকচকে সোনার চাক্তিগুলিকে দেখে খুবই প্রসন্ন হলো সে। হমদান নগরেও যাতে বণিকদের কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়, তাই সে নগর-সুরক্ষা বিভাগের এক আধিকারিককে চিঠি লিখে দিতে রাজী হলো, এবং সেখানেও যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভেট দিতে হবে কিছু, সে-কথা জানাতে ভুললো না। বিনিময়ে সেই আধিকারিক বণিকদের সব ধরনের সহায়তা করতে রাজী থাকবে।

রক্ষীপ্রধান অতিথিদের সামনে ভোজনসামগ্রী বিছিয়ে দিলো। সোগ্দী বণিকদের প্রবক্তা বের করলো রোমান আঙুরে প্রস্তুত কয়েক কুতুপ উৎকৃষ্ট সুরাসব। রক্ষীপ্রধান এমন উৎকৃষ্ট মানের সুরা চাখেনি কখনও। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালো সে।

—"কত চমৎকার আপনাদের বণিক জীবন! কত নতুন শহর দেখেন, কত স্থানের সুন্দরী নারী দেখবার সৌভাগ্য হয় আপনাদের! উপরন্তু, কত অর্থ উপার্জন! আর আমরা? শিবির-জীবন আমাদের পারিবারিক জীবনকে বরবাদ করে দেয়, পুত্র-কন্যার থেকে আলাদা করে দেয়! আর সুন্দরী নারী তো বীরভোগ্যা, হয় পদমর্যাদায় বীর, নয়ত ধন-দৌলতে! আমাদের মতো চুনোপুঁটির দিকে কে আর ফিরে চায়!"

সোগ্দী বণিক এবার শুরু করলো দেশ-বিদেশের নারী, তাদের রূপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা। বহু দেশে ঘুরেছে সে, অনেক অভিজ্ঞতা তার। রক্ষীপ্রধান অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলো আর্মেনীয়া—আইবর—রোম—মিশর—এসিরিয়া—কপিশ—কাবুল—হিরাত—বখ্‌ত্রিয়ের নানা সুন্দরী নারীর কাহিনী। সে শোনে, আর মাঝেমাঝেই 'হায়', 'মরহব্বা', 'দিল-এ-বেতাব',

'মাশ-এ-ইল্লা' ইত্যাদি শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। আবার মাঝে মাঝে সে দু-হাতে নিজের বুক চেপে ধরে—হায় হায়, এত রূপ সারা পৃথিবী জুড়ে, আর সে কি না কয়েক চাকতি রূপোর মায়ায় পড়ে বরবাদ্-এ-তামাম করে দিলো জবানীর দিনগুলিকে। এ-দিকে সোগ্দী বণিকের নারী-সৌন্দর্য বর্ণনা শুনে তার সাথীরা পর্যন্ত চমকে চমকে উঠছে, কারণ সেই বিবরণের অধিকাংশই মনগড়া। এক সময় রক্ষীপ্রধান চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, আর তার নাক কখনো বীররসে উদ্দীপ্ত হয়ে, আবার কখনো বা করুণ রসের ম্রিয়মাণ সুরে সেইসব অদেখা সুন্দরীদের আহ্বান জানাতে থাকলো।

সূর্য উঠবার অনেক আগেই দেখা গেল সেই চার অশ্বারোহী গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে বেশ কয়েক মাইল দূরে। একজন সোগ্দী বণিক বললো—"তাহলে দেখা যাচ্ছে দিনারের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, আর সেই ভাষাই বেশী বোঝে লোকে!"

অপর একজন উত্তর দিলো—"দিনের বেলা চলার পালা যখন, হাতের কাছে কিছু কিছু দিনার তৈরী রাখাই ভালো। কে যে কখন লোভের হাত বাড়িয়ে দেয় সামনে!"

প্রথম ব্যক্তি বললো—"অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না এদের। সামন্ত-শ্রেষ্ঠী-পুরোহিত গোষ্ঠীর পকেট থেকে উপছে পড়া সামান্য কয়েকটা দিনারেই তো সন্তুষ্ট থাকতে হয় মাঝখানের লোকগুলোকে। সব লুটে-পুটে খাবে উচ্চবর্গ, মধ্যম বর্গ খাবে তাদের উচ্ছিষ্ট, আর কিষাণ-মজদুর-দাস শুধু আঙুল চুষবে—এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। আর যারা নিয়ম বানানোর মালিক, থাক তাদের কথা। ইঁদারার জলেই যদি মদ মেশানো থাকে, মাতাল না হয়ে কোনো উপায় আছে?"

হমদান ইরানের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে রাজকীয় সড়ক চারভাগে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে—কোহ্‌কাফ, সোগ্দ, দক্ষিণী সমুদ্র এবং রাজধানী তস্পোনের দিকে। হমদান নগর সোগ্দী বণিকদের একটি বড় ডেরা। অশ্বারোহীরা তাদের মুখোমুখি হতে চাইছিল না। তাই সরাসরি নগরে প্রবেশ না করে তারা অন্য পথে এগিয়ে চললো।

হমদান নগরকে পিছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিম দিকে অনেকটা দূর গিয়ে তবে তারা পৌঁছাল পাহাড়ী এলাকায়। এই পর্বতমালা নিষ্পত্র বৃক্ষহীন নয়। কোথাও দেবদারুর বন, আবার কোথাও বার্চ-পাইন-ওক গাছের ঘন জঙ্গল। এখানে ছোট ছোট নদীগুলি জলশূন্য নয়, বরং সদা কলধ্বনিমুখর। চারিদিকে পাখিদের কলকাকলি। এখন তারা চলেছে পাকদণ্ডীর উপর দিয়ে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। রাজপথ, নাগরিক সভ্যতা পড়ে আছে অনেক পিছনে। অশ্বারোহীদের পরনে এখন আর্মেনীয় পোশাক। পথে যে-সব গ্রামীণ মানুষের

সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাদের মুখে সরল হাসি, আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, তারা সহায়তা করতে সদাপ্রস্তুত। এখানে আত্মগোপন করবার প্রয়োজন কম, কারণ শাসন-ব্যবস্থার বাহু এখানে পেঁছায় না বললেই চলে।

এই পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে এখনো প্রাচীন গণতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে এখানে স্থাপিত হয়েছিল মাদ বা মিশরীয় গণতন্ত্র। সে সময় তিগ্রা ও হফ্‌রাত উপত্যকায় ছিল অসুর সম্রাটদের রাজত্ব। তারা বহুবার স্বাধীনচেতা মাদদের ওপর আধিপত্য করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। মাদ-রা বিভিন্ন গণগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। শত্রু আক্রমণ করলে তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতো ঠিকই, কিন্তু গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য-চেতনা ছিল না। এই সময় মাদ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দেবক নামের এক বীর যুবক খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেবক মাদ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংহতি-স্থাপন করে এবং অসুর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। অসুর বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। দেবক ও তার সেনা বাহিনীর বিজয়ে ক্ষতিও হয়েছিল একটি। মাদ ভূমিতে গণতন্ত্রের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র—দেবক হয় প্রথম রাজা। কিন্তু রাজ্যপাট পরিচালনায় অনভ্যস্ত মাদ দু-পুরুষের অধিককাল টিকে থাকতে পারেনি। তারপরই পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, এবং মাদ ভূমি সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হাজার বছর কেটে গেছে। তবু মাদ ভূমির মানুষ এখনো স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী থেকে গেছে। মূলত তারা শান্তিপ্রিয়। কিন্তু তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেই সহসা আগুন জ্বলে ওঠে। তাই ইরানের শাসনকর্তারা মাদ-দের বর্বর জংলী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে।

অশ্বারোহীরা এখন সেই প্রাচীন মাদ ভূমি অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। এখানে তথাকথিত সভ্যতার আলোক পেঁছায়নি, নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা এখানে পাওয়া যাবে না, কিন্তু মানুষের সার্বিক পতন এখনো শুরু হয়নি মাদ ভূমিতে।

যাত্রার চতুর্থ দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে অশ্বারোহীরা একটি পাহাড়ী নদী পার হয়ে পেঁছালো এক উন্মুক্ত দূনে [উপত্যকায়]। চারিদিকে উঁচু পাহাড়। মধ্যবর্তী সমতলভূমি যেন ভূস্বর্গ। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য ঝর্ণা, সমতলে পেঁছে সেগুলি পরিণত হয়েছে স্রোতস্বিনীতে। এই উপত্যকায় সর্বত্র সবুজ ঘাসে ঢাকা, সর্বত্র ফুলের মেলা। অশ্বারোহী দলটি নদীর কিনারা ধরে, চষা ক্ষেত-খামারের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো। অন্যদিকে মেওয়া, আপেল, কমলা লেবু ও নাশপাতির বাগান, যতদূর চোখ যায়, আর মধ্যে মধ্যে আখরোট, বাদাম, পেস্তা গাছের সারি। আবার এক এক স্থানে আঙুরের বাগিচা। গাছগুলি জমি থেকে দেড় হাত মাত্র উঁচু, ডালপালা

বেরোচ্ছে সবে। আরো এক ধরনের লতানে আঙুর গাছও দেখা যাচ্ছে, যার পাতাগুলি গাঢ় সবুজ।

অশ্বারোহীরা ইরানের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ করে ইস্তখার ও গুন্দেশাপুর অঞ্চলে ধনী সামন্ত প্রভু এবং শ্রেষ্ঠীদের অনেক বাগিচা দেখেছে। সে বাগিচাগুলি সাজানোর পিছনে আছে ধনিকের অর্থ ও মালীদের শ্রম। কিন্তু মাদ ভূমির প্রত্যন্ত প্রান্তে এই বাগিচা বানিয়েছে যেন মানুষ ও ঈশ্বরের ভালোবাসার হাত, এখানে লেনদেনের কথা মনেও আসেনি কারো, তাই এই বাগিচা এত সুন্দর, বৃক্ষপংক্তি এত সতেজ।

বাগিচা পার হয়ে তারা পেঁছালো জনবসতির প্রান্তে, অগ্রসর হলো গ্রামের পথ ধরে। গ্রাম-বাগিচা-ক্ষেত-বনভূমি-নদী-পর্বত সব যেন একে অপরের সঙ্গে মিলিত, একে অপরের পরিপূরক। এই গ্রামে কোনো প্রাচীর নেই, প্রবেশদ্বার নেই—প্রয়োজন হয় না। গ্রা মর ঘর বাড়িগুলি সবই মাটির তৈরী সাধারণ কুটির, কিন্তু পথের দু-ধারে পংক্তিবদ্ধ। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া পথ, যার দু-পাশে ছায়াঘন বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা পরিচ্ছন্ন, এবং প্রত্যেকটি কুটির সুগঠিত।

সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও পশ্চিম আকাশে এখনো লাল আভা লেগে আছে। সাধারণ বেশ-ভূষায় সজ্জিত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অসংখ্য শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতীদের দেখা যায় একটি সরোবরের কিনারায় মিলিত হয়েছে। সকলের বেশ-ভূষা সাধারণ হলেও সুসংস্কৃত ও সুরুচিপূর্ণ। প্রত্যেকের মুখে-চোখে স্বাস্থ্যে এক ধরনের উজ্জ্বলতা, যা শহরে দেখা যায় না। সম্ভবত সুস্বাস্থ্য এবং সচ্ছলতার কারণেই সকলকে অধিক গৌর মনে হচ্ছে। যুবতী মেয়েদের চোখের রঙ সন্ধ্যামণি ফুলের মতো নীল। শিশুদের উদ্দাম কেশরাশি স্বর্ণাভ।

অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন গ্রামের মানুষের পরিচিত ব্যক্তি। প্রত্যেকটি শিশু-তরুণ-তরুণী তাকে দেখেই সহাস্য স্বাগত-বচন জানায়। গ্রামটি বিস্তৃতিতে বিশাল। অশ্বারোহী দল ক্রমশ গ্রামের প্রান্তদেশে পেঁছায়। একটি বড় আকারের কুটিরের আঙিনায় প্রবেশ করে তারা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুটির থেকে বেরিয়ে আসেন এক দাড়িওয়ালা সুদর্শন প্রৌঢ়, মুখে স্মিত হাসি, মুখমণ্ডলে যেন এক দৈবী প্রভা, আর তিনি একে একে সকলকে জড়িয়ে ধরেন বুকে, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। সকলেরই চোখে তখন বইছে আনন্দাশ্রু।

রাত্রে যে চারজন অশ্বারোহী এসেছিল, তাদের মধ্যে মিত্রদাতু এবং সিয়াবকুশ আগে থেকেই পরিচিত ছিল দেবোদ্যানের সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, বাকী দু-জনের একজন ছিল ভারতীয় মিত্রবর্মা, এবং অন্য জন ইরানের পদচ্যুত শাহেনশাহ—কোয়াতু। রাতের বেলা গ্রামের বিশেষ কিছু দেখার সুযোগ তারা পায়নি, তবে রাত্রিকালীন ভোজনের সময়েই তারা বুঝতে পেরেছিল যে এক নতুন দুনিয়ায় তারা এসে পড়েছে। গ্রামের পাঁচ হাজার অধিবাসীর ভোজন যদিও এক সঙ্গে সম্পন্ন হয় না, তবু তারা যেখানে বসেছিল, সেখানে উপস্থিত ছিল তিনশ'র অধিক ব্যক্তি। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সকলেই বসেছে পাশাপাশি, আর তাদের মধ্যে একই পংক্তিতে বসেছেন অন্তরজাগর। ভোজ্যে মাংস নেই, মদিরাও অনুপস্থিত, কারণ উচ্চবর্গীয় অনুযায়ীদের জন্য অন্তরজাগর মাংসভক্ষণ এবং মদিরা পান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু খাদ্যতালিকায় ভাত, রুটি, মেওয়া, ঘি, মাখন, মধু ইত্যাদি পুষ্টিকর বস্তুর আধিক্য দেখা যাচ্ছে। ভোজনগৃহের বাতাবরণ খুবই পছন্দ হলো কোয়াতু ও মিত্রবর্মার। এখানে ছোট-বড় নারী-পুরুষে ভেদ নেই। হালকা হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে সঙ্গে ভোজনও চলেছে, কোথাও আবার প্রৌঢ়ের দল আলোচনায় মগ্ন রয়েছে। পরে আগন্তুক দু-জন জানতে পেরেছিল যে দেবোদ্যানে এই ধরনের গণ-ভোজনালয় আছে চল্লিশটি। সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার পঞ্চায়েতের হাতে।

দেবোদ্যানের মতো গ্রাম স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন অন্তরজাগরের পূর্বতন গুরুরা। তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন অন্তরজাগর। (একটি আদর্শ গ্রাম থেকে দুটি-তিনটি গ্রাম, তার থেকে পুরো অঞ্চল, তারপর সমস্ত প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ এবং সারা বিশ্ব—অন্তরজাগর বিশ্বাস করেন যে মানুষ যদি স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী না হয়ে পড়ে, তার যদি পদস্খলন ও আদর্শচ্যুতি না ঘটে, তাহলে সারা পৃথিবী অবশ্যই দেবোদ্যানে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সে-জন্যে প্রয়োজন কট্টর আদর্শবাদের, কঠিন অনুশাসনের, বিকাশমুখী শিক্ষা এবং একাত্মতার ভাবনা।) দেবোদ্যান গ্রামে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। সমস্ত ফল-বাগিচা, সমস্ত ক্ষেত, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত সম্পত্তি গ্রামবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। প্রত্যেককে তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করতে হয়। শিশু এবং বৃদ্ধদের কাজ করতে হয় না। একই কথা প্রযোজ্য অসুস্থ বা রোগীদের ক্ষেত্রে। তাদের ভার নেয় সারা গ্রাম। দেবোদ্যানের মানুষ শ্রমদানকে নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করে। এইভাবে সকলের সম্মিলিত শ্রমের ফসল হয়ে যায় সমস্ত গ্রামবাসীর সম্মিলিত সম্পত্তি। এখানে শিশুদের গাল যেন ভোরের কমলা রঙের রোদ, এখানে বুড়ো-বুড়িদের মুখে ঝলমলে হাসি, কারণ এখানে মানসিক পীড়ায় ভুগতে হয় না, এখানে 'ক্ষুধা' শব্দটি এবং ক্ষুধার

তাড়না মানুষের অজানা, এখানে বয়ে চলেছে দুধ ও মধুর নিরন্তর ফল্গুধারা। সত্যি বলতে কি, দেবোদ্যান যদি কোনো ব্যবসায়িক সংস্থা হতো, তাহলে সেখানকার শ্বেতমধু হতো বিশ্ববিখ্যাত, এবং তার চাহিদা হতো সর্বাধিক।

দেবোদ্যানের মানুষ সরল জীবন যাপন করলেও তাদের মধ্যে কলা প্রীতির এক পরম্পরা বয়ে চলেছে তলে তলে। কলাও তাদের কাছে ধর্মেরই অঙ্গবিশেষ। তারা জানে তাদের পরমগুরু মানী শুধু ধর্ম-প্রবক্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মহান্ চিত্রশিল্পী ও সুরসাধক। এ-ছাড়া কাব্য সাহিত্যেও তিনি অশেষ গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। তাই দেবোদ্যানের কাজ-কর্মকে খুঁটিয়ে দেখলে তাকে প্রকারন্তরে শিল্পীদের গ্রামও বলা চলে। তামা-পিতলের বাসনে, এমন কি মাটির পাত্রেও উৎকীর্ণ করা থাকে সুন্দর ও রঙীন ছবি। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও অন্তরজাগর একদেশিকতার বিরোধী। তাই কখনো দেখা যায় চৈনিক চিত্রকলার শৈলী, আবার কখনো রোমান চিত্রকলার। দেবোদ্যানে ভারতীয় চিত্রকলা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। মিত্রবর্মা স্বয়ং উত্তর ভারতীয় গুপ্ত চিত্রকলায় পারদর্শী আবার বর্তমানে সে পহলবী চিত্রকলার চর্চা করতে শুরু করেছে। সায়াহ্নকালে দেবোদ্যানের উপাসনা গৃহে নানা দেশীয় ভিত্তি-চিত্রের নমুনা দেখে মিত্রবর্মা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।

পরদিন প্রশ্নের উত্তরে অন্তরজাগর তাকে বললেন—"মানুষে-মানুষে ভেদ করা ঠিক নয়। তা করলেই ওর-ধর্ম, আমার-ধর্ম এইসব জাতীয় বদখেয়াল মানুষের মনে আসতে বাধ্য। আমাদের কাছে সারা বিশ্ববাসীই ভাই, কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তবু সে আমারই ভাই। দেশ-কাল-জাতির ভেদমুক্ত হতে পারলে তবেই না আমরা প্রকৃত মানব। তবে হ্যাঁ, শত্রুদের বিরুদ্ধে সাবধান তো থাকতেই হবে। নতুন দুনিয়া গড়তে গেলে শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায় সর্বদা।"

—"এই দুর্গম পর্বতমালা, মাদ ভূমির দুর্দান্ত মানুষ দিয়ে ঘেরা এই দেবোদ্যানেও শত্রুর ভয় আছে?"

—"হ্যাঁ, আছে, মিত্রবর্মা। নিজের অদূর অতীত অভিজ্ঞতার ঝুলিতেই তার প্রমাণ পাবে। আমার মহামান্য গুরু-পরম্পরা যা করতে চেয়েছিলেন, সেটাই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির পথ। আমিও সেই পথে আলো জেলে যাত্রা শুরু করেছিলাম, কিন্তু শুরুতেই শত্রুপক্ষ নিভিয়ে দিলো সেই আলো। কিন্তু যাত্রা তো থামেনি তাতে। যে বিশ্বপ্রেমের বাণী সদ্‌গুরুরা শুনিয়েছিলেন, সে বিশ্বপ্রেমে আমি স্বয়ং বিশ্বাসী, তাকে যাচাই করে দেখবার জন্য দেশে দেশে লোক পাঠানো হয়েছে। চীন-হিন্দ-রোম-যবন দেশ হয়ে তারা গেছে দক্ষিণে আরব-বেদুইনের দেশে, উত্তরে শক-হুন যাযাবরদের কাছে। আজ আমি নিঃসন্দেহ যে বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রেমের থেকে বড় রক্ষাকবচ আর কিছু নেই। যারা গিয়েছিল দেশ-বিদেশে যাত্রার দুরূহ কাজ নিয়ে, তারা যেমন আমাদের

কথা বলেছে, তেমনি তাদের কাছ থেকেও শিখেছে অনেক কিছু। সবথেকে বড় শিক্ষা—কূপমণ্ডূকতা বর্জন!"

—কূপমণ্ডূকতা?"

—"হ্যাঁ, মারাত্মক অভিশাপ! অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অপর নাম। বিজ্ঞানবিরোধী, মানববিরোধী, জীবনবিরোধী এক ভয়ানক সত্তা! যেমন ধরো, এক রোমান জ্যোতির্বিদ বললেন—পৃথিবী গোল। অমনি হাহাকার পড়ে গেল চতুর্দিকে, কটুকথার ব্যঙ্গের ঝড় বয়ে গেল।"

—"আমাদের ভারতে এখনো এক মহান্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জীবিত আছেন, তাঁর নাম আর্যভট্ট। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর ব্যাস ১০৫৬ যোজন এবং পরিধি ৮০০০ যোজন। এ-পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু যেই তিনি বললেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, ব্যাস্, লোক তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দিয়েছে!"

—"লোকেদের দোষ দিও না, মিত্রবর্মা। প্রকৃত দোষী ধর্ম-ব্যবসায়ীরা। সমস্ত নবজাত সত্যই তাদের স্বার্থের পক্ষে হানিকারক, সুতরাং তাতে ধর্মদ্রোহের গন্ধ তারা পাবেই। আর এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করেই টিকে থাকতে হবে আমাদের। আমাদের লড়াই-এর অস্ত্র তলোয়ার বা বর্শা নয়, আমাদের প্রধান অস্ত্র জ্ঞান।"

—"আর জ্ঞান অর্জনের উপায়?"

—"দেশভ্রমণ। শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই নয়, প্রধান লক্ষ্য দেখে-শেখা। আমরা যাদের বিদেশে পাঠিয়েছিলাম, তাদের মাধ্যমে প্রচুর লাভ হয়েছে আমাদের। আমাদের জড়তা দূর হয়েছে, বহুতর ক্ষেত্রে মূঢ়তাও দূর হয়েছে। জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে, এমন কি আর্থিক লাভের অংকও খুব একটা কম নয়!"

একটি সম্প্রদায়ের গুরু বা প্রকৃত নেতা হতে গেলে শুধু দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তাকে একজন অর্থনীতিবিদও হতে হয়, প্রখর ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, এবং তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন অন্তরজাগর স্বয়ং। মিত্রবর্মা দেবোদ্যানে আসার পরই লক্ষ্য করেছিল যে, এখানকার গরুগুলি ইরানের সাধারণ গরুর মতো নয়। বরং সেগুলি গান্ধার, মুলতান তক্ষশিলা অঞ্চলের গরুর মতো আকৃতিতে বিশাল, কিন্তু প্রকৃতিতে শান্ত। অন্তরজাগরের কাছে সে জানতে পারে যে কোয়াতের শাসনকালে ভারত, রোম ও গ্রীস থেকে ভালো জাতের গরু এনে এখানে সংকর-পদ্ধতিতে প্রজনন শুরু করা হয়েছিল। সাধারণ দেশী গরুর তুলনায় এ-গুলি পাঁচগুণ অধিক দুধ দেয়। একই প্রক্রিয়ায় অশ্বের প্রজাতিরও উন্নতি করা হয়। মিত্রবর্মা শুনে অবাক হলো যে, ফল এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সংকর-পদ্ধতিকে সফলভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। দেবোদ্যান যদি কেবল মনুষ্য-শক্তির উপর নির্ভর করে পশুপালন ও কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করতো, তাহলে সফলতা আসতে সময় লেগে যেত

অনেক বেশী, সফলতা যে আসতোই এমন কথাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এখানেই বিদেশী সহায়তার কার্যকারিতা প্রমাণ হয়, বিশ্বমানব মৈত্রীর উপযোগিতা ধারণায় আসে। একে অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভবান হবে, মানবিক সমতার পথে সেটাই তো প্রথম পদক্ষেপ।

মিত্রবর্মা এ-সব ব্যাপার নিয়ে কোয়াতের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। রাজ্য শাসন সম্পর্কে জন্মগত অভিজ্ঞতা আছে কোয়াতের, কিন্তু সমস্ত মানুষের উন্নতি-কল্পে কিছু করবার শিক্ষা রাজতন্ত্র কখনও দেয় না! তাই সবকিছু আশ্চর্য লাগে কোয়াতের, কিন্তু তার মতো বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই বুঝে নেয় এ-সবের অন্তর্নিহিত কারণ। দেবোদ্যানে সব সময়েই যেন নতুন কিছু করবার প্রতিযোগিতা লেগে থাকে এ-দলে ও-দলে। কখনো চাষের সুবিধার জন্য নতুন খাল কাটা হচ্ছে। একদল আবার নিয়ে এসেছে নতুন ধরনের কুটির-নির্মাণের ছক। কোথাও পাহাড়ী জমিকে সমতল করে নতুন বাগিচা বা ক্ষেত তৈরী হচ্ছে। আজকাল কাজ চলছে চাষের জমিতে। নারী-পুরুষ কাজ করছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। চলছে জোর ঠাট্টা-মশকরা, আর মাঝেমাঝেই শোনা যাচ্ছে সমবেত অট্টহাসি। দূরের কোনো ক্ষেত থেকে কেউ হাওয়ায় ভর করে পাঠিয়ে দিলো গানের এক কলি, প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় কলি গেয়ে উঠলো অন্য কেউ অন্য এক ক্ষেত থেকে। একজনের আনন্দে গেয়ে ওঠে অন্য কেউ, অপরের বিরহে কেঁদে ওঠে আরেকজন—এটাই তো বিশেষত্ব দেবোদ্যানের।

দেবোদ্যানের সকলেই কিন্তু ক্ষেতে বা বাগিচায় কাজ করছে না। শিশুরা খেলায় মত্ত আছে, তাদের মধ্যে কোয়াত্-পুত্র কাবুস্‌কেও দেখা যায়। সামান্য বড় যারা, সকলেই মগ্ন আছে লেখাপড়ায়। দেবোদ্যানে এমন কেউ প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ নেই যে পড়তে-লিখতে পারে না। মাধ্যম ইরানী ভাষা, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী কম করে হলেও তিনটি ভাষা শিখছে। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়ছে সারা পৃথিবীর ইতিবৃত্ত। মানীর দর্শনজ্ঞানের পাশাপাশি তারা জানতে পারছে যবন দেশীয় প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মতামত, ভারতীয় নাগার্জুন-অসংগ-দিঙনাগের দর্শন ও ন্যায়-শাস্ত্র। দর্শনের অধ্যাপক একদিন শ্রেণীকক্ষে বলছিলেন—"অজ্ঞান মানেই অন্ধকার, অন্ধকার মানেই ভয়ের জন্ম, ভয়ংকরতার জন্ম। সিঁদেল চোর ও বাটপাড় ছাড়া আলোকে কেউ ভয় পায় না।" মিত্রবর্মার বড় ভালো লেগেছিল কথাটা। সে নিজে উচ্চশিক্ষিত, তাই দেবোদ্যানের শিক্ষার মান সে সহজেই অনুধাবন করে নিতে পারে।

অন্তরজাগরের মতে দেবোদ্যানের সর্বময় মালিক স্বয়ং ভগবান, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর এক একটি নীতি এক একজন দেবতা। তাঁরা হলেন—অন্বেষণ, জ্ঞান, স্মরণ এবং আনন্দ। দেবোদ্যান একটি প্রতীক। মানুষ যদি সমান হয়, সকলে যদি সমান কাজ ও সমান ভোগের অধিকারী হয়, বিশ্বমানব

মৈত্রী যদি সর্বত্র স্বীকৃত হয়—তাহলে পৃথিবীর যে চেহারা হবে তারই প্রতীক। মাত্র তিরিশ বছর আগেও দেবোদ্যান ছিল জনমানবশূন্য। মানুষ কেবল পরিশ্রমের সবল হাত ও মৈত্রীর ভাবনা নিয়ে এসেছিল এই নির্জন উপত্যকায়। ঈশ্বরের দেওয়া মাটি-আকাশ-নদী-পর্বতের পূর্ণ উপযোগ তারা করেছিল। তাই আজ এই চমৎকার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। শুধু বক্তৃতা আর উপদেশে মানুষের জীবনযাত্রা বদলাতে পারে না। তার জন্য চাই বুকভরা ভালোবাসা, কঠোর পরিশ্রম ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা। অন্তরজাগর বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে কোয়াত্‌ ও মিত্রবর্মা, সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে মানুষ অবশ্যই একদিন সেই অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছাবে, যে লক্ষ্য মানব-সমাজের সাম্য, পারস্পরিক প্রেম—যা সার্বত্রিক সুখ-সমৃদ্ধির শর্ত।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দিন চলে যায়। আজকাল দেবোদ্যানের প্রাকৃতিক বাতাবরণে এক নতুন ঋতুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আপেল গাছগুলি নতুন পাতায় ঢেকে গেছে, আর পাতা ঢেকে গেছে অজস্র ফলে। ফলগুলি এখনো সবুজ, কয়েকটিতে ধূসর রক্তিমাভার ছোপ লাগতে শুরু করেছে সবে। আঙুর গাছের লতাগুলি থেকে সবুজ পান্নার স্তবক যেন মাটির বুকে লুটিয়ে পড়তে চায়। আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আজ ক্ষেতে, ফল-বাগিচায়, গোশালা-অশ্বশালে সকলের ছুটি। শুধু ঝোপে-ঝাড়ে-ঘাসে-নদীর কিনারে অনেক নাম-না-জানা ফুল ফুটে বিচিত্র বর্ণের গালিচা হয়ে উঠতে থাকে। ঈশ্বরের কোনো ছুটির দিন নেই।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে গ্রামের নর-নারীদের বন-উপবনে সঞ্চরমান দেখা যায়। কারো পোশাক হলুদ, কারো নীল, সবুজ, লাল, এমন কি সাদা। যেন নানা রঙের এক ঝাঁক প্রজাপতি রঙের জলুস দেখাবার জন্যে একত্রিত হয়েছে বন-ভূমিতে। অধিকাংশ নারী মুক্তকেশী, কয়েকজন তাদের পিঙ্গল-অরুণ-শ্বেতকৃষ্ণ কেশরাশিকে বেঁধে রচনা করেছে কবরী। সবাই ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, আঙুলে আঙুল হাতে হাত জড়িয়ে, উদ্যানে-নদীতীরে-অরণ্যের প্রত্যন্ত সংগোপনে। দেবোদ্যানে আলাদাভাবে ফুল-বাগিচাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সমস্ত উপত্যকাই যেন একটি সুবৃহৎ ফুল-বাগিচা। স্থানে স্থানে নর-নারী ও শিশুদের জমায়েত। কোথাও চলছে হাসি ঠাট্টা, কোথাও বসেছে গানের আসর। একটি সেচ-নালার পাশে মখমলসদৃশ সবুজ ঘাসের উপর তিনজন অনতিত্রিশ যুবক—কেউ বসে, কেউ অর্ধশয়ান অবস্থায় রয়েছে। তিনজনই আমাদের পূর্বপরিচিত—মিত্রবর্মা, কোয়াত্ এবং সিয়াবক্শ। মিত্রবর্মার পাশে সম্বিক্, কোয়াতের সঙ্গে এক সুবর্ণাক্ষী এবং সিয়াবক্শ-এর পাশে এক নীলাক্ষী সুন্দরীকে দেখা যাচ্ছে। শাহেনশাহী অন্তঃপুরের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মহারাণী আজ এক সাধারণ নারীর মতো চোরকাঁটার শীষ দাঁতে কাটছে, আর তল্লীন হয়ে আছে মিত্রবর্মার সঙ্গে কোনো নিভৃত-বার্তায়। কাছেই কোয়াত্ সুবর্ণাক্ষীর কররেখা দেখতে দেখতে কি যেন বলছে, আর সুন্দরী হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সিয়াবক্শ সম্ভবত নীলাক্ষী সুন্দরীকে শোনাচ্ছে তার কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। দূরে শোনা যাচ্ছে শিশুদের কলরব। সেচ-নালার জলে সাঁতার কাটছে এক জোড়া রাজহাঁস। সিংহাসনে সভাসদ বেষ্টিত হয়ে বসে থাকতে অভ্যস্ত কোয়াত্, শৈশবকাল থেকে রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে পালিত কোয়াত্ মনে মনে ভাবছিল—সত্যিই দেবোদ্যানে রয়েছে সে, এ-জায়গার নাম দেবোদ্যান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতো না।

সহসা এক কোকিলকণ্ঠের গান শোনা যায়। নীলাক্ষী গান গাইছে।

কোয়াতের জানা নেই সে গানের ভাষা, সম্ভবত ভারতীয় মিত্রবর্মারও। কিন্তু সুস্বরক্ষেপ অনেক সময় ভাবকে এমন গভীর ও সূক্ষ্ম রূপে ব্যক্ত করে দেয়, যে ভাষা সেখানে গৌণ হয়ে যায়। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে। গাছের পাখিরাও যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। সম্বিকার শরীরে শিহরণ জাগে। সে সজোরে চেপে ধরে মিত্রবর্মার হাত। তার স্ফুরিত রোমকূপের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে মিত্রবর্মা। এক সময়ে শেষ হয় গান। সিয়াবকুশ নীলাক্ষীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। নীলাক্ষী লাজুক হাসে সকলের দিকে তাকিয়ে। কোয়াত্ সম্বিককে উদ্দেশ্য করে বলে—"দেবতারাও এমন সুন্দর স্থানের কথা চিন্তা করতে পারতেন না, তাই নয়, সম্বিকা?"

প্রত্যুত্তরে সম্বিক্ হাসে, তারপর সহসা প্রশ্ন করে—"আমার এই সকলের সঙ্গে খোলামেলা আচরণ তোমাকে ক্ষুব্ধ করছে না তো, প্রিয়তম?"

—"না, সম্বিকা। শুনেছি দেবলোক ক্ষোভশূন্য। নিজেকে দিয়েই বিচার করে দ্যাখো না। সম্রাটের কন্যা তুমি, শাহেনশাহর স্ত্রী—কায়িক পরিশ্রম তোমার দিনচর্যায় ছিল না কখনও! তবু তুমি সাধারণ চাষী বৌ-এর মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষেতে কাজ করছ। তার জন্যে তোমার মনে কি কোনো ক্ষোভ হয় কখনো?"

—"না, কোয়াত্। বরং বাড়তি মেদ কমে যাচ্ছে, পেশীগুলি হয়ে যাচ্ছে লোহার মতো কঠিন। সকালের মাথা ধরার ব্যারামটাও সেরে গেছে!"

কোয়াত্ মৃদু হেসে পরিহাসের সুরে বলে—"বাইরে লোহার মতো কঠিন হয়ে গেলে অসুবিধে নেই সম্বিকা। ভিতরেও যেন আবার অতখানি কঠিন হয়ে যেও না!"

কোয়াতের কথার জবাব দিলো নীলাক্ষী—"পীরোজ-পুত্র, অযথা আকাশ-পাতাল ভেবো না। আমরা দেবোদ্যানের নারী, বাহির-ভিতর দু-দিবেই যদি আমরা লৌহ কঠিন হয়ে যাই, তবুও সময় বিশেষে এবং পুরুষবিশেষে মোমের মতো গলতে বেশী দেরি লাগবে না আমাদের!"

ইংগিতটি বুঝতে পেরে উপস্থিত পুরুষদের মুখে হর্ষের অভিব্যক্তি খেলা করতে লাগলো। সুবর্ণাক্ষী বললো—"আপনাকে মুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য খাহর [ভগিনী] সম্বিক্ যে পরিশ্রম করেছে. যে ঝুঁকি নিয়েছে—তা থেকেই তো প্রমাণ হয়ে যায় অন্দর-বাহির দু-তরফেই সে কতটা কঠোর হতে পারে। কিন্তু খাহর যখন একান্তে আলিঙ্গন করে আপনাকে, ব্যাকুল হৃদয়ে তার ভরাট শরীর চেপে ধরে আপনার শরীরে, তখন সেই কোমল উন্মুখতায় বাঁধা পড়েও কি কঠোরতা মেহ্সুস্ [অনুভব] করেন আপনি?"

সিয়াবকুশ ছদ্মগাম্ভীর্যের ঢঙে বললো—"থাক থাক, কোয়াত্! এ-সব আলোচনা সুন্দরী মহিলাদের সামনে না করাই ভালো! শেষে একটা কেঁচোর খোঁজে হয়ত গুচ্ছের সাপ বেরিয়ে পড়বে!" সম্মিলিত হাসির রোল ওঠে।

মিত্রবর্মা সম্বিকের রেশমী এলো চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললো—"দেখতে দেখতে দু-মাস হয়ে গেল এখানে আসা। আদর্শের কথা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা—অনেক কিছু জানলাম বুঝলাম, আবার অনেক কিছুই বুঝলাম না। নিজের উপলব্ধি থেকে এটুকুই শুধু বলতে পারি—একজন মানুষ আরেকজন মানুষের থেকে ভিন্ন, অনেক ব্যাপারেই তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যাবে না, তাই মাঝেমাঝে নিজেদের মধ্যে মতভেদ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মতভেদ নেহাতই সাময়িক। কারণ দেবোদ্যানের বাতাবরণে স্নেহ ও সহানুভূতির প্রবাহ বইছে অহর্নিশ। সারা পৃথিবীকে তিক্ত করে তোলে যে অর্থলিপ্সা, এখানে তার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বেষ পোষণের সম্ভাবনাও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেবোদ্যানের বাতাবরণ কি সারা দুনিয়াকে প্রভাবিত করতে পারবে?"

সম্বিক্ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো—"অবশ্যই পারবে। কারণ, সুখ-শান্তির জীবন মানবসমাজকে উন্নত করে, যেমন করেছিল যবন দেশের এথেনিয়া নগরে [অ্যাথেন্স, গ্রীস]! এ বিষয়ে তোমার কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়!"

মিত্রবর্মা যেন একটু অস্বস্তিবোধ করলো, কিন্তু এই ভারতীয় যুবকের অভিজ্ঞতা তাকে অসাধারণ সংযম শিখিয়েছে—"রাগ করো না, সম্বিকা। আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি বলে থাকেন যে সুখ-শান্তির নিরবচ্ছিন্ন জীবন না কি মানুষকে স্বার্থপর ও ভীরু করে দেয়। আমি অবশ্য কথাটা বিশ্বাস করি না। আসলে জীবন-ভোগ অজ্ঞানপূর্বকও হয়ে থাকে, আবার জ্ঞানপূর্বকও। ভীরুতা তখনই আসে, যখন ভোগ অজ্ঞানপূর্বক হয়। আর পৃথিবীর যে কোনো দেশে সেটাই হয় বেশী মাত্রায়। দেবোদ্যানে যে উঁচু আদর্শ বিরাজ করছে, সেটা জ্ঞানের পথ। ভারতে আমি দেখেছি—অজ্ঞানের সাময়িক ঝলকানিতে মানুষ জ্ঞানের পথকে বাতিল করে দিচ্ছে, ভুল প্রতিপন্ন করছে। আমি তো বহুবারের ঘরপোড়া গরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। আমি যে কোনো বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, কিন্তু সাবধান হয়ে চললে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা বাড়ে, এটা আমি শিখেছি বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে, বারবার বেঁচে যাবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।"

সিয়াবক্শ চুপ করে থাকতে পারলো না—"মিত্র! আমাদের যুদ্ধেও তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে তুমি। বিদেশী মানুষ, কি প্রয়োজন ছিল যে···"

—"বিদেশী? যে সারা পৃথিবীকে নিজের ঘর বানাতে চায়, তাকে তুমি বিদেশী কেন বলো, সিয়া? অন্তরজাগর যে আদর্শের মন্ত্র দেন, আমিও তো সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত, আমিও তো সেই মন্ত্রেই সিদ্ধি পেতে চাই। তবু বিদেশী বলে দূরে কেন ঠেলে দাও, বন্ধু?"

সহসা পার্শ্ববর্তী গাছের জটলার মধ্যে থেকে অন্তরজাগর বেরিয়ে এসে তাদের সামনে বসেন। স্মিত হাসি তাঁর মুখে। মিত্রবর্মার দিকে তাকিয়ে

বলেন—"তোমার বক্তব্য এখানেই শেষ করো না, মিত্রবর্মা। আমাকেও শুনতে দাও। সংকোচবোধ করো না।"

অন্তরজাগরের উপস্থিতিতে সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সকলেরই মুখে-চোখে এক ধরনের আভা খেলে যায়। মিত্রবর্মা বাক্যের জের টেনে বলতে থাকে—"দেশী-বিদেশীর মধ্যে এই বাছ-বিচার স্বাস্থ্যকর নয়, অন্তত আমাদের আদর্শের পক্ষে তো একেবারেই নয়। দেবোদ্যানের প্রার্থনা-গৃহে প্রথম দিন গিয়েই আমি কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে বিশেষ ধরনের লাল কাপড় পরে থাকতে দেখেছিলাম। আমি জানি লাল কাপড় পরার এই রীতি অবশ্যই নেওয়া হয়েছে বৌদ্ধদের কাছ থেকে।"

অন্তরজাগর ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন—"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। আমাদের পরমগুরু মানী ভারতে গিয়েছিলেন। গান্ধার ও কাশ্মীরেও ছিলেন অনেক দিন। বৌদ্ধধর্মের নীতি অধ্যয়ন করে এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুসরণ করে সে-সবের থেকে তিনি অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। আবার যবন দর্শন পাঠ করে তার কিছু কিছু ভাবধারা গ্রহণ করতেও আপত্তি হয়নি তাঁর। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য হলো যে, সে প্রত্যেকের কাছ থেকে গুণগুলিকেই সাদরে গ্রহণ করবে, অপ-গুণগুলিকে অগ্রাহ্য করবে। এইভাবেই নানা দেশ নানা জাতির বিভিন্ন মতের মিলনের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা গড়ে ওঠে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমতার ভাব জন্মায়। তুমি নিশ্চয় বৌদ্ধ ত্রিরত্ন এবং তার অর্থ জানো?"

—"হ্যাঁ, অন্তরজাগর! ত্রিরত্ন হলো—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। বুদ্ধ, অর্থাৎ পরমজ্ঞানী। ধর্ম মানে সম্যক্ মার্গ, যাকে আপনারা দেরেস্তদীন বলেন। এ-পথে যারা চলে তারা অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, তাদের লক্ষ্য হয় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সকলের কল্যাণসাধন, তৃতীয় রত্ন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান।"

—"বুদ্ধ যে দেশ-কালের আওতায় ছিলেন তাতে কি সঙ্ঘবাদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল?" সম্বিক্ প্রশ্ন করলো।

—"না, সম্বিকা! দেশ-কাল অনুকূল ছিল না মোটেই। এক্ষেত্রে বুদ্ধের মতো ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষে, সঙ্ঘ শব্দটির মাধ্যমে সম্যক মার্গের প্রতি ইঙ্গিতমাত্র করা সম্ভব ছিল। এবং তিনি তাই করেছিলেন।"

অন্তরজাগরের মুখমণ্ডলে প্রসন্নভাব দীপ্ত হয়ে উঠলো। —"আমারও সেই ধারণাই ছিল, মিত্র! আমার মনে হয় সুযোগ ও সাহায্য পেলে তিনি সমস্ত পৃথিবীতে সঙ্ঘবাদ ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন!"

—"নিশ্চয় পারতেন, অন্তরজাগর! কিছুটা পেরেওছিলেন! কিন্তু তিনি অপ্রকট হবার পর সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্র মিলে বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের নির্মমভাবে হত্যা করে, তাদের অধিকাংশ পালিয়ে যায় ভারত ছেড়ে। তাই বর্তমানে ভারতের তুলনায় তার আসপাশের দেশগুলিতে বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের সংখ্যা অধিক!"

অন্তরজাগর কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন—"সর্বত্র একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, একই বিফলতার কাহিনী প্রত্যেক দেশে। আমাদের গুরু পরম্পরা বুদ্ধের মতোই মানুষকে সঙ্ঘবাদ ও সাম্যবাদের সম্যক মার্গ দেখিয়েছেন, আমার চেষ্টাও একই, কিন্তু মাঝেমাঝে মনে হয় বৈষম্যের বিশাল সমুদ্রে সাম্যের দ্বীপ কতদিন আর টিকে থাকতে পারবে! আবার যখন দেখি আমরা এক অকাট্য আদর্শের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখন সাহসে বুক বাঁধি, নতুন সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।"

মিত্রবর্মা চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকে, তারপর বলে—"একটা চিন্তা প্রায়ই মনে আসে আমার, হয়ত ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, তবু আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই অন্তরজাগর! আমার মনে হয়, বুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের বুদ্ধ-প্রভাবিত আচার্যগণ সকলেই সাম্যবাদকে ভোগের সমতা পর্যন্ত সীমিত রেখেছিলেন। ভোগ সামগ্রীর উৎপাদনে সমান শ্রমের বিচারকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তাই দেবোদ্যানের পরিবর্তে সেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অজস্র মঠ স্থাপন হতে পেরেছে, যেখানে শেষপর্যন্ত স্বার্থচিন্তার চাপে সমতার আদর্শ লোপ পেয়েছে। আমি হয়ত একটা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বিষয়টাকে দেখছি, অন্তরজাগর?"

সম্বিক্ এতক্ষণ বড় স্নেহ ও সম্মানের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মিত্রবর্মার দিকে। সে বিড়বিড় করে বললো—"শুধুমাত্র ভোগের সাম্য অবশ্যই অসম্পূর্ণ। আর যা অসম্পূর্ণ, তা গভীরে প্রবেশ করতে পারে না!"

অন্তরজাগর সম্বিকের পিঠে হাত বুলিয়ে সমর্থন জানালেন—"হ্যাঁ, সম্বিকা। শ্রম-সাম্য ছাড়া ভোগ-সাম্য অসম্পূর্ণ। তাৎক্ষণিক অনুভবে হয়ত ক্ষেতে কাজ করে, অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে ছড়া কেটে খুনসুটি করে গান গেয়ে নেচে প্রসন্নবোধ করা যায়, যা আজ তুমি করছ, সুবর্ণাক্ষী, নীলাক্ষী করছে। কিন্তু স্বাদিষ্ট ভোজনও তো একটানা বেশীদিন ভালো লাগতে পারে না! একদিন যারা ভাই-ভাই ছিল, কালক্রমে তারা সংসারী হয়। তারপর একদিন সকলের সন্তান জন্মায় একে একে। যার সন্তান বেশী, তার দুশ্চিন্তাও বেশী। আত্মচিন্তা থেকে আসে স্বার্থচিন্তা! ফলে শেষ পর্যন্ত প্রসন্নতার পরিবর্তে দেখা দেয় অভিযোগ-অনুযোগ-পারস্পরিক ঘৃণাবোধ! তাই আমার পূর্বজ গুরু বিবাহ-প্রথাকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন।"

কোয়াত্ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—"বিবাহ-প্রথা বর্জন? তাহলে সৃষ্টি চলবে কি করে?"

নীলাক্ষী হেসে ফেলে—"বোকা কোথাকার! বিবাহের মন্ত্র না পড়লে সৃষ্টি থেমে যায় না কি?"

অন্তরজাগর বলতে থাকেন—"সৃষ্টি আপন নিয়মেই চলতে থাকে, চলতে থাকবে! কারণ প্রেম হলো জীবনের স্বাভাবিক রস। তাছাড়া, বিবাহ হলেই যে স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না, বা স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে

কামনা করবে না, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়মও তো নেই। আমি প্রেমের নিয়মের কথা বলছি, সামাজিক বাধা-নিষেধের কথা বলছি না!"

কোয়াত্ ব্যাপারটা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। সংস্কারে আবদ্ধ মন তাই বিদ্রোহ করে ওঠে—"বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া সন্তান জন্মালে সমাজে তাদের স্থান হবে?"

অন্তরজাগর গম্ভীর হয়ে গেলেন—"সেইজন্যেই সমাজের পরিবর্তন করতে হবে সকলের আগে। সমাজ যখন সঙ্ঘবাদী হয়ে যাবে, তখন সমাজের সদস্যদের প্রেমের ফসল হবে সঙ্ঘের সম্পত্তি, সঙ্ঘের সন্তান। তখন আর 'ওর-আমার' জ্ঞানটা থাকবে না, স্বার্থ থাকবে না, পক্ষপাত থাকবে না, বৃথা বংশগৌরবের প্রশ্ন থাকবে না!"

—"আমি লক্ষ করেছি, অন্তরজাগর, দেবোদ্যানে যারা আজ বিশ বছরের যুবক, তারা পিতৃপরিচয় দেয় না, মা'র নাম বলে"—মিত্রবর্মা বললো।

—"যেমন কাবুস্ আমাকে চেনে, কিন্তু তোমাকে জানে না, কোয়াত্!" —হেসে বলে উঠলো সম্বিক্।

—"দেবোদ্যান স্থাপিত হয়েছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। তাই এখানে ও-রকম তরুণ-তরুণীর সংখ্যা অনেক পাবে, মিত্রবর্মা! অন্ততপক্ষে দেবোদ্যান কমপক্ষে 'ওর-আমার' চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন না হোক, এটাই আমি চেয়েছিলাম! ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় আমার চিন্তাধারা ভুল, তাহলে পরিবর্তন সাধনের পথ খোলাই থাকবে। তবে আমার মনে হয়, সন্তানসন্ততি সঙ্ঘের সম্পত্তি হলে তাদের নিরাপত্তা বাড়ে, মাতা-পিতাও সঙ্ঘের কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারে।"—অন্তরজাগর মনোভাব বুঝবার প্রয়াসে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

নীলাক্ষী কোয়াতের উদ্দেশে বললো—"তবু মা'র পরিচয়েই সন্তান পরিচিত হবে, মাকেই সে মনে রাখবে!"

অন্তরজাগর বুঝলেন যে কোয়াত্ এখনো দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু তরুণী তিনজন নতুন ধারণাটিকে মনে মনে বিচার করছে। তিনি যেন নীলাক্ষীকেই উত্তর দিলেন—"মাকেই তো বেশী প্রয়োজন হয় শিশুর। সামাজিক সমতার খাতিরে শিশুর উপর মা'র অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করা যায় না! তবে এ-কথা ভুললে চলবে না যে, সমতা ভিন্ন সুখ-শান্তির আশা নিছক দিবাস্বপ্ন মাত্র!"

মানুষের শ্রমের ফসলে প্রান্তর ও উদ্যান ভরে উঠেছে। এ-বছরের উৎপাদন দেখে মনে হয় ভাণ্ডার উপছিয়ে পড়বে। জমিতে বীজ বোনার সময় ও লাঙলের সময় যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, ফসল কাটবার ও সঞ্চয় করবার সময়ে তৎপরতা তার থেকে বেশী ছাড়া কম নয়। ফল-বাগিচায় তো সোনালি ও কালো আঙুরের রূপ ও সোঁদা সোঁদা সুগন্ধে যেন নেশা ধরে যায়। বাগিচায় নারী-পুরুষ ছাড়াও রয়েছে শিশুদের একটি বড় দল। শিশুরা কাজে সহায়তা করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছে, না কি আঙুরের মিষ্টি রসালো দানার লোভে, সে-কথা বলা মুশকিল। তবে শিশুদের যদি বলা হয় যে, তারা কাজের বদলে অকাজই করছে বেশী, তাহলে তারা সকলরবে প্রতিবাদ জানাবে, কারণ দৌড়ে দৌড়ে আঙুরগুচ্ছ একত্রিত করার কাজে কেউই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না।

প্রকৃতি পূর্ণ যৌবনের সমস্ত সম্ভার নিঃশেষ করে দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুড়ি হয়ে যাবে। পাহাড়ের ওপরের দিকে গাছপালায় হলুদ রঙ ধরতে শুরু করেছে। সমতলে এখনো ঠাণ্ডা পড়েনি। গ্রামের ঘরাঠ্গুলিতে [আটা-চাক্কি] শীত ঋতুর সঞ্চয়ের জন্য আটা পেষানোর কাজ চলছে অবিরাম। আলাদাভাবে চলছে গবাদিপশুর জন্যেও খাদ্য সঞ্চয়ের কাজ।

একদিকে যখন দেবোদ্যানের মানুষ শীতঋতুর নিষ্ফলা অকারুণ্যের বিরুদ্ধে পাঁচমাসব্যাপী যুদ্ধের রসদ সঞ্চয়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে তখন তৈরী হচ্ছে অন্যান্য যোজনা। একটি বিশেষ যোজনার উপর বিচার-বিবেচনা করবার জন্য, যার মীমাংসা করতে হবে অবিলম্বে, এক স্থানে জমায়েত হয়েছে সম্বিক্, কোরাত্, সিয়াবক্‌শ, মিত্রবর্মা, অন্তরজাগর ও আরো কয়েকজন। কোয়াত্-মিত্রবর্মা-সিয়াবক্‌শ দেবোদ্যানে এসেছে প্রায় ছ-মাস। বাইরের দুনিয়ার খবর নিয়মিত এসে থাকে তাদের কাছে। তাই তারা কোয়াতের নিরাপত্তা সম্পর্কে সবিশেষ চিন্তিত। বিস্মৃতি কারাগার থেকে পলায়নের খবর বেশীদিন গুপ্ত থাকেনি। শত্রুপক্ষ ধূর্ত ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজছে তাকে। গত ছ-মাসে ইরানের সমস্ত প্রান্তে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে কোয়াত্‌কে। দেবোদ্যান যদি দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত না হতো, তাহলে কোয়াতের পক্ষে এতদিন লুকিয়ে থাকা সম্ভব হতো না। উপরন্তু মাদ ভূমির প্রাদেশিক অধিকর্তা ছিল অন্তর-জাগরের গোপন অনুগামী। তাই যতবার তস্পোন থেকে তার উপর আদেশ এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাদ প্রদেশের সেনাবাহিনী দেবোদ্যানকে বাদ দিয়ে নিশাপুর-কনারংগ-গাঁজস্তান-জাবুলিস্তানে খোঁজখবর নেবার যেন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অঞ্চলগুলি কেঁপে উঠেছে তাদের দাপটে। হয়ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে কোয়াত্‌কে সারা জীবন নির্বিঘ্নেই আশ্রয় দেওয়া যায় দেবোদ্যানে, কিন্তু

সে জীবন ভূতপূর্ব সম্রাটের কাম্য হতে পারে না, আর দেরেস্তদীনের বিকাশের পক্ষেও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই আজকের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়—কোয়াত্‌কে এমন কোনো স্থানে পাঠানো হোক যেখানে সে নিরাপদ, যেখান থেকে সহায়তা নিয়ে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সে আবার ইরানের সিংহাসনে আসীন হতে পারবে, কারণ কোয়াত্‌ শাহেনশাহ থাকলে দেরেস্তদীনের স্বপ্ন সাকার হতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু কোথায় সেই স্থান, যেখানে কোয়াত্‌ শুধু আশ্রয়ই নয়, সামরিক সহায়তাও পেতে পারে?

চীন এক তো অনেক দূর, উপরন্তু বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। কম্বোজ ও যবদ্বীপের কাছে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সামরিক সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। দক্ষিণ ভারতে তিনটি শক্তিশালী রাজ্য আছে—কাদম্ব, গঙ্গ এবং পল্লব। পল্লব রাজবংশটি আদতে ইরানী পহলব বংশ, যাদের একটি শাখা তিনশ' বছর আগে ভারতে চলে যায় এবং কালক্রমে রাজত্ব স্থাপন করে। তারা কোয়াত্‌কে সানন্দে আশ্রয় দেবে এটা অনুমান করা খুব স্বাভাবিক। সিয়াবক্‌শ মনে করে যে তারা সামরিক সহায়তাও দিতে রাজী হবে। মিত্রবর্মার ব্যবহারিক বুদ্ধি তুলনায় অনেক বেশী। পহলব বংশ পদচ্যুত সাসানী শাহেনশাহকে সবরকম সাহায্য করবে—এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে ইরানে আসতে হলে জলপথেই বেশী সুবিধা। অথচ, নৌ-বহর নিয়ে এতখানি দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এসে হয়ত-বা তারা তস্পোন অবরোধ করতেও পারে, কিন্তু তাতে সফলতার আশা নেই বললেই চলে।

দাড়ি খুঁটতে খুঁটতে চিন্তামগ্ন স্বরে অন্তরজাগর বললেন—"নৌ-বহর নিয়ে তস্পোন পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব। স্থল-সেনা ছাড়া তস্পোন-জয় হতে পারে না। বাইরের নৌ-সেনা তিগ্রা নদীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দু-দিক থেকে স্থল-সেনার ভয়ংকর আক্রমণ শুরু হবে। পৃথিবীর কোনো নৌ-বহরই সে আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। তস্পোন সমুদ্র-বন্দর হলে তবু হয়ত সম্ভাবনা ছিল।"

মিত্রবর্মা পৃথিবীর বহু দেশের সামরিক-শক্তি সম্পর্কে খবরাখবর রাখে। সে জানালো—"ভারতের উত্তরাঞ্চলের স্থলসেনা সম্ভবত এই বিশ্বে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু তারা কখনও কপিশ-এর [কাবুল] এ-পারে এসেছে বলে শুনিনি। আজকাল বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ভারতও অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা বড় অংশ চলে গেছে হূনদের অধিকারে।"

হঠাৎ অন্তরজাগর সচকিত হলেন—"হূন? না, না, কেদারীয় হূন হবে। সোগ্দ-এর উত্তর দিকে মহানদীর ওপারে যে শক-দ্বীপ ছিল, হূনরা সেই দেশ জিতে নেয়। তাই শক-দ্বীপ থেকে যারাই বাইরে যায়, তাদেরই লোকে হূন বলে থাকে। এমন কি কুষাণরাও তো প্রকৃতপক্ষে শক-দ্বীপের মানুষ। সারা

পৃথিবীতে শক-দ্বীপের মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে, নিজেরা নির্যাতিত হয়েছে বলে অপরের উপর নির্যাতন করেছে তারা, আর সকলে বলেছে হূনেরা বর্বর। যাক গে সে-সব কথা, আমাদের এখন দেখতে হবে কোয়াত্ কোন দেশে আশ্রয় পেতে পারে, কোন দেশ সামরিক সহায়তা দিতে পারে তাকে।"

সিয়াবকুশ কিছুক্ষণ ভেবে জানালো—"রোমের কাইজার আমাদের শত্রু কিন্তু নিকটতম প্রতিবেশী।"

অন্তরজাগর হাসলেন—"বড় শিশুসুলভ মন তোমার, সিয়াবকুশ! মনে রেখো, রাজনীতি বাহুবলের দ্বারা পরিচালিত হয় না। সেখানে কূটবুদ্ধির প্রয়োজন হয়, এমন কি বদ-বুদ্ধিরও! এবং কোয়াত্ বর্তমানে যে মতবাদের সমর্থক, অতীতে সে যে পদমর্যাদায় আসীন ছিল, তাতে করে কূটবুদ্ধি এবং বদ-বুদ্ধি রোমের কাইজারকে বাধ্য করবে প্রথমে কোয়াতের আশ্রয়-প্রার্থনাকে স্বীকার করতে, পরে তাকে বন্দী করতে।"

মিত্রবর্মা গম্ভীর স্বরে বললো—"দেরেস্তদীন ও কোয়াত্ অভিন্ন নয়, যদিও দেরেস্তদীন মুখ্য এবং কোয়াত্ ব্যক্তিগতভাবে গৌণ—কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না, এটাই বর্তমানকালের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নীতি!"

অন্তরজাগর বলে উঠলেন—"তাহলে দেখা যাচ্ছে কেদারীয় রাজা তোরমানই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।"

—"তোরমান গুপ্তসাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছেন। 'সদ্যো মুণ্ডিতমত্ত হূণচিবুকপ্রস্পর্ধি-নারংগক'—এক ভারতীয় লেখক বর্ণনা করেছেন, যাদের নাম শুনলে না কি ভারতীয়দের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" মিত্রাবর্মা বললো।

সিয়াবকুশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—ভারতের মতো বিশাল দেশেও কি বীরপুরুষের অভাব হয়ে পড়েছে?"

—"না, তা নয়! কিন্তু বীরত্ব খরচ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ঘরোয়া বিবাদে! বিভেদ বড় মারাত্মক বস্তু, বন্ধু সিয়াবকুশ! আর আমার ভারতবর্ষের একতা নিয়ে আলোচনা হতে হতেই সতেরো রকমের বিভেদ দেখা দেয়! তুমি হয়ত তার কারণ জিজ্ঞেস করবে। অন্যতম প্রধান কারণ বৃত্তিমূলক সমাজগঠন। যেমন, যুদ্ধ করবার অধিকারী কেবল ক্ষত্রিয় জাতি, যারা সংখ্যায় একশ' ভাগের পাঁচ ভাগ!"

কোয়াত্ চুপ করে ছিল এতক্ষণ। —"ইরানেও শুধুমাত্র সামন্ত প্রভুরাই যুদ্ধের অধিকারী। কিন্তু বহুবার মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিকদেরও অধিকার দেওয়া হয়।"

অন্তরজাগর চিন্তার প্রবাহ থেকে কখনও বিচ্যুত হন না—"তাহলে কেদারীয় হূন! বর্তমান রাজা তোরমান কোয়াতের ভগ্নিপতি, যুবরাজ মিহিরগুল সমবয়স্ক বন্ধু। কোয়াত্ কৈশোর অবস্থা অবধি কেদারীয় হূনদের

আশ্রয়েই ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিশেষ বাচ-বিচার নেই। সুবর্ণ দিনার পেলেই তারা খুশী থাকে। তাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলির অনেক কিছুই নিছক গল্পকথা! তবে আসল ব্যাপারটা হলো স্বর্ণ-দিনারের চাহিদা! প্রকৃতপক্ষে কেদারীয় হূন তো এখনো তাঁবু-বাসী দস্যু, তাই তাদের দোষ দেওয়া যায় না! সুতরাং কোয়াত্ সেখানে আশ্রয় তো পাবেই, বুদ্ধি খরচ করতে পারলে সামরিক সহায়তাও জুটতে পারে। সীমান্ত থেকে তম্পোন পৌঁছানো পর্যন্ত কত দিনার তারা লুট করতে পারবে, তার একটা ছবি বারবার তাদের কল্পনার চক্ষে আঁকতে হবে তোমাকে। তাহলেই কেল্লা ফতে।"

—"কেদারীয় হূনদের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার জানা আছে, অস্তর-জাগর! আপনার নির্দেশ অনুসারে, সিয়া ও মিত্রের বুদ্ধি ও বাহুবলের সহায়তায়, এ-কাজ কঠিন হবে না।"

—"তাহলে কোয়াত্ যাবে হূন-রাজ্যে!" অস্তরজাগর বললেন।

—"পথ দুর্গম, পদে পদে বাধা, তবু আমি বিশ্বাস করি যে ধর্ম-ভাইরা থাকতে কোয়াতের কোনো অসুবিধা বা বিপদ ঘটবে না।" সিয়াবকুশ হেসে বললো। অনেক দিন পরে সে মনের মতো একটা কাজ পেয়ে খুশী।

এখনো হিমানীসম্পাতের সময় আসতে দু-মাস দেরি আছে। সামনে পর্বতের চূড়া তবু বরফে আচ্ছাদিত। এ-পর্বতের চূড়া থেকে বরফ সরে না সারা বছর। যদিও পর্বতটিকে মনে হয় হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে, প্রকৃতপক্ষে সেটি অনেক দূরে। আসলে বিশালতার কারণেই মনে হচ্ছে সেটি খুব কাছে। উপত্যকার পথ ধরে গাধার পিঠে আসীন দুটি তরুণ চলেছে খোশগল্প করতে করতে। একটু আগেই তারা পিছনে ফেলে এসেছে একটি ছোট্ট জনপদ। দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামটির কুটিররাজি, হালকা কুয়াশায় আবছা দেখাচ্ছে।

একটি ছোট নদীর কিনারে পাথরের উপর বসে আছে এক সুন্দরী তরুণী। তরুণ যাত্রীদের দেখে সে উঠে দাঁড়ায়, এবং অনুযোগের সুরে বলে ওঠে—"দেবর! তোমাদের জন্যেই পথে রুখতে হলো আমাকে! এত দেরি কেন?"

—"আর বলো না, বউদি! তোমার এই গাধা দুটো একেবারে বেকার! মোটে চলতে চায় না।" ছদ্মবেশী মিত্রবর্মা বিরস মুখে অভিযোগ জানালো।

—"আমাদের দল কিন্তু এতক্ষণে সামনের সেই গাঁয়ে পেঁছে গেছে, যেখানে আজকের রাতের জন্য আমরা ডেরা লাগাবো! শুধু তাই নয়, তাঁবুও নিশ্চয় খাটানো হয়ে গেছে!"

—"সে তোমার গুল আর বুলবুল চলতে না চাইলে আমরা আর কি করবো বলো!"

দ্বিতীয় তরুণটি গম্ভীরভাবে বললো—"একটা কাজ অবশ্যই করা যেতে পারে। অবোলা প্রাণীদুটিকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটা! উফ্, শেষকালে গাধার পিঠে চড়তে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি এ-কথা!"

জিপসি তরুণীটি বেশ রাগত স্বরে জবাব দিলো—"দিল্লগী আর কি! ছেড়ে দেবে! এই স্পষ্ট শুনে রাখো, গাধার দায়িত্ব যখন নিয়েছ, দরকার হলে ওদের পিঠে করেও বইতে হবে, কিন্তু সামনের ডেরা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে নিয়ে পেঁছানো চাই! বুঝলে? আর যায় উপর সওয়ার হবে তাকে চালাতেও জানা চাই! আসলে গাধাও বুঝে গেছে যে তোমরা আনাড়ি! দ্যাখো, এইভাবে চালাতে হয়···" বলেই সে হাতের লাঠি দিয়ে দমাদ্দম পেটাতে লাগলো গাধা দুটোকে। সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ বেড়ে গেলো তাদের। তরুণীটি হেসে বললো—"এইভাবে হাঁকাতে হয়! কত কি যে শেখাতে হবে তোমাদের!"

প্রথম তরুণটি চোখ টিপে হেসে বললো—"দেবর আনাড়ি হলে তাকে বউদিরাই তো সব কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়! বউদি জাতি না থাকলে বেচারা দেবরদের যে কি হাল হতো, কে জানে!"

তরুণী ভুরু নাচিয়ে বললো—"আহা হা হা! বেচারা না বেচারা! দুধের বাছা যেন সব!"

—"বউদি, ভুললে চলবে না, আমি কিন্তু তোমার একান্ত অনুগত ছাত্র। দু-বার দেখালেই সব কিছু শিখে ফেলি।" দ্বিতীয় তরুণ বললো।

পথের দু-ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটি কুটির। বউদি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—"সত্যিই ভালো ছাত্র তুমি, তাতে সন্দেহ নেই কোনো। গ্রাম পেরিয়ে চলো তাড়াতাড়ি, ততক্ষণ কথা বন্ধ।"

ছোট জনপদ। বড় জোর পঁচিশ-ত্রিশ ঘর বাসিন্দা। কিন্তু অন্যতম প্রধান বণিক-পথ হবার ফলে এ-পথে প্রায় সর্বদাই ভিড় লেগে থাকে। সুতরাং গ্রাম-বাসীদের ভালো-মন্দ আমদানীও হয়ে থাকে। তারাও মানুষের চেহারা দেখেই বুঝতে পারে কে মালদার আর কে কপর্দকহীন। কাজেই গাধা হাঁকিয়ে দু-জন জিপসি পুরুষ চলেছে, সঙ্গে এক তরুণী, সেদিকে তাকিয়েও দেখলো না কেউ। উপরন্তু, তাদের ছেঁড়া পোশাক ও মলিন চেহারা দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলো সকলে। এ-সব লোক যদি রাতের আশ্রয় চেয়ে বসে তাহলেই তো মুশকিল। তার উপর আবার জাতে জিপসি। না আছে ঘরের ঠিকানা, আর না আছে কোনো আচার-নিষ্ঠা। পাকা চোর এক একজন। এইসব ভেবে গ্রামের লোক আমলই দিলো না তাদের। বরং সকলেই কিছুটা সন্ত্রস্ত হলো। বিশেষ করে মা-রা, যাদের শিশু সন্তান আছে। নাচ-গানে জিপসিদের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অসম্ভব নোংরা হলেও জিপসি নারী-পুরুষ সাধারণত অসামান্য রূপবান হয়ে থাকে। নানা ধরনের দুঃসাহসিক খেলা দেখাতেও তারা ওস্তাদ। সাধারণ মানুষের ধারণা জিপসিরা সকলেই ভোজবাজিতে পারদর্শী। এবং এদের অন্যতম প্রধান ব্যবসা না কি বাচ্চাদের চুরি করে দেশ-বিদেশের দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা। কাজেই জিপসি তরুণী এবং তার সঙ্গীদের দেখে গ্রামবাসীদের ভীত ও হুঁশিয়ার হয়ে ওঠা, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ঘরে বন্ধ করে দেওয়া, এ-সব স্বাভাবিক ব্যাপার। তরুণীটি বুঝতে পারছিল সবই, কিন্তু কোনো-দিকে না তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে গ্রামের সীমানা পার হয়ে গেল। জিপসি দলটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানালাগুলি খুলে গেল। শিশুদের কোলে নিয়ে মা-রা বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অপসৃয়মান জিপসিদের দেখতে লাগলো।

গ্রাম থেকে তারা বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছে। সামনে বৃক্ষহীন পাহাড়ের সারি। এখান থেকে পথ ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে। গাধার পিঠ থেকে নেমে পুরুষ দু-জন এখন পায়ে হেঁটে চলেছে তরুণীর পাশাপাশি। গাধা-দুটির পিঠে এখন শুধু দুটো করে বোঁচকা। তাই তারা দ্রুত চলতে পারছে। অবশ্য দণ্ডধারিণীর ভয়ও আছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর প্রথম তরুণটি বললো—"হ্যাঁ, বউদি, কি যেন বলছিলে তুমি!" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তরুণী উত্তর দিলো—"সে-কথা পরে বলবো না হয়। সাধারণ মানুষ কি চোখে আমাদের দেখে, সেটা কি বুঝতে পারলে?"

—"ঘৃণা ও শঙ্কার দৃষ্টিতে।"

—"নিজেদের জ্ঞাতি-বিরাদর ছাড়া অন্য সকলকে সন্দেহের চোখে দেখা, ঘৃণা করা—এটাই গৃহস্থের ধর্ম। এটা তারা শিখেছে পুরোহিতদের কাছে। তাই জিপসিদের সম্বন্ধে, কন্‌জরদের সম্বন্ধে [ভ্রাম্যমাণ গায়ক ও নর্তক। জিপসিদের স্থায়ী ডেরা থাকে না, কিন্তু কন্‌জরদের থাকে। শীতকালে তারা ডেরায় ফিরে যায়, বসন্তের শুরুতেই আবার বেরিয়ে পড়ে।] নানা সত্য-মিথ্যা গল্প বানিয়ে তারা তাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছে। আমাদের জামা-কাপড় ময়লা, শরীর ময়লা, আচার-বিচার আলাদা—সেই কারণে।"

—"বাচ্চা চুরির ব্যাপারটা তাহলে সত্যি নয়?"

—"হয়ত কোনোদিন কেউ বাচ্চা চুরি করে থাকবে, দোষটা এসে পড়েছে পুরো সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। কোন সমাজে চোর নেই বলো তো, দেবর? তা বলে কি সকলেই চোর। আসলে ওরা পোশাক দেখে মানুষ বিচার করে। আমাদের জিপসিদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন রাজ-দরবারে সঙ্গীতকারের আসন পেয়েছে। তারা আরামের জিন্দগী কাটায়, রোদে-বৃষ্টিতে-শীতে পথে পথে ঘোরে না, তাই তাদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি। কেউ তাদের সন্দেহের চোখে দেখে না। আর আমাদের কোলে গৌরবর্ণ শিশু দেখলেই লোকে বলবে—'পেলো কোথা থেকে। চুরি করেছে নিশ্চয়!' জিপসিদের মধ্যে যেন শিশুর আকাল পড়েছে।"

তরুণী যে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জিপসিদের কোনো স্থায়ী ডেরা নেই এ-কথা সত্যি হলেও তাদের শিকড় আসলে ভারতেই। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখনও ইরানী জিপসি, পূর্ব ইউরোপীয় জিপসি, তুর্কী জিপসি ইত্যাদি পৃথকীকরণ হয়নি। তারা সব দেশেই তখন ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু এ-কথা কেউ ভোলেনি যে ভারতেই উৎপত্তি হয়েছে তাদের। এমন কি, অনেকে ভারতীয় ভাষাও ভোলেনি। আর্মেনিয়া, আইবর অঞ্চল পর্যন্ত যারা চলে গেছে, তাদের ভাষায় বিকৃতি এসে গেছে। কিন্তু ইরানী জিপসিরা ভারতে যাতায়াত করবার ফলে দু-দেশের ভাষা তো জানেই, আবার মধ্যবর্তী দেশগুলির ভাষাও তারা শিখে নিয়েছে। ইরানের মেওয়া যেমন এদের পছন্দ, ভারতের আমেরও তেমনই ভক্ত তারা। বর্তমানে যাদের বয়স আঠারো কি কুড়ি, তারা হয়ত শেষবার ভারতে গেছে আট কি দশ বছর বয়সে। তবু তারা সেখানকার বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র, গাছে ঢাকা পাহাড়-শ্রেণী, বিশাল নদীগুলির স্মৃতি আজও ধরে রেখেছে হৃদয়ে। ভ্রাম্যমাণ জীবনের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ তাদের যেন দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়িয়ে ফেরে, তাদের জীবনরসও হয়ত নিহিত আছে এর মধ্যেই। জিপসিদের কেউ কোনো রাজ্য-সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে না। তারা কোনো সীমারেখাকে গ্রাহ্য করে না।

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাবার সময় বাধা কি আসে না তা বলে? অবশ্যই বাধা আসে, কিন্তু সকলেই জিপসিদের স্বভাব জানে। যত বাধাই আসুক না কেন, তারা যেখানে যেতে চায় সেখানে যাবেই। নাচ-গান ছলা-কলা যাদু-টোনা, যা হোক্ কিছু দেখিয়ে রাজ্য সীমা তারা অতিক্রম করে যাবেই। অনেক সীমান্তে আবার তাদের নাচ-গানের জন্যেই প্রহরীরা উত্যক্ত করে, একদিন দু-দিনের জন্য আটক করে রাখে। গত বছর বসন্তকালে এই দলটি ছিল রোম রাজ্যে, বর্তমানে অর্ধেক ইরানের অধিক পথ পার হয়ে এসেছে, দু-একদিনের মধ্যেই তারা পেঁছে যাবে রাগ নগরে [বর্তমান তেহরান], এবং একমাসের মধ্যে হুন রাজ্যে।

প্রথম তরুণটি বললো—"তোমাদের এই ঘুমক্কড় জীবন বেশ লাগে, বউদি! আসলে আমিও তো কম ঘুরিনি পথে পথে! সেই আঠারো বছর বয়সে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কোথায় যাব জানতাম না! শুধু পথ চলা, দেখা, আর শেখা! কিন্তু আজ আমি জানি, আমাকে, আমাদের সকলকে একটা বিশেষ লক্ষ্যে পেঁছাতে হবে!"

—"এসো না, দেবর, আমাদের দলে! আমার ছোট বোন বর্দ্কে [গোলাপ] তুলে দেব তোমার হাতে…"

—"সে কি বউদি! তুমি জানো যে তোমাকেই আমি জীবনের ধ্রুবতারা করেছি, আর ছোট বোনের কথা তুলে আমার অন্তরে দাগা দিচ্ছ শুধু শুধু!"

—"না রে পাগল! তোকে কি দাগা দিতে পারি কখনো! আমি তো জানি থাকবি না তুই, চলে যেতে হবে তোকে, তবু ছাড়তে হবে মনে করেই আকুল হয়ে উঠি!"

— "এখনো তো অনেক দিন পথ চলতে হবে পাশাপাশি! খোরাসান আর গুরগানের রাস্তা যেখান থেকে আলাদা হয়ে গেছে, ততদূর পর্যন্ত!"

—"হ্যাঁ, মজ্দক বাবা বলেছেন আমাকে। তবু তোকে বেঁধে রাখতে ইচ্ছে হয়!"

—"মনে মনে বাঁধা থাকবো, বউদি! চিরকাল! তুমি তো শুধু পথ-চলতি বউদি নও, গত তিন সপ্তাহে অনেক কিছু শিখেছিও তোমার কাছে! শিক্ষাগুরুদের আমি ভুলি না কখনও!"

—"তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভোল পালটে তুই এমন জিপসি হয়ে গেছিস, যে অন্য কিছু ভাবতেই পারি না তোকে! তা তোর এই সঙ্গীটা কথাবার্তা বলে না কেন রে?"

দ্বিতীয় তরুণটি জবাব দিলো—"আমাকে একজন গুণীন বলে দিয়েছে যে দেবর-বউদির কথাবার্তার মধ্যে কখনও কথা বলতে নেই! তাই আমি কেবল শুনে যাই! তবে মাঝে মাঝে তোমরা কি একটা ভাষায় কথা বলো, বুঝতে পারি না! তখন গুল আর বুলবুলের ঘোঁত ঘোঁতানি শুনি!"

প্রথম তরুণ প্রশ্ন করলো—"তাহলে বউদি, আমাদের কেউ জিপসি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না তো ?"

—"না, ভাই ! তুই যখন প্রথম এলি, চুল তোর কালোই ছিল আমাদের মতো ! রঙও তো সামান্যই উজ্জ্বল ছিল আমাদের থেকে ! তবে ভাই, তোদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। চুল-দাড়িতে একদিন কলপ্ না লাগালেই তো হলুদ রঙ দেখতে পাওয়া যায় ! বিশেষ করে তোর বন্ধু গাধা-প্রেমীর !"

ইতিমধ্যে তারা হিমাচ্ছাদিত সেই পর্বতটির সানুদেশ অতিক্রম করছে। তরুণী জিপসির দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পর্বত পরী এবং দানোদের আস্তানা। প্রথম তরুণ অনেক ঠাট্টা-পরিহাস করেও তার কুসংস্কার দূর করতে পারলো না।

সহসা দ্বিতীয় তরুণটি মন্তব্য করে উঠলো—"আমাদের অন্তরজাগর, মানে তোমার মজ্দক বাবা কিন্তু পরী-দানোতে বিশ্বাস করেন না!"

তরুণী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হাতের লাঠি মাটিতে ঘন ঘন ঠুকতে ঠুকতে বললো—"খবরদার ! এই জঘন্য অপবিত্র স্থানে পবিত্র মানুষটির নাম নেবে না বলে দিচ্ছি!"

প্রথম তরুণ তার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখে অবাক হলো। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলো—"অন্তরজাগরকে তুমি এত সম্মান কেন করো, বউদি ?"

—"এটা কি একটা প্রশ্ন হলো, দেবর ? দেখছ না, গৃহহীন গোত্রহীনকে সারা দুনিয়ার মানুষ কতটা ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দ্যাখে। যারাই তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত, তাদের দ্বারা নিন্দিত—তাদের প্রতি দরদী এক বিরাট মাপের মানুষ—অন্তরজাগর, আমাদের মজ্দক বাবা ! আমাদের সন্তান-সন্ততিদের তিনি অনায়াসে কোলে তুলে নেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের তিনি প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এমনভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন যেন সবাই তাঁর পরম আত্মীয় ! তাঁকে শ্রদ্ধা করবো না ! আকালের সময়ে তম্পোনে ছিলাম আমরা, হয়ত দল-কে-দল অনাহারে মারা পড়তাম ! তিনি নিজে হাতে বয়ে আনলেন আনাজ ! আমি কেঁদে ফেলেছিলাম ! দেখছ তো কি রকম ময়লা পোশাক, কি রকম নোংরা আমি ! তবু তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে, বর্দককে ! আহ্, কি ঠাণ্ডা সেই বুক, অথচ হৃদয় কত উষ্ণ ! তারপর চোখের জল মুছে দিলেন আমার ! তাঁকে আমি ভালোবাসবো না, সম্মান করবো না ?"

হঠাৎ প্রথম তরুণটি চেঁচিয়ে উঠলো—"সাবধান ! সাবধান ! সামনে দ্যাখো, পরী দাঁড়িয়ে আছে !"

তরুণী হেসে ফেললো—"ফাজলামি করবি না একেবারে ! ও আমার বোন, বর্দক ! তোরা পেঁছাচ্ছিস না দেখে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। তুই নিশ্চয় ওর উপরেও যাদু চালিয়েছিস, বদমাস ভারতীয় !"

তারা বর্দকের কাছে পেঁছায়। অপূর্ব সুন্দরী সে। সত্যিই যেন আধ-ফোটা গোলাপ! সমস্ত শরীর ছাঁচে ঢালা, মেঘবরণ কেশরাশি জলপ্রপাতের মতো নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত।

—"এত দেরি কেন তোমাদের? ভাবলাম, ডাকাতের হাতে পড়লে না তো!"

প্রথম তরুণটি তার খুব কাছে গিয়ে বললো—"আগে যদি জানতাম, ডাকাত ডেকে ইচ্ছে করেই ধরা দিতাম তাদের হাতে!"

বর্দক এক অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গিমা করে বললো—"রাতের খাবার তৈরী হয়ে গেছে। সবাই বসে আছে তোমাদের জন্যে!… সত্যিই ভয় করছিল, কি যে হলো তোমার!" বর্দক তরুণকে বললো।

—"তোমার কথা ভাবছিলাম তো, ভাবতে ভাবতেই কখন যে বেলা বেড়ে গেছে! মাইরি বলছি!"

—"থাক, বানিয়ে বানিয়ে অত কিছু বলতে হবে না!"—বর্দক চাপা গলায় বললো।

দ্রুত এগিয়ে চললো তারা ডেরার দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। রাত কাটাতে হবে এখানেই। সিদ্ধ মাংসের গন্ধে ম-ম করছে তাঁবুগুলি। ঢোলক বাজছে কাছে, সেই সঙ্গে অন্যান্য বাজনা। দিনমানে যত চলাই হোক, জিপসি কি আর নাচ-গান শেষ না করে রাতে শুতে যেতে পারে!

প্রথম তরুণ স্নান করে উঠে এলো নদী থেকে। যে পাথরটার উপর জামা-কাপড় রেখেছিল, হাত বাড়িয়ে দেখলো সেখানে কিছু নেই। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ মৃদু হাসির শব্দে অন্ধকারেই সে ঢাকতে চাইলো নিজের পৌরুষ-কঠিন নগ্নতা। তারপর বর্দকের নরম হাতের স্পর্শ পেল তার বুকের কাছে। ভেজা শরীর হাত দিয়ে মুছে দিতে লাগলো বর্দক। অন্ধকার গভীরতর হয়ে ঘনিয়ে এলো। তাঁবুতে তখন তীব্র হাস্যরোল, বাঁশির মনমাতানো সুরের সঙ্গে ঢোলকের লয় ক্রমশ দ্রুততর হয়ে উঠছে।

তেহেরান [রাগ] নগরীর অবস্থান সমতল ভূমিতে। দূরে পর্বতশ্রেণীর নীলাভ বিস্তার দেখা যায়। আয়তনে নগরীটি রাজধানী তেসিফোনের থেকে বড়। কিন্তু লোকসংখ্যায় নয়। এখানে এত বাগিচার ছড়াছড়ি যে, গাছ বেশী না মানুষ তা বলা মুশকিল। তেহেরানের শাসক স্পন্দিয়ার বংশীয় সামন্ত প্রভু। শাহেনশাহর অধীনস্থ সামন্তদের মধ্যে স্পন্দিয়ার সর্বাপেক্ষা ধনী ও প্রভাবশালী। তেহেরান স্থলপথে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত, বিশেষ করে ভারত ও চীন থেকে রোমের পথে এটি ঠিক মাঝখানে পড়ে। তাই স্বাভাবিক কারণেই তেহেরান বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের নগরীতে পরিণত হয়েছে। স্পন্দিয়ার সামন্তরাজা বংশানুক্রমে সাসানী সাম্রাজ্যের প্রধান অরগপত্ [রাজ্যের সমস্ত দুর্গের অধিপতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপক] হয়ে আসছে। সাধারণ মানুষ শাহেনশাহ এবং স্পন্দিয়ারের মধ্যে ফারাক বোঝে না। কোয়াত্ শাহেনশাহ হবার পর স্পন্দিয়ার-মন্ত্রী শ্রেষ্ঠী-বণিক-পুরোহিত গোষ্ঠী নানা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে দীনদার [ধর্মপ্রাণ] মানুষ বুকে বল ফিরে পেয়েছে। ভূতপূর্ব শাহেনশাহ এবং তার গুরু শয়তান মজ্দক-এর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে তারা আর জীবিত নেই! মোট কথা, ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় ঘটেছে। সব কিছু চলছে আগের মতো। দাস হয়ে গেছে ক্রীতদাস, জোতদার হয়ে গেছে ছোট-খাটো সামন্ত, আর সামন্তরা রাজা-মহারাজা।

নগরীর বাইরে, মালভূমিসদৃশ উঁচু-নীচু জমিতে, যেখান দিয়ে বয়ে গেছে দূরের পাহাড় থেকে নেমে আসা হিমশীতল জলপ্রবাহ, যাকে নদী না বলে শাখানদী বলাই ঠিক হবে, তার তীরে অসংখ্য তাঁবু খাটানো হয়েছে সারিবদ্ধ-ভাবে। সবই জিপসিদের তাঁবু। একই সঙ্গে এত জিপসির সমাবেশ দেখে মনে হয় তারা চতুর্দিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে এখানে, অবশ্যই কোনো বিশেষ কারণে।

দিনের তৃতীয় প্রহর। তাঁবুতে এখন লোকজন নেই বললেই চলে। প্রায় সকলেই গেছে নগরীতে, কেউ তার বানর-বানরী সঙ্গে নিয়ে, কারো সঙ্গে আছে ভাল্লুক, আবার কেউ গেছে যাদুর খেল দেখাতে। বড় শহরে এ-সব খেলা সচরাচর দেখা যায় না। তাই আমদানীর সম্ভাবনাও থাকে অধিক। কয়েকজন গেছে ভিক্ষা করতে, আবার কয়েকজন গেছে দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত সখের জিনিসপত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।

একটি তাঁবুতে বর্দক পিতলের দর্পণের সামনে বসে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে প্রসাধনে ব্যস্ত আছে। তার সামনে বসে আছে তরুণ 'দেবর'।

—"আচ্ছা, বর্দক, সামন্ত প্রভুর প্রাসাদে যেতে ভয় করছে না তোমার?"

—"নাচ-গানের পেশাতে লজ্জা-ভয় থাকলে চলে না গো জান-এ-জানা [প্রেমিক] । পথে পথে নেচে-গেয়ে ক'টা দিনারই বা পাওয়া যায় । সামন্তের দরবারে খুশী করতে পারলে সুবর্ণ দিনারের মালা পরিয়ে দেয়, নাম ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, খাদ্যের সমস্যাটা দূর হয়ে যায় !"

—"তুমি পারবে ?"

—"দেখে নিও জান-এ-জানা, নাচবার সুযোগ যদি আমি পাই, তবে সকলকে হারিয়ে দিয়ে ইনাম নিয়ে তবে আমি ফিরব !"

—"যদি না ফিরতে দেয় । তাই বলছিলাম, আমাকেও নিয়ে চলো, আমি ঢোলক বাজাবো তোমার নাচের সঙ্গে !"

—"তা হয় না গো, সঙ্গে পুরুষদের নিয়ে যাবার নিয়ম নেই !"

এক বৃদ্ধা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো । অভ্যস্ত এবং দ্রুত হাতে বর্দকের চুল বেঁধে দিতে লাগলো । তারপর চোখে হাল্‌কা কাজলের রেখা এঁকে দিলো, অধর-রাগে রাঙিয়ে দিলো ঠোঁট । বর্দককে স্নানের পর অনেক পরিচ্ছন্ন, তাজা ও গৌরী মনে হচ্ছে । তার পরনে আজ নতুন রঙীন কঞ্চুক, তার উপর সুন্দর কাজ করা জিপসি সূচিশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন । নীচে কাচ বসানো ঘাগরা । বর্দকের উন্নত বক্ষ ও সুগঠিত শরীর যেন গ্রীক ভাস্কর্যের এক অনুপম নমুনা । সত্যি বলতে কি, অনেক উঁচু ঘরানার সুন্দরীদের মধ্যেও তনুদেহের এমন সুচারু সুষমা সচরাচর দেখা যায় না । তরুণটি সেই সুন্দরীর গভীর কালো চোখ ও অপরূপ দেহবল্লরীর লীলায়িত শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ কণ্ঠে বললো —"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ তুমি বিজয়ী হবেই !"

বর্দক খুশী হয়ে জবাব দিলো—"আর অনেক উপহারও পাবো ! তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে সামন্ত প্রভুর প্রাচীন লাল মদিরা ! তুমি আর আমি বেশ মজা করে পান করবো নহরের [ছোট নদী, নালা] ধারে বসে । আর আমাদের এই মাসী এক এক চষক পান করবে, তারপর মৃত শোহরকে [স্বামী] ইয়াদ করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে । তাই না, মাসী ?"

—"হ্যাঁ, বেটি !" বলে বুড়ি হাসে । দ্রুত হাতে প্রসাধনের শেষ কাজগুলো সেরে নেয় । সন্ধ্যা যখন প্রায় নেমে এসেছে, তখন সুসজ্জিতা বর্দক বৃদ্ধার সঙ্গে রওনা দিলো সামন্তপ্রভুর প্রাসাদের উদ্দেশে ।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে প্রতীক্ষা করছিল জিপসি মুখিয়া [দলপতি] । "সময় হয়ে গেছে"—বলে সে বর্দক ও বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলো দরজার দিকে । বর্দক বিস্ফারিত চোখে দেখছিল সিংহদরজার বিশালতা, আর মনে মনে ভেবে অবাক হচ্ছিল কেন মানুষ একই স্থানে বন্দীর মতো সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় । বেচারি জিপসি মেয়ে কি করে আর জানবে যে রাজপুরুষেরা সব সময়েই প্রাণ ও সম্পদ হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, তাই বাসস্থানকেও তারা দুর্গে পরিণত করে । স্পান্দিয়ার সামন্তকে সব সময়েই খেয়াল রাখতে

হয় হঠাৎ কেদারীর হূন কিংবা খজারদের লুটেরা বাহিনী যেন আক্রমণ না করে বসে।

সম্ভবত আদেশ দেওয়াই ছিল আগে থেকে, তাই মুখিয়ার পক্ষে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ বিনা বাধাতেই সম্ভব হলো। তবে বর্দককে দেখে প্রধান রক্ষী মহাশয় দু-একবার গোঁফে চাড়া দিয়ে নিলো। সন্ধ্যার সময়টা সামন্ত প্রভু ও তার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের আমোদ-প্রমোদের সময়। নতুবা সে এই রূপসী জিপসী বালিকাটির সঙ্গে একটু-আধটু ছেড়খানি [রঙ্গ রসিকতা] করতে পারতো। হতাশ প্রধান রক্ষী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভাবলো—সমস্ত সদ্য-ফোটা ফুলই সামন্ত-বণিক-শ্রেষ্ঠী-পুরোহিতদের দখলে, তাদের মতো মানুষের ভাগ্যে ছাই বাসি ফুলের মালাও জোটে না।

উদ্যানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মুখিয়া এবং বৃদ্ধা এক সুবেশ প্রৌঢ়ার হাতে সমর্পণ করলো বর্দককে। একটি বিশাল কক্ষে জনা-পঞ্চাশ তরুণী প্রতীক্ষা করছিল। বর্দককে সেই কক্ষে পৌঁছে দিলো প্রৌঢ়াটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হলো একজন বিপুলা রমণী। অভিজ্ঞ চোখে সে এক নজর দেখে নিলো সমবেত তরুণীদের। তারপর দ্রুত বেছে নিলো দশজনকে। মনোনীতাদের মধ্যে বর্দকও আছে। মনে মনে খুশীই হলো সে। তারপর বিপুলা রমণীটির পিছনে সারিবদ্ধভাবে চলতে শুরু করলো মনোনীতা দশজন সুন্দরী। দীর্ঘ অলিন্দের শেষে বাঁক ঘুরেই আবার একটি অনুরূপ অলিন্দ। এ-রকম কটি অলিন্দ যে পার করে এলো তারা, শেষ পর্যন্ত কারোরই তা আর স্মরণ থাকে না। দু-দিকে সারি সারি কামরা, সুসজ্জিত ও আলোকময়। মাঝে মাঝে সে-দিকে নজর চলে যায় বর্দকের। কখনো সে দেখতে থাকে দেওয়ালের উপর অঙ্কিত চিত্র-গুলিকে। সহসা এক মধুর সৌরভ ভেসে আসে অলিন্দের শেষ প্রান্ত থেকে। বিপুলা রমণীটিকে অনুসরণ করে তরুণীরা এসে পৌঁছায় এক বিশাল কক্ষে। কক্ষটি ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল কস্তুরী নির্যাস ও নানা ফুলের সুগন্ধে আমোদিত। এই সুগন্ধই খানিকটা আগে পেয়েছিল তারা। কামরাটির এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত একটি সুবিশাল, সুন্দর ও মহার্ঘ কালীনে ঢাকা। দেওয়ালে অনেক ছবি, অধিকাংশই শিকারের দৃশ্য। কোনোটিতে অশ্বারোহী রাজপুরুষ কান পর্যন্ত জ্যা টেনে তীরবিদ্ধ করছে এক মুখ ব্যাদান করে থাকা ভয়াল দর্শন সিংহকে, আবার কোথাও দলবল নিয়ে জঙ্গলের পথে মৃগয়ায় চলেছে কোনো সামন্তপ্রভু, দাঁতাল বরাহ ও হরিণের দল পালিয়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ক্রমে কামরাটির চতুর্দিক দেখে বর্দকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো একটি জীবন্ত চিত্রের উপর। এক স্থানে, অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি বেদীর উপর, হাতীর দাঁতের তৈরী রত্নখচিত সিংহাসন পাতা আছে। তাতে যে ব্যক্তিটি আসীন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথায় একটি ছোট আকারের মুকুট, কাঁধ পর্যন্ত এলিয়ে রয়েছে বাদামী চুলের ঢাল। লাল মূল্যবান পশমের তৈরী কঞ্চুক তার বলিষ্ঠ মেদহীন

শরীরের সঙ্গে যেন এঁটে বসেছে। কঞ্চুকের বক্ষস্থলে সোনালি সুতোর কাজ করা একটি বৃত্ত, চারিপাশে রঙীন সুতো দিয়ে তৈরী ফুল লতা-পাতা, মাঝখানে একটি কুকুরের মুখ। এটি ইরানের মজ্‌দয়াস্নী ধর্মের মঙ্গল প্রতীক। বসে থাকা অবস্থাতেও বোঝা যায় যে পুরুষটি প্রায় পাঁচ হাত লম্বা, কোমরের আয়তন বিশাল বক্ষপটের প্রায় অর্ধেক। কোমরবন্ধটি সোনার। নিম্নাঙ্গে সাদা রেশমের পাজামা। পায়ের নীচে বিছানো আছে মখমলের গদি। পুরুষটির গলায় একটি পাতলা সোনার হার, নীচে ঝুলে আছে একটি ইন্দ্রনীল-খচিত লকেট।

কক্ষটিতে এই ব্যক্তিই একমাত্র পুরুষ। বাদবাকী প্রায় পঁচিশজন তরুণী। কেউ মদিরাপাত্র হাতে নিয়ে, কারো হাতে জলের ঝারি। যারা খাদ্য ও পানীয় পরিবেষণ করছে তাদের মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। পুরুষটির পার্শ্ববর্তী সিংহাসনে বসে আছে ষোলো-সতেরো বছর বয়স্কা এক সুন্দরী। পরিচারিকারা তাকেও পুরুষটির সমান সম্মান প্রদর্শন করছে। সিংহাসনের দু-দিকে চামর ও ময়ূর-পালকের পাখা দোলাচ্ছে দু-জন পরিচারিকা।

বর্দক যখন অনান্য তরুণীদের সঙ্গে কামরায় দাখিল হয়েছিল, তখন একটি তরুণী সিংহাসন থেকে সামান্য দূরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল। আরেকটি সুন্দরী ত্রিকোণাকৃতি বাদ্যযন্ত্রের [যবন দেশীয় হার্প] তারগুলির উপর আঙুল চালাচ্ছিল ধীরে ধীরে। অপূর্ব সুরের মায়াজাল যেন বিস্তৃত হচ্ছিল ক্রমশ। যদিও সিংহাসনাসীন পুরুষটি এবং তার কিশোরী সঙ্গিনী খুবই ধীরে চুমুক দিচ্ছিল পানপাত্রে, অন্য কারোর চষক পরিচারিকাদের তৎপরতার ফলে খালি হতে পারছিল না।

পুরুষটি তার সামনের পরিচারিকাকে কিছু নির্দেশ দিলো। সিংহাসনের সম্মুখে এবার এসে দাঁড়ালো বর্দক এবং আরো তিনজন সুন্দরী। একজনের হাতে যবন দেশীয় হার্প, দু-জনের হাতে ডফ। তারযন্ত্রে সুমধুর তান বেজে উঠলো। তানটি ভারতীয়, ইরানের রাজপুরুষরা ভারতীয় সঙ্গীত খুব পছন্দ করতো—এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। তানের লয় বাড়তে থাকলো, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজতে লাগলো ডফ। তারপর যখন গত্‌টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন বর্দক ইরানী ভাষায় গাইতে শুরু করলো ভারতীয় রাগাশ্রিত এক প্রেমগীত। যেন শ্রাবণের বিষাদময় দুপুরে সহসা শোনা গেল কোকিলের কুহুতান, যা সচরাচর ঘটে না। পুরুষটির চষক থেকে ছলকে পড়ে গেল খানিকটা মদিরা, পরিচারিকার দল পরিবেষণ করতে করতে থমকে দাঁড়ালো, যারা ফিসফিস করে কথা বলছিল তারা হলো নির্বাক। কয়েক লহমার মধ্যে বদলে গেল সারা বাতাবরণ। এ-সব কিছুই দেখলো না, বুঝলো না বর্দক। দু-চোখ বুজে সে যেন কোনো প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ্য করে অর্পণ করলো তার গানের ডালি, যেন প্রাসাদের অসংখ্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছাড়িয়ে তার গানের

নিবেদন স্পর্শ করলো সেই একাকী তরুণীটির হৃদয়, যে এখন বসে আছে নহরের কিনারায়, বর্দকের প্রতীক্ষায়।

পুরুষটি সম্বিত পেয়ে একের পর এক দু-চষক মদিরা পান করলো দ্রুত। পাশের সুন্দরী কিশোরীটি তার ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে পড়লো। শেষ হলো গান। পুরুষটির চোখ দুটি ক্রমশ জবাবর্ণ ধারণ করছে। সে বর্দকের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চুপিচুপি কিছু বললো পরিচারিকাকে। সে বর্দক ও যন্ত্রী সঙ্গিনীদের কাছে গিয়ে বললো কি যেন।

ডফ বেজে উঠলো দ্রিম দ্রিম শব্দে দ্রুত লয়ে। স্পান্দিয়ারের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তার আদেশ শিরোধার্য করে নিলো বর্দক, তারপর পোশাকের কোনো অংশকে ঢিলে আবার কোনো অংশকে সটান করে নিলো। যন্ত্রী সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, দর্শকরা উদ্বেল হলো চাপা উত্তেজনায়। সমবেত তরুণীদের মধ্যে বর্দক অবশ্যই রূপে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়, কিন্তু শারীরিক গঠনে তার কাছাকাছিও যেতে পারবে না কেউ। তারযন্ত্র বাজছে, বাজছে ডফ, আর বর্দকের সুডৌল বাহু ধীরে ধীরে যেন পাখির ডানা হয়ে উড়ান দিতে চাইছে। এক ঝাঁক বালিহাঁস উড়ছে আকাশে, কখনো উপরে কখনো নীচে। তার পদযুগলের গতি, কোনো সাঁতারু যেন বন্যাস্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসভাবে ভাসমান, যেন এক ঝাঁক পায়রা খেলাচ্ছলে শূন্যে ভাসছে-নামছে-ভাসছে। নৃত্যের গতি বেড়ে চলে। স্পান্দিয়ার-এর দৃষ্টি সরছে না বর্দকের চেহারা থেকে। জিপসি মেয়ে বর্দক, অল্প বয়স থেকেই নানা কসরতের খেলা দেখাতে অভ্যস্ত। তাই শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তার। কখনো বৃত্তাকারে, কখনো অর্ধবৃত্তাকারে, কখনো হাঁটুতে কখনো কনুই-এ ভর দিয়ে, কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে—যুগ যুগান্তর ধরে যেন নেচে চলেছে সে, যেন সময়কালজ্ঞানরহিত হয়ে গেছে।

নাচ শেষ হলে স্পান্দিয়ারের নির্দেশে পরিচারিকা সামন্ত প্রভুর নিজস্ব পানপাত্র থেকে লাল মদিরায় চষক ভরে বর্দকের হাতে দিলো। বর্দক মাথা ঝুঁকিয়ে স্বীকার করলো সেই অনুগ্রহ, এক শ্বাসে পান করলো মদিরা-ভরা চষক। বর্দকের নৃত্য-গীত সরকার পছন্দ করেছেন। এবার তার ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলে যাবে।

ভাগ্য যতই প্রসন্ন হোক, সবকিছুরই সীমা আছে। এই দুনিয়ার সকলেই কোনো না কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ। বর্দক তো জিপসি কন্যা। ইরানী হলেও ফায়দা হতো না কোনো। সামন্তের কন্যা ছাড়া সামন্তের হারেমে অন্য কেউ পত্নীর মর্যাদা পেতে পারে না। অনেক শ্রেণী আছে সামন্ত প্রভুর হারেমে, অনেক শ্রেণী বিভাগও আছে। স্পান্দিয়ারের হারেমে দেশ-বিদেশের এক হাজারের উপর সুন্দরী তরুণী আছে। বর্দককে যদি সে স্বীকৃতিও দেয়, বড় জোর মাঝে মধ্যে

সে সামন্তের অংকশায়িনী হতে পারবে, আর পেঁছাতে পারবে দাসী বা পরিচারিকার স্তর পর্যন্ত। জিপসি জন্মসূত্রের দরুন সে অন্যের খাদ্য বা পানীয় ছুঁতে পারবে না। [এখানে আমি কিছুক্ষণের জন্য অবান্তর প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। স্পান্দিয়ার সে-ধরনের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, মনে মনে ভেবে থাকলেও সরাসরি সে কিছু বলেনি। তাই অপ্রাসঙ্গিক কথা থাক, আসুন আমরা ফিরে যাই জলসাঘরে।]

বর্দকের পরে আরো অনেকে গান গাইলো, প্রশংসাবাক্যও শুনলো অনেক, কিন্তু নৃত্যে সে রয়ে গেল অদ্বিতীয়া। গানের অবসরে প্রত্যেকবার নাচতে হলো তাকে, ক্লান্তিতে শরীর যেন তার ভেঙে পড়ছে, তবু হুজুরের আদেশ অগ্রাহ্য করা যায় না, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত কক্ষের সকলেই নেশায় ডুবে গেল। স্পান্দিয়ারের চোখ ঢুলু ঢুলু। গানের মধ্যবর্তী বিরতির সময়ে চতুর্থবার সে আদেশ করলো বর্দককে নাচতে। বর্দক ক্লান্ত হয়ে পড়লেও প্রতিবার স্পান্দিয়ারের অনুগ্রহ-স্বরূপ মদিরার চষক তাকে সাময়িক কালের জন্য শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চতুর্থ বার তার মনে হলো যে শক্তি জবাব দিচ্ছে। পা কাঁপছে, চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। তবু শারীরিক শক্তির অভাবকে মনোবলের সহায়তায় পূর্ণ করবার প্রয়াসে বর্দক আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার শুরু করে নাচ। আগের মতোই যত্নশীল, কোনো পদক্ষেপে বা অঙ্গচালনায় শিথিলতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু নাচের শেষে যন্ত্রী ও বাদ্যকাররা নীরব হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্দক তার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেললো, এবং অচেতন অবস্থায় পড়ে গেল কালীনের শয্যায়। স্পান্দিয়ার সজাগ হয়ে উঠলো, সিংহাসন থেকে নেমে এসে পরিচারিকাদের সাহায্যে বর্দককে তুলে ধরে বসাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার নিজের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে তখন। বর্দকের মুখে কপালে স্বেদবিন্দু আলোর প্রতিফলনে মুক্তাবিন্দুর ভ্রম উৎপাদন করতে লাগলো। কঞ্চুক ঘামে ভিজে গেছে। পরিচারিকারা প্রভুর সংকেত পেয়ে জোরে বাতাস করতে লাগলো। স্পান্দিয়ার দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, অখ্যাত নর্তকীর প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র। কিন্তু বর্দকের জ্ঞান ফিরলো না। জ্ঞান ফিরে আসবার পর সামনে উদ্বিগ্ন স্পান্দিয়ারকে দেখতে পেলে কত খুশীই না সে হতো!

কাল, হ্যাঁ, তাঁবুর এই বসতি গতকালই তো শিশুদের উল্লসিত কলরবে, মা-মাসীদের বকাবকিতে ছিল মুখর। কাল অধিকাংশ যুবা-প্রৌঢ় পুরুষই গিয়েছিল নগরীতে নানা কাজে। কিন্তু আজ বসতির কেউ কোথাও যায়নি, সবাই আছে অথচ চারিদিকে ছেয়ে আছে এক উদাস মৌনতা। কাল, হ্যাঁ, সামনের এই জলপ্রবাহে অবগাহন স্নান সেরে এসে গতকালই তো বর্দক চুল ঝাড়তে ঝাড়তে সঙ্গিনী তরুণীদের বলেছিল—"দেখে নিস তোরা, আজ আমি জিতে ফিরব!" সত্যিই সে জিতে ফিরে এসেছে। এখন সে শুয়ে আছে জলপ্রবাহের দিকে মাথা করে। তার সমস্ত শরীর নতুন লাল রেশমী কাপড়ে ঢাকা। খোলা রয়েছে কেবল মুখ। তোমরা কেউ জোরে কথা বলো না! বাচ্ছারা, খিলখিল করে হেসে উঠো না যেন! গোলাপের নামে যার নাম, সেই বর্দক ঘুমিয়ে আছে। স্পান্দিয়ারের দরবারে নৃত্যকলা প্রদর্শনে জিতে এসেছে সে। সে বড় ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছে তাই। জাগিও না তাকে। তার চোখ দুটি বোজা, কিন্তু দ্যাখো, ঠোঁটে কেমন হালকা হাসির ছোঁয়া! অধর-রাগ, কাজল রেখা, সমস্ত রূপটান মুছে গেছে অনেকক্ষণ। তবু, বিজয়গৌরবের প্রসন্নতায় মুখ তার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

বসতির মেয়েমহল কাঁদছে চিৎকার করে। তাতেও জাগছে না বর্দক, কোনোদিন জাগবে না আর। কাঁদছে সকলেই, তবে অনেকেই মনে মনে। কাঁদছে, কারণ বর্দক প্রাণ খুলে হাসতে জানতো। তার উনিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে সে যেন বহু বছরের আনন্দ সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাই চিন্তা-বিষাদ-শোক কোনোকিছুই কাতর করতে পারতো না তাকে। সেই সদাহাস্যময়ী নৃত্যগীতপটিয়সী রূপসীটি, যে গান গেয়ে উঠতো কথায় কথায়, বুড়ো-বুড়িদের প্রিয় পোতী [পৌত্রী], শিশুদের খেলার সাথী বর্দক আপাজান [দিদি], চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে। তাই কাঁদছে সকলেই। আজ জিপসি বসতিতে বড় শোকের দিন।

জিপসি সম্প্রদায়ের মুখিয়া ও মাতব্বর ব্যক্তিরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছে। ইরানে প্রচালিত মজ্‌দয়াস্নী প্রথা অনুযায়ী মৃতদেহকে চিল-শকুনের খাদ্য হিসাবে খোলা জায়গায় টাঙিয়ে রাখা হয়, কিন্তু খোলা জায়গায় আসবার আগে মৃতদেহকে প্রতীক্ষা করতে হয় একটি কূপের মধ্যে। এক-একটি দেহ শেষ হয়, আর একটি-দুটি করে দেহ কূপ থেকে বাইরে আনা হয়। [বর্তমান কালেও বম্বে, গুজরাটের ভালসাড্‌-বিল্লিমোরা-ভরুচ্‌-বরোদা-কায়রা ইত্যাদি অঞ্চলে পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সৎকার প্রথাই বলবৎ আছে। পার্সি সম্প্রদায়ের আদি পুরুষরা ইরান থেকে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে নবম শতাব্দীতে। পার্সিরা মূলত সূর্য-উপাসক। এদের একটা বড় অংশ

ইরানে ইসলাম রাজত্ব স্থাপিত হবার পর আরব সাগর পার হয়ে পশ্চিম ভারতে আশ্রয় নেয়। এই প্রথাটি সম্পর্কে ১৯৫৬ সালে, বম্বেতে, সহপাঠী পার্সি বন্ধুদের কাছ থেকে আমি জানতে পারি। ১৯৫৮ সালে এ-ব্যাপারে আমি ভারতের বিখ্যাত মাখন ব্যবসায়ী পেস্টনজী. ই. পোলসন-কে প্রশ্ন করি। তিনি যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং ১৯৬৮ সালে বন্ধু অধ্যাপক দিনশা বিলিমোরিয়া আমাকে যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম একই। মানুষের এই পৃথিবীতে দেহ-ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য অপরের সেবা করা। মৃত্যুর পরেও যেন তার দেহ মানুষের না হলেও অন্তত‍পক্ষে কাক-চিল-শকুনের সেবায় লাগে—এই প্রথার মাধ্যমে সেটাই বোঝানো হয়েছে। —অনুবাদক]

কিন্তু জিপসি দলের যুবক-যুবতীরা কেউই চাইছে না যে তাদের প্রিয় বন্ধু বর্দকের শরীর চিল-শকুনের খাদ্য হোক। এমন কি ঈসাই পদ্ধতিতে কবর দেওয়াকেও তারা মেনে নিতে পারছে না, কারণ সেক্ষেত্রেও তার শরীর ভোজ্য হবে কীটের। অথচ এই দুটি সৎকার প্রথাই ইরানে প্রচলিত আছে। যে সৌন্দর্য মাটির পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে চিরতরে, সে বরং বিলীন হয়ে যাক, ধোঁয়া হয়ে ভেসে যাক মহাশূন্যে, ছাই হয়ে উর্বরা করুক শস্যক্ষেত্রকে। তাই সাব্যস্ত হলো চিতার আগুনে বর্দকের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। যে দেশেই বাস করুক তারা, বস্তুত সেখানে দু-দিনের অতিথি ছাড়া অন্য কিছু তো নয়, তাই সে-দেশের সৎকার-প্রথা মানতে তারা বাধ্য নয়। জিপসি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি যেহেতু ভারতে, তারা ভারতীয় প্রথাকেই মেনে চলবে। বর্দককে সমর্পণ করা হবে অগ্নিদেবতার সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনে।

তেহরান নগরীতে সর্বপ্রথম চিতা সম্ভবত বর্দকেরই জ্বলবে। কিন্তু অনুমতি? হ্যাঁ, তাও পাওয়া গেল, যদিও মূক। নেশা ছুটে গেলে স্পান্দিয়ারের পক্ষে বুঝতে দেরি হয়নি যে বর্দকের মৃত্যুর জন্য অন্য কেউ নয়, দায়ী সে নিজে। তাই মৃতের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সে দাহসংস্কারের কাজে ভারতীয় প্রথার প্রয়োগকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। রাত্রে জলসাঘরে যখন ক্লান্তি ও অতিরিক্ত সুরার প্রভাবে বর্দক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল, তখন হাকিম-বৈদ্য সকলেই হাজির হয়েছিল স্পান্দিয়ারের আহ্বানে। তারা যখন পৌঁছেছিল, বর্দকের হৃৎস্পন্দন তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। দাহসংস্কারের খরচ ছাড়া বর্দকের পরিবারকে স্পান্দিয়ার এক হাজার সুবর্ণ দিনার দিয়েছিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে। এক হাজার সুবর্ণ দিনারের বিনিময়ে চার হাজার দুগ্ধবতী গাভী কেনা যায়, কাজেই স্পান্দিয়ার নিশ্চিন্ত ছিল যে, সে কোনো অবিচার করেনি। আরো অনেক বেশী দিতে পারতো সে, ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু সর্বোচ্চ পুরোহিত বংশীয় সামন্ত প্রভুর পক্ষে এক সামান্য জিপসি মেয়ের মৃত্যুতে অধিক অনুতাপ বোধ করা কুলধর্ম ও দেশধর্মের বিরোধিতার সামিল হতো।

তেহেরান নগরীর এক প্রত্যন্ত প্রান্তে চিতা সাজানো হলো। বর্দক তার অন্তিম যাত্রায় রওনা হলো চারজনের কাঁধে চড়ে, খাটের উপর দুলতে দুলতে, যেন সে চলে যেতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করছে। চারজন বাহকের মধ্যে সম্মুখের দু-জন ছিল বর্দকের প্রেমিক 'দেবর' ও তার সাথী। 'দেবর' মনে মনে ভাবছিল—অন্য সবাই তার তুলনায় ভাগ্যবান, তারা অন্তত কাঁদতে পারে। কাঁদতে না পারলে হৃদয়ের ভার লাঘব হয় না।

নতুন শ্মশানভূমির প্রথম চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলো। শুকনো কাঠ জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। স্পান্দিয়ার যে মহার্ঘ-আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছিল বর্দকের মৃতদেহ, সেই লাল বস্ত্র অধিকতর লাল হয়ে উঠলো। সকলে নির্বাক। এক সময় জ্বলতে জ্বলতে সমস্ত কাঠ পরিণত হলো কয়লায়।

ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল সেই প্রেমিক তরুণটির হৃদয়। যে সন্ধ্যায় বর্দক চলে গেল স্পান্দিয়ারের প্রাসাদের উদ্দেশে, তরুণটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সেই পথের পাশে। প্রকৃতপক্ষে, পথ ছিল না কোনো, পথের পাশে সে দাঁড়িয়েছিল শুধু পথের মায়ায়। তারপর, রাত যখন গভীর হলো, তবু ফিরলো না বর্দক, সে তখন সারা রাত প্রতীক্ষা করেছিল নহরের কিনারায়। ভোরে যখন বর্দকের শবদেহ নিয়ে সামন্ত প্রভুর রক্ষীদল এসেছিল, তখন সে নহরের কিনারায় ঘাসের কোলে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জিপসি দলের সকলেই বুঝতে পারছিল তরুণটির মানসিক অবস্থা। তার সঙ্গে বর্দকের সম্পর্ক এক ঘনিষ্ঠতম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এ-কথা জানে তারা। মনে মনে তারা এই সুদর্শন ও বিদ্বান তরুণটিকে মেনে নিয়েছিল। সে তাদের দলের একজন হতে চলেছে জেনে খুশীও হয়েছিল। আজ খুশীর হাট ভেঙে গেছে। তারা আর থাকবে না এখানে।

সব শেষ হয়ে গেলে, সন্ধ্যাবেলা তরুণ তার সাথীর সঙ্গে নহরের তীরে পাশাপাশি চলতে থাকলো অনেক দূর পর্যন্ত। চাঁদ অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকবে আকাশে, তাই তাড়া ছিল না কোনো। দ্বিতীয় তরুণটি আস্তে আস্তে বলতে লাগল—"এ-সময় তোমাকে কোনো উপদেশ বাণী শোনাব না, মিত্রবর্মা। ভালো লাগবে না তোমার। এ-কথা ভেবো না যে বর্দকের এই অকালমৃত্যুতে দুঃখ পাইনি আমি। অবশ্যই পেয়েছি, যদিও তা তোমার মতো গভীর নয়। কিন্তু ভেবে দেখো, মিত্র, তোমার-বর্দকের প্রেম সম্পর্ক কোনো এক সময়ে হয়ত তোমারই পথের কাঁটা হয়ে বিঁধতো, হয়ত বিপথগামী করতো তোমাকে!"

—"বর্দক আমার বাকী জীবনে এক মধুর স্মৃতি হয়ে সঙ্গী থাকবে, বন্ধু! সম্ভবত, এই প্রেম-সম্পর্কটির প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে।

—"নিশ্চয় ছিল, মিত্র! প্রেমই জীবনের মধুরতম রস, মধুরতম অনুভূতি। সেই অনুভূতির স্পর্শ না পেলে মানুষ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। শুধুমাত্র

তার স্পর্শই যথেষ্ট, সময়-কালের প্রশ্ন অবান্তর। দুটি মানুষের মধ্যে যে প্রেম-সম্পর্ক, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তা বিস্তার পায় সমস্ত মানুষের মধ্যে, সঞ্চারিত হয় সমস্ত বাতাবরণে। তখন আর কয়েকটি ক্ষণের মধ্যে বা নিছক দুটি মানুষের মধ্যেই সীমিত থাকে না সেই সম্পর্ক।"

—"অথচ আমাদের দেশে অনেক বিবাগী ও দার্শনিক প্রেমকে বর্জন করবার উপদেশ দিয়েছেন।"

—"জানি, মিত্র, ভারতীয় দার্শনিকরা আসলে প্রেমকে বর্জন করতে বলেননি, তাঁরা বন্ধনকে বর্জন করতে বলেছেন। যদি কোনো বস্তু স্থায়ীরূপে আমাদের কাছে থেকে যায়, সে যতই আনন্দআকর স্বরূপ হোক, শেষ পর্যন্ত সে আনন্দও একদিন ভার মনে হতে থাকে। চেতনাকে জাগরূক করবার জন্য সবসময়েই তাই প্রয়োজন হয় নবীনতার। কোনো রমনীয় উদ্যানে প্রথমবার গিয়ে আমরা মুগ্ধ হই, পাখির মধুর স্বরে তো বটেই, এমন কি ঝিঁঝিঁপোকার কলরবকেও মনে হয় কত সুন্দর। একদিন, দু-দিন, কিন্তু তিনদিনের পর যখন সবকিছু চেনা জানা হয়ে যায়, তখন চতুর্থ দিনের জন্য আর কোনো কৌতূহল অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, তাই নতুনের পথ সর্বদাই খোলা থেকে যায়।"

—"তাহলে মানুষের জীবনে স্মৃতি এবং নবীনতার দ্বন্দ্ব থাকবে চিরকাল?"

—"হ্যাঁ, থাকবে! ভোগের সঙ্গে দুঃখ সংপৃক্ত থাকে সর্বদাই। এমন কোনো ভোগ নেই, যাতে অবশেষে দুঃখের মাত্রা কম থাকে। বিষমিশ্রিত রাজভোগ যেমন ত্যাগ করা উচিত, ভোগবাসনা থেকেও তেমনই আমাদের নিবৃত্ত থাকা উচিত।"

—"এটা তো একপেশে চিন্তাধারা!"

—"হতে পারে। আমি চির-নবীনতার পক্ষপাতী। এক জায়গায় স্থিতাবস্থায় থেকে নবীনতাকে আয়ত্ত করা যায় না। জীবনের পথে চলতে চলতেই তাকে যাত্রাপথের শরিক করে নিতে হয়। পৃথিবী অনবরত চলছে। দৌড়োচ্ছে বলাই ঠিক হবে। গতির সঙ্গে গতি মিলিয়ে চলতে হবে আমাদের। কে জানে, কতখানি গতিবেগ সে বাড়াবে কাল।"

—"উফ্, আমার চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে বর্দকের সঙ্গে সঙ্গে! কি যে করি, বন্ধু!"

—"মনে রাখো বর্দককে! মনে রাখো যে, তার মৃত্যুর কারণ এক মদ্যপ প্রৌঢ় সামন্তের খামখেয়ালিপনা, নারীদেহলিপ্সার নীরব বহিঃপ্রকাশ! সেই লিপ্সা কিন্তু সরব হতে পারতো অনায়াসে! কাজেই আমাদের এই দুর্গম পথ অতিক্রম করবার পিছনে যে আদর্শ, তাকে মনে রাখো! বর্দকের সমস্যা তো পৃথিবীর সমস্ত গরীব তরুণীর সমস্যা, যার জন্য রাজতন্ত্র পরোক্ষভাবে দায়ী। তাই আমাদের অগ্রসর হতে হবে বাস্তব পরিস্থিতিকে মনে রেখে। কারো

ভালোবাসা যেন দুঃসহ স্মৃতিতে পরিণত না হতে পারে, সে-কথা মনে রাখতে হবে আমাদের। মনে রাখতে হবে, কী দুঃসাধ্য গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করেছি আমরা। সে দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য আমাদের, তা ভুলে গেলে চলবে না?"

জিপসিদের কারবাঁ এখন চলেছে পূর্বদিকে। তেহেরান নগরীতে তারা হারিয়েছিল সকলের নয়নের মণি বর্বককে। গোলাপ, কালের নিয়মে ফোটে আবার ঝরে যায়। সময় সব শোকই ভুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে।

আজ জিপসি দল পাহাড়ের পাকদণ্ডী পার হলেই নেমে যেতে পারবে পূর্বদিকের উপত্যকার দিকে। দ্বিপ্রহরের ভোজন ও বিশ্রামের জন্য তারা বেছে নিয়েছে দেবদারুর এক ছায়াঘেরা বীথিকে। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ছোট্ট একটি ঝর্ণা, স্ফটিকস্বচ্ছ তার জল। আমাদের পরিচিত দুটি তরুণ কয়েকটি রুটি, শুকনো গোস্ত ও ঠাণ্ডা জলের পাত্র নিয়ে অন্যদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে বসলো।

প্রথম তরুণটি প্রশ্ন করলো—"এ-দেশের পাহাড়গুলি এ-রকম বৃক্ষহীন হয় কেন? এই প্রথম দেখলাম যে অরণ্যও আছে এ-দেশের পাহাড়ে।"

দ্বিতীয় তরুণ উত্তর দিলো—"অরণ্যের আর কি দোষ, মিত্র! বৃক্ষও তো মানুষের মতোই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, জোট বাঁধতে চায়। কিন্তু মানুষই তো বাড়তে দেয় না তাদের।"

—"মানুষ?"

—"হ্যাঁ, মিত্র, মানুষ। মানুষের জ্বালানির প্রয়োজন, ঘর বানানোর প্রয়োজন, অস্ত্রের প্রয়োজন, পথ চলার অবলম্বনের প্রয়োজন—সব প্রয়োজনেই আঘাত এসে পড়ে গাছপালার শরীরে। আবার বৃক্ষই গৃহপালিত পশুদের খাদ্য। পাহাড়ের পথে চলতে চলতে তাঁবু খাটানোর প্রয়োজন, ব্যস, কয়েকটি বৃক্ষ নির্মূল হয়ে গেল। কিছু বৃক্ষ বাড়বার সুযোগই পেল না ঘোড়া-গাধা-ষাঁড়-মহিষ ইত্যাদির পায়ের চাপে।"

—"বৃক্ষের উপকারিতা জানে না মানুষ, এমনও তো নয়।"

—"অবশ্যই জানে, কিন্তু জ্ঞান থাকলেও পরিবেশ সচেতন মানুষের সংখ্যা যে খুবই কম এই পৃথিবীতে। শুনেছি তোমাদের ভারতে না-কি বেদ গ্রন্থের প্রথম পর্বে অরণ্য-স্তুতি লেখা আছে, যে-সবের রচয়িতা প্রাচীন কালের জ্ঞানী ঋষিরা। বেদের 'ব্রাহ্মণ পর্যায়ের 'আরণ্যক' অংশে অরণ্য-জীবনযাপনের নিয়ম-কানুনও বলে দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ভারতের বর্তমান কালের জ্ঞানীদের বিষয়ে আমার থেকে তুমি অনেক ভালো জানো। রাজন্যবর্গ কোনো বিপদে পড়লেই তারা যজ্ঞের ব্যবস্থা দেয়, যার পরিণাম অরণ্যনিধন। শোনা যায়, অগ্নিদেবতা না কি পেটের অসুখে ভুগছিলেন একবার, প্রজাপতি ব্রহ্মা নিদান দিলেন—খাণ্ডব-অরণ্য গ্রাস করো, তাহলেই সেরে যাবে অসুখ!' এ-ধরনের গাঁজাখোর চিকিৎসক ও গাঁজাখুরি চিকিৎসার কথা শুনেছ কখনো! শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিন্তু বৃক্ষ-নিধন যজ্ঞেই পরিণত হচ্ছে।"

—"হ্যাঁ, বন্ধু, আমি জানি এ-সব। কিন্তু মানুষেরও তো কর্তব্য আছে নিজের। তারা নিধনের নিদান ভুলে গিয়ে রোপণ-পালন করে না কেন?"

—"রাজতন্ত্রের পোঁ-ধরা পুরোহিতগোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে যেমনটি বোঝায়, তারাও তেমনই বোঝে। আর তারা নিজেরা যাতে লাভবান হবে না, সাধারণ মানুষকে তা বোঝাতে তাদের বয়ে গেছে। জেনে শুনে নিজের ধান্দা কে বন্ধ করবে?"

—"কিন্তু অরণ্য না থাকলে পর্বতেও ভূমিস্খলন হবে একদিন। মাটির অন্তররস শুকিয়ে গেলে সে দূর কোনো ভবিষ্যতে ফসলও দেবে না, নদী-ঝর্ণা প্রবাহিত হবে না, বন্যায় ভেসে যাবে দুনিয়া। মানুষ কি ভাবে না ভবিষ্যতের বিপদের কথা, আগামী প্রজন্মের কথা?"

—"অধিকাংশ মানুষই শুধু নিজের কথা ভাবে। মানব-ইতিহাসের আগাগোড়া শুধুই অদূরদর্শিতার ইতিহাস। দু-একজন লাওৎ-সে বা গৌতম বুদ্ধকে দিয়ে বিচার করলে চলবে না—যাঁরা সকলের কথা ভেবেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব, কিন্তু জন্মেছিলেন উপযোগী সময়ের অনেক আগে।"

—"বুদ্ধ তাঁর অনুগামীদের প্রায়ই একটি ঘটনা-পরম্পরা শোনাতেন, সৃষ্টির আদিম যুগের মানুষের কাহিনী।"

—"সে-কথা বলো তো আমাকে। বুদ্ধের কিছু কিছু কাহিনী অন্তরজাগর শুনিয়েছিলেন আমাদের। তুমিও শোনাও।"

—"এটা ঠিক কাহিনী নয়, তবে বলা যেতে পারে ইতিহাসের কয়েকটি বিস্মৃত পাতার বিবরণ। বুদ্ধ বলতেন—সৃষ্টির গোড়াপত্তন হবার সময় মানুষের আলাদা আলাদা সম্পত্তি ছিল না। বনে-জঙ্গলে অনেক পশু তো ছিলই, উপরন্তু ছিল ফল, আর কিছু কিছু ফসল! সবাই মিলে সে-সব সংগ্রহ করা হতো, সবাই মিলে তা ভোগ করতো। তারপর একদিন মানুষের মনে এসে বাসা বাঁধলো স্বার্থবোধ, তাই তারা ফল-অন্ন মজুত করতে লাগলো। একদল লোক ভাবলো—জঙ্গলে যাবার পরিশ্রম করে কি হবে! তার থেকে মজুত অন্ন চুরি করলেই তো পেট ভরে যায়! এইভাবে সৃষ্টি হলো চোরের। ক্রমশ তারা বেড়ে গেল সংখ্যায়। চুরি থেকে শুরু হলো মারামারি, দাঙ্গা। সুতরাং প্রয়োজন হলো পঞ্চায়েতের। ঝগড়া অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় পঞ্চায়েতের পক্ষে আর সামাল দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই সকলে মিলে বুদ্ধিমান, সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ কোনো ব্যক্তিকে স্থায়ী বিচারক হিসাবে বসিয়ে দিলো গদিতে। সর্বক্ষণের বিচারক বলে তাকে রেহাই দিলো কায়িক শ্রম থেকে এবং নিজেদের অর্জিত ধন থেকে তাকে অংশবিশেষ দিতে লাগলো। এই লোকটিই হলো পৃথিবীর প্রথম রাজা, যদিও অঘোষিত, এবং তার জন্ম হলো ব্যক্তি-স্বার্থের ভূমিতে!"

—"সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, মিত্রবর্মা! ইরানেও আর্যদের মধ্যে রাজা ছিল না

কোনো। মদ্ররা প্রথম রাজা মনোনীত করেছিল দেবককে। তার রাজধানী হমদান নগর আমরা দেখে এসেছি। দেবকের উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল পারসিকরা। দেবক রাজা ছিল না, সম্ভবত সে খুবই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিল, তাই সে মনোনীত হয়েছিল রাজা হিসাবে। কিন্তু সেই যে রাজবংশের শাসন শুরু হলো, তার কবল থেকে মানুষ আর মুক্তি পেলো না। পতন একবার শুরু হলে সে কি আর থামে কখনও ?"

—"থামতে পারে, যদি বলপ্রয়োগ করে থামিয়ে দেওয়া যায়।"

—"রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্র পুরোহিততন্ত্রের সহায়তায় সাধারণ মানুষের বাহুবল ও আত্মবল দুই-ই কেড়ে নেয়। সাধারণ মানুষ উপকারী ও অপকারীর মধ্যে প্রভেদ ভুলে যায়। উপকার সম্বন্ধে অসচেতন না হলে কেউ কি আর সাধ করে বৃক্ষের শরীরে কুঠারাঘাত করে, অরণ্য ধ্বংস করে ?"

—"অধিকাংশ মানুষ হয়ত জানে না যে আজ তারা যা করছে, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবে তাদেরই সন্তান-সন্ততির উপর।"

—"সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্যে মানুষ যদি সত্যিই চিন্তা করতো, তাহলে কি এক-একজনের শুয়োরের পালের মতো ছেলে-মেয়ে হতো ? একদিন দুনিয়ায় এ-রকম অবস্থা আসতে বাধ্য যখন অন্ন উৎপাদন হবে কম, আর খাবার মুখ বেড়ে অনেক বেশী হয়ে পড়বে।"

তরুণ দুটির আলোচনা বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাবার আগেই যাত্রা শুরুর ডাক এসে গেল। কারবাঁ রওনা হয়ে গেছে। এখন আর গুল ও বুলবুলের পিঠে সওয়ার নয় তারা। জিপসি দলের পিছনে চলতে চলতে চিন্তামগ্ন মিত্রবর্মা হঠাৎ বলে উঠলো—"তাবলে মানুষ একেবারেই অকর্মণ্য এ-কথা কিন্তু বলা চলে না। লোহার খনি, সীসার খনি দেখলে বোঝা যায় কি অপরিসীম পরিশ্রম করে মানুষ পাতাল অবধি পেঁছে গেছে। আমি মানুষের উপর থেকে একেবারে বিশ্বাস ঘুচিয়ে দিতে পারি না।"

—"মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে তো নিজেকেই অবিশ্বাস করা হবে, মিত্র। নিজের উপর বিশ্বাস হারালেই তো মানুষ যাজক সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে, আর কল্পনা প্রসূত দেব-দেবীদের দাসানুদাস হয়ে যায়।"

—"এই জিপসিদের দেখলে তো, বন্ধু ? আমরা কে তা ওরা জানেই না। শুধু জানে আমরা মজ্দক বাবার লোক, কিন্তু মজ্দক বাবার লোকদের সাহায্য করা যে অপরাধ, সেও তো অজানা নয় তাদের। আবার মজ্দক বাবা তো কোনো দেবতা নন, তিনি রক্তমাংসের মানুষ। তাহলে এই উচ্ছৃংখল জিপসিরা তাঁর নাম শুনলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করে কেন ? কারণ, তিনি এই অবহেলিত জাতিকে সমতার বাণী শুনিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। এই আশ্বাস যতক্ষণ

আছে, ততক্ষণ বিশ্বাসও আছে। তাই মানুষকে অবিশ্বাস করা যাবে না। দেব-দেবী যদি সত্যিই কেউ থাকেন, তিনি আছেন মানুষেরই মধ্যে।"

—"এ বিষয়ে আমি একমত, মিত্র। আমরা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব জিপসিদের থেকে।"

—"হ্যাঁ, বেশী হলে আর দু-দিন মাত্র। কে জানে দেখা হবে কি না আবার।"

—"মাসখানেকের মধ্যেই খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম আমরা। বর্দকের দিদি কিন্তু কাঁদবে খুব। আর সামাল দিতে হবে তোমাকে।"

—"সে তো দিতেই হবে। বর্দক থাকলে সামাল দেওয়া মুশকিল হতো আরো। তবে পথে পথে বাস যাদের, নতুন কিছু দেখার অবিরাম আনন্দে তারা হয়ত একদিন ভুলে যাবে আমাদের। তবু মাঝেমাঝে মনে পড়ে যাবে, কোনো কথায়, কোনো গানের কলি শুনে। আমরাও নতুন দায়িত্বের নেশায় ভুলে থাকবো ওদের। তবু মনে পড়ে যাবে মাঝেমাঝে, যখন দেখবো ··"

সামনে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে দিলো যে, সামনে উতরাই আছে। বৃক্ষহীন পাহাড়ের সানুদেশ অতিক্রম করতে করতে মিত্রবর্মার মনে পড়ে গেল বর্দকের গাওয়া গানের কলি—জিন্দগী সির্ফ জর-ব-সীম্ কা পৈমানা নহী [জীবন শুধুমাত্র টাকা-পয়সা সোনা-রুপোর ঠনঠন বাজনা নয়]। তারা নীচের শ্যামলিমা বর্জিত রুক্ষ উপত্যকার দিকে নেমে যেতে লাগলো।

দিহমগান [দমগান] বেশ বড় শহর। নামেই জাহির হয়ে যায় যে দিহ্‌টি [জনবসতি] মগদের [পুরোহিত] শহর। দমগান শহরটি অনেকগুলি আন্তর্জাতিক রাজপথের সংযোগস্থলে ব্যবসায়ী ও বণিকদের আনুকূল্যে বেড়ে উঠেছে। তাছাড়া মগ বা পুরোহিত গোষ্ঠী যথেষ্ট প্রভাবশালী সম্প্রদায়। সমস্ত ইরান জুড়ে ছড়িয়ে আছে পুরোহিত-সম্প্রদায়, এবং বর্তমানে তারা যে যেখানেই থাকুক, তাদের আদি নিবাস দমগান ও পাশ্বর্বর্তী অঞ্চল। তাই শহরটি উন্নতিশীল হওয়া খুব স্বাভাবিক। এখান থেকে একটি প্রশস্ত রাজপথ চলে গেছে উত্তরে গুরগান-এব দিকে, আর একটি গেছে অবহরশহর [খোরাসান] হয়ে পূবে।

তিনজন অশ্বারোহী বিশাল বাহলীক দেশীয় ঘোড়া নিয়ে একটু আগেই দমগানের নগর-সীমা ছাড়িয়ে চলে এসেছে। পাশাপাশিই এগিয়ে আসছিল তারা, এমন সময় এক প্রৌঢ় ইহুদি এসে তাদের সঙ্গে কথা বললো। অশ্বারোহী তিনজনই সৌগ্দী পোশাকে সজ্জিত। একজনের বয়স একটু বেশী, প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় বলা যেতে পারে। অন্য দু-জন আমাদের পূর্বপরিচিত জিপসি তরুণ। ইহুদিটি তাদের সঙ্গে কি কথা বললো তা আমাদের জানা নেই। ব্যবসার কথাও হতে পারে, অন্য কিছু হওয়াও অসম্ভব নয়। এ-অঞ্চলে ইহুদির বসবাস কম। বাসিন্দাদের অধিকাংশই চিকিৎসক। ইরান, হূন রাজ্য এবং সৌগ্দ দেশে ইহুদি চিকিৎসকদের খুব কদর। অশ্বারোহীদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ, তার চোখ-দুটি ঘন নীল, এবং তার লাল দাড়িতে সাদা ছোপ পড়তে শুরু করেছে। খোলা জায়গা। পথের দু-ধারে বৃক্ষহীন প্রান্তর ও টিলা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে শন্‌ শন্‌ করে। শীতের থেকে বাঁচবার জন্য সকলেরই পরিধানে মূল্যবান চামড়ার পোশাক, যা সাধারণত ধনবান বণিকরাই পরে থাকে। দুলকি চালে গল্প করতে করতে চলেছে তারা। মনে হয় যেন তারা লোক-লস্করের সঙ্গে মালপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে আগে, পথে কোথাও তাদের আবার ধরে নেবে প্রয়োজন মতো।

দমগান-এর পাশ্বর্বর্তী এলাকাও ইরানের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শুকনো। জল নেই, তৃণভূমি নেই। তাই জনবসতিগুলিও অনেক দূরে দূরে। এইসব জনবসতিও এ-রকম বন্ধ্যা বাতাবরণে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রধান রাজপথের পাশে স্বাভাবিক কারণেই লোক বসতি বেড়ে যায়, কারণটি মূলত বাণিজ্যিক। বর্তমানে চারিদিক আরো শূন্য মনে হয়, কারণ সামান্য যে-কটি গাছ আছে, সেগুলি শীত ঋতুর আগমনে ন্যাড়া হয়ে গেছে। কিছু গ্রামীণ মানুষ মেওয়ার বাগিচা তৈরী করেছে। জলের অভাবে সেগুলিও এখন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

বয়স্ক অশ্বারোহীটি বলছিল—"ঠিকই বলেছ, বন্ধু। ঋতুর মতোই মানুষেরও ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। তা না হলে এই নির্জন মরুসদৃশ রাজপথে সাক্ষাৎ হয় তিনজন রাজকুমারের, যারা কি না এখন ব্যবসায়ী? কি বিচিত্র সংযোগ।" দ্বিতীয় তরুণটি জবাব দিলো—"সত্যিই ভাগ্যের লীলা বড়ই বিচিত্র। আমাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা তো বলেছি আপনাকে। আপনি শেষ পর্যন্ত কুষাণবংশীয় রাজকুমার হয়েও…"

—"মানুষের জীবনের মতোই রাজবংশেরও উদয় আছে, অস্ত আছে। কুষাণ সাম্রাজ্য পাঁচশ' বছর যাবত হিন্দ [ভারত] থেকে কপিশ [কাবুল], বাহলীক, সৌগ্দ হয়ে পশ্চিম সমুদ্র [কাস্পিয়ান] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক-হবিষ্ক যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, কালে কালে তা সংকুচিত হয়ে আজ কয়েকটি সামন্ত উপনিবেশে এসে ঠেকেছে। তবু কপিশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদেরই হাতে ছিল। কাল যা ছিল, আজ নেই, কাল থাকবে না —এটাই ইতিহাসের নিয়ম। তাই তোমরা দু-জন এবং আমি আজ বণিক শ্রেণীর মানুষে পরিণত হয়ে দর-কষাকষি করছি, সেটাও ইতিহাসের ধারার অন্তর্গত। এমনই হয়ে থাকে।"

—"এ-ধরনের উত্থান-পতনের কারণ কি বলুন তো।"

—"সমস্ত শ্রেয় বংশের উত্থানের মূলে সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্তী দু-তিন পুরুষ। এরা উত্তম মানের যোদ্ধা এবং যুদ্ধকলাবিদ হয়। এছাড়াও এরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সুদক্ষ। প্রত্যেক রাজবংশীয় প্রধান তার রাজ্যের ভার দিয়ে যেতে চায় উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর হাতে। কিন্তু কয়েক পুরুষ রাজত্ব ভোগের পরেই রাজবংশীয় পুরুষ আত্মতুষ্টি-রোগে ভুগতে থাকে, তারা বুদ্ধির প্রয়োগ কমিয়ে জোর দেয় শুধু বাহুবলের দিকে, এবং ফলে বুদ্ধি প্রয়োগের জন্য তারা রাখে ভাড়াটে লোক, সৈন্যদলে রাখে ভাড়াটে সেনাপতি। আর নিজেরা বিলাস-ব্যসনে ডুবে যায়! এই ভাড়াটে বুদ্ধিমান গোষ্ঠী ও ভাড়াটে সেনাপতি মিলেই রাজ্যের শাসনভার গ্রাস করে নেয়।"

—"এভাবেই তাহলে শক, কুষাণ, পার্থিয়ান সকলের পতন ঘটেছে?"

—"হ্যাঁ, বন্ধু। অথচ, কুষাণরা মূলত শক, এবং পার্থিয়ানরা মূলত কুষাণ।"

—"আর কেদারীয় হূনরা এসে সকলের উপর বাজি মেরে গেল"—এতক্ষণে মুখ খুললো মিত্রবর্মা। বয়স্ক পুরুষটি বললো—"ঠিক তাই। শত্রুপক্ষের বাহুবল যেমনই হোক না কেন, মনোবলের অভাব হলে তাকে হারিয়ে দেওয়া সহজ হয়ে যায়।"

দ্বিতীয় তরুণটি যেন যাচাই করে দেখবার জন্যেই বললো—"যাচ্ছি তো কেদারীয় হূনদের কাছেই আর্জি নিয়ে। দেখা যাক, কি হয়।"

—"বিফল হবে না, জানি আমি। হূনরা কাউকে ফেরায় না সহজে।"

—"হ্যাঁ, আপনিও তো সাহায্য পেয়েছেন হূনদের কাছ থেকে। কিন্তু তারা আশ্রিতকে ফেরায় না কেন জানেন?"

—"অবশ্যই জানি। সাধারণ মানুষের নেতা, বা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাকে তারা সাহায্য করবে না। কোনো রাজবংশই সাহায্য করবে না তাদের। কিন্তু ক্ষমতাশালী রাজবংশ দুর্বল রাজবংশকে সর্বদাই সাহায্য করবে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ বিশ্বাসযোগ্য নয়, সময় বুঝে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। পড়তি রাজবংশ শুধু টিকে থাকার চিন্তায় মশগুল থাকে, আবার তারা সাধারণ মানুষের পর্যায়েও যেতে চায় না, তাই তারা সচরাচর বিদ্রোহ করে না, সামন্ত রাজার মর্যাদা পেলেই বশে থাকে।"

—"হ্যাঁ, যেমন পার্থিয়ান সোরেন-পহলব ইরানের সাসানী রাজবংশের সামন্ত হয়ে আছে। অবশ্য তাদের যথেষ্ট সম্মান দেয় সাসানীরা।" —"বন্ধু, সাধারণ মানুষকে সম্মান-মর্যাদা দেওয়ার থেকে ভূতপূর্ব রাজন্যবর্গকে সম্মান দিলে সুবিধা অনেক বেশী। পাশাপাশি দেশের রাজাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক একটা থাকেই সাধারণত। সে-সম্পর্ক বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে ক্রমশ বাড়তেই থাকে। রাজন্য গোষ্ঠী সাধারণের মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দিতে চায় না, কারণ সাধারণ মানুষই সংখ্যায় অধিক।" মিত্রবর্মা বলে উঠলো—"যে কোনো দেশেরই ধন-ঐশ্বর্য এইভাবেই কয়েকটি বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। একদিন হয়তো এ-রকমই বণিক-তন্ত্র গড়ে উঠবে, তারা মুখে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে ভিতরে ভিতরে আরো ঘৃণ্য আটক-জাল বিস্তার করবে সাধারণ মানুষদের জন্যে! যারা একদিন তস্করের হাতে ছিল, তারা চলে যাবে দস্যুর খপ্পরে!"

—"সত্যি বলছি, বন্ধু, আমিও ব্যবসায়ে নেমেছি এই জন্যেই যে, ব্যবসা ছাড়া ধনদৌলত কামানো যায় না, আর ধনদৌলত থাকলে তবেই রাজ-দরবারে সম্মান পাওয়া যায়। অবশ্যই কিছু কিছু হাতকে মাঝেমাঝে দিনারের উষ্ণ স্পর্শ ছোঁয়াতে হয়, তবেই কাজ হয়। কুষাণ বংশীয় রাজকুমার হবার দরুন আমার পৈতৃক যা সম্পত্তি তাতে আমি হেসেখেলে পাঁচ-ছটা পত্নী এবং অগুনতি ছেলেপিলে নিয়ে জীবন কাটাতে পারি। কিন্তু তাতে তো শুধু সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হতো। তাই শুধু সামন্ত হয়ে থেকে লাভ নেই, সেই সঙ্গে বণিকও হতে হবে। জানো বন্ধু, পৃথিবীতে সব রাজতন্ত্রই শেষ কালে পরিণত হবে বণিকতন্ত্রে।"

কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেল যে কুষাণ রাজকুমার পারিবারিক রীতি অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিল। চীন সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ, কারণ চীনের বিভিন্ন রাজ্যে সে জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মুখে সে যাই বলুক, বণিকের কাজ সে বেছে নিয়েছে ভ্রমণের নেশা চরিতার্থ করতে। আবার ভাষাতত্ত্বেও তার জ্ঞান অসামান্য। এক-একটি ভারতীয় ও ইরানী শব্দের উৎপত্তি, সেগুলির

আদি অর্থ, পরিবর্তিত অর্থ এবং পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে যে-সব আলোচনা করলো, তাতে চমৎকৃত হলো তরুণ দুটি। শব্দ এবং ভাষা নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামায়নি কখনও, তবে তারা বুঝতে পারলো যে ভাষাজ্ঞান মানুষের মনকে অনেক প্রসারিত করতে পারে। (এমন কি দেশভ্রমণ যে মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়, দেশ ও রুচি অনুযায়ী সৌন্দর্যের ধারণা যে বদলে দেয়, এ-সব তথ্য তরুণ-দুটির অজানাই থেকে যেত—ভাগ্যে এই বয়স্ক কুষাণ রাজকুমারের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে।) অন্তরজাগর যে আন্তর্জাতিকতার ব্যাখ্যা তাদের সামনে করেছিলেন, আজ তারা সেই স্বপ্নময়তার বাস্তব রূপায়ণ দেখছিল।

অশ্বারোহী তিনজন যখন তন্ময় ছিল নিজেদের মধ্যে আলোচনায়, আর বিশাল বাহলীক ঘোড়াগুলি চলছিল নিজেদের ইচ্ছামতো চালে, তখন সহসা বাতাস মাতাল হয়ে উঠলো, পথের কাঁকড়গুলি বেজে উঠলো বিচিত্র ধ্বনিতে। এই উন্মুক্ত প্রান্তরের পথে যাত্রীদের পক্ষে কোনো আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই তারা দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সোগ্দী বণিকরা আজ খোরাসানের প্রধান নগর নেশাপোরে [নিশাপুর] প্রবেশ করলো। সম্রাট প্রথম শাপোর এই নগরটির প্রতিষ্ঠাতা [২০শে মার্চ ২৪২ খৃঃ অব্দে শুরু হয় এবং ২৭২ খৃঃ অব্দে শেষ হয়]। প্রথম শাপোর একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসন্নিবদ্ধ নগর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি ব্যর্থ হননি। নগরটি চতুষ্কোণ, প্রধান দ্বার চারটি, এবং উঁচু প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত। নগরের প্রতিটি রাজপথ সমান্তরাল, তাই একদিকের পথ যখন অপরদিকের পথগুলির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখনই সৃষ্টি হয়েছে সমকোণের। নেশাপোর নগর ভারত-চীন বাণিজ্য-পথের উপর অবস্থিত, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এ-ছাড়াও খোরাসান এবং নেশাপোর নানা ধরনের শিল্প-সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিখ্যাত। নেশাপোর প্রাচীর-চিত্রের [ফ্রেস্‌কো] একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র, এখানকার প্রাচীর-কালীনও সূক্ষ্ম নকশার কাজের জন্য সর্বত্র সমাদৃত। খোরাসানের রাগভিত্তিক চটুল গীত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরে একদিকে তেহেরান-তস্পোন ও অন্যদিকে উত্তর ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

নগরে প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধে হলো না। বয়স্ক সোগ্দী বণিকটি নগরে সুপরিচিত, যাওয়া-আসার পথে নগর-অধিকারীদের উৎকোচ ও ভেট দিয়ে সে ভালোই হাত করে রেখেছে। সীমান্ত-নগরগুলিতে এ-ধরনের দরাজ-হাত মানুষদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। ষোলোটি চৌরাস্তা আছে এ-নগরে। রাজধানী তস্পোনের মতো বিক্ষিপ্ত নয় এখানকার গঠনসৌকর্য— একজন তরুণ অশ্বারোহী পথ অতিক্রম করতে করতে ভাবছিল। তস্পোন তিগ্রা নদীর দু-কিনারে সাতটি উপনগরীতে বিভক্ত, আর নেশাপোর যেন সুদৃশ্য বাগিচার উপর বিস্তৃত এক কালীন, যার উপর নানা রঙের সমাবেশ। নেশাপোরের প্রধান সামন্ত-প্রভু, যিনি সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর সেনাপতি এবং দুর্গাধীশও, নগর থেকে দু-যোজন পথ দূরে সীমান্তবর্তী তুস দুর্গে বসবাস করে। তাতে কোনো অসুবিধা এখন পর্যন্ত হয়নি, বরং বিদেশী বণিকরা অধিকতর নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নগরে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজকর্ম করে থাকে।

কারবাঁ পিছনে পড়ে গিয়েছিল। অশ্বারাহী তিনজন স্থানীয় এক সামন্তের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলো। সামন্ত তার পুরানো বন্ধু বয়স্ক বণিককে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তার তরুণ সঙ্গী দু-জনকেও সে সাদর স্বাগত জানালো। তরুণ দুটি কোনো সরাইখানায় থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সামন্ত খুবই ব্যথিত বোধ করলো, এবং তার সনির্বন্ধ অনুরোধে তরুণ দুটি প্রাসাদেই থাকতে রাজী হলো। বয়স্ক বণিকটি সামন্তকে জানালো যে তরুণ দুটি সোগ্দ রাজবংশীয় কুমার। বিশেষভাবে দ্বিতীয় তরুণটির পরিচয়

দিতে গিয়ে সে বলেছিল যে কুমার খুবই প্রাচীন এক সামন্ত-বংশের উত্তরাধিকারী, এবং আসলে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে সে। অবশ্যই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সে বাণিজ্যের হালচালও কিছুটা বুঝে নিতে চায়।

বণিক-ত্রয়ী কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে না নিতেই হৈ চৈ করে এসে পড়লো কারবাঁ। সামন্ত প্রভুর বিশাল প্রাঙ্গণটি শতো-শতো ভারবাহী পশু এবং পণ্য-সামগ্রীতে ভরে গেল। পণ্যসামগ্রী গোছগাছ করে তুলে দেবার পরে কারবাঁর সর্দার জানালো যে নেশাপোর নগরের পর কাছাকাছি অন্য কোনো বড় শহর নেই। তার লোকজন সোগ্দ থেকে একটানা চলতে চলতে পথে লম্বা বিশ্রাম পায়নি। ঘোড়া-খচ্চর ইত্যাদি ভারবাহী পশুদেরও পায়ের কৃত্রিম ক্ষুর গেছে ক্ষয়ে। নেশাপোরে বসবাসের ব্যবস্থা উত্তম, বহু পশু-চিকিৎসকও আছে। তাই শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে, এবং ভারবাহী পশুদের নতুন করে সতেজ করবার জন্যে তারা সাত-দশদিন নেশাপোরেই থাকতে চায়। বয়স্ক বণিকটি সর্দারের দাবি মেনে নিল। এ-নগরে তারও যে দু-একজন রাত্রিসঙ্গিনী নেই এমন তো নয়। সর্দার দ্রুত সংবাদ পাঠিয়ে দিলো সামনের চটিতে। সামন্ত-প্রভু কয়েক সপ্তাহের জন্য তেহেরান যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময়ে বণিক তার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেছে। সামন্ত-প্রভু তার কন্যা নবানদুখ্‌ত্‌-এর হাতে অতিথিদের ভার অর্পণ করে, কারণ তার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তার স্ত্রী ছিল মাত্র একটি।

দ্বিতীয় তরুণটির খুবই পছন্দ হলো সামন্ত প্রভুর প্রাসাদ। সামন্ত তেহেরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবার পূর্বে কন্যা নবানকে বারবার বলে গেল, সে যেন তরুণ অতিথিটির দেখাশোনা নিজে করে, শুধুমাত্র পরিচারকদের হাতে যেন সব দায়িত্ব ছেড়ে না দেয়। নবানও শুরু থেকে তরুণ অতিথিটির প্রতি এক গভীর আকর্ষণ বোধ করছিল, তাই পিতার আদেশ পালনে সে কোনো ত্রুটি রাখেনি। বহুদিন যাবত পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত তরুণ রাজকুমারেরও এই সপ্তদশী রূপসীর সান্নিধ্য মনে হচ্ছিল পরম রমনীয়। নবানের রূপ অগ্নিশিখার মতো দহন করে না, বরং সেই স্নিগ্ধতা তাপিত হৃদয়কে শীতল করে। প্রথম দিন সন্ধ্যা যখন নেমে এসেছে, ঘর গরম রাখার জন্য জ্বলছে তাওয়ায় কাঠকয়লার আগুন, জানালা দিয়ে দেখা যায় একে একে জ্বলে উঠছে নগর-দীপ ও মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্রের মালিকা, তখন নবান কামরায় জ্বেলে দিচ্ছে পঞ্চপ্রদীপ। সেই প্রদীপ-শিখার প্রতিফলন পড়েছে নবানের আঁখিতারায়, আর মায়াবী নয়ন দুটি সে ধীরে ধীরে মেলে ধরেছে তরুণ রাজকুমারকে পলকের তরে দেখবার জন্যে। কিন্তু সে চমকে উঠেছে, রোমহর্ষের পুলক অনুভব করেছে দেহে মনে, যখন দেখেছে যে সেই দুটি মুগ্ধ চোখ, যা তার আসা-যাওয়ার পথে তাকে অনুসরণ করেছে ছায়ার মতো, এগিয়ে এসেছে কাছে, খুব কছে। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে, আর তারপরই অনুভব করেছে সবল বাহুর প্রবল আকর্ষণ, অধরে উষ্ণ

ঠোঁটের ভিজে ভিজে স্পর্শ। তার কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠেছে, হাঁটু হয়ে এসেছে দুর্বল, যেন পড়ে যাবে সে। খুব ভয় করেছে, খুউব ভালো লেগেছে তার।

এর পর থেকে রাজকুমারের কামরায় কোনো পরিচারক প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি। প্রথম সন্ধ্যায় সপ্তদশী নবান তিনবারই মাত্র এসেছে গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা থেকে সকাল পর্যন্ত কতবার সে এঘরে আনাগোনা করেছে, সে হিসাব কেউ যদি রাখতো, তবে অবশ্যই মুশকিলে পড়তো এই মেয়ে। নবানদুখ্‌ৎ এক সামন্ত প্রভুর আদরিণী বুদ্ধিমতী কন্যা। সামন্ত-প্রভু যখন তার স্ত্রীর সামনে অতিথি রাজকুমারের রূপ ও গুণের প্রশংসা করছিল, তখনই সে বুঝে গিয়েছিল যে এই রূপবান পুরুষটিকে হৃদয় দান করলে মাতা-পিতার তরফ থেকে কোনো আপত্তি হবে না। রাজকুমার এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তার আচার-ব্যবহারেও পরিস্ফুট হতে থাকে বিশেষ ধরনের আভিজাত্য যা নবান তার পিতা এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কখনও দেখেনি।

দ্বিতীয় দিন কেটে গেল নতুন পরিচয় ও প্রণয়ের উন্মাদনায়। সন্ধ্যায় তারা দু-জন একান্তে বসে পান করলো উদুম্বরী মদিরা, কিন্তু কক্ষে চষক ছিল একটিই। তৃতীয় দিন নবানকে আর লুকিয়ে-চুরিয়ে যেতে হলো না রাজকুমারের কক্ষে। নবানের মা দাস-দাসীদের মাধ্যমে সব খবরই পাচ্ছিল, কিন্তু তার মৌনতাকে নবান সম্মতির লক্ষণ হিসাবেই ধরে নিল, এবং সারাটা দিন বসে থাকলো রাজ-কুমারের সঙ্গে একই আসনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। দাসীরা কতবার কক্ষে প্রবেশ করলো এবং চলে গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না সে। রাজকুমার নারী-হৃদয় ও নারী-শরীর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল না। কিন্তু নেশাপোর নগরের এই সামন্ত-কন্যা যেন তাকে স্বর্গের দেবতা বানিয়ে তুলেছিল। গত কয়েকদিন সে বয়স্ক বণিক এবং সাথী তরুণটির সঙ্গে একবারও দেখা করতে যায়নি। বয়স্ক বণিকটি যে রাজকুমারের অন্তর্ধান-রহস্যের কারণ বুঝতে পারেনি তা নয়, আর অন্য তরুণটি তো ছিল তার অভিন্ন হৃদয় মিত্র। বয়স্ক বণিকটি জেনে গিয়েছিল যে রাজকুমার বেশ কিছুদিন নেশাপোরে থাকতে চায়। কিন্তু সে কুমারের বাসনাকে প্রশ্রয় দেয়নি। যে কোনো মানুষ যখন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলে, সে-পথ যতই বন্ধুর হোক, পথের দু-পাশে যতই ছায়াচ্ছন্ন বীথিকা সাজানো থাকুক, ক্লান্তি দূর করতে অধিক সময় ব্যয় করা ঠিক নয়—এ তথ্যটি বণিকের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। সীমান্ত এখান থেকে বেশী দূরে নয়, এবং সীমান্ত-শহরে বেশীদিন থাকলে বিদেশী বণিকদেরও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে, তাই অষ্টম দিন সকালেই যাত্রা শুরু করতে হবে, এ সংবাদ সে পেঁছে দিলো রাজকুমারের সমীপে।

অথচ সাতদিন তো কেটে যায় দেখতে দেখতে, কোনো চিহ্ন থাকে না তার,

বুদ্বুদের মতো। প্রতি রাত্রে কুমার শয্যায় শুয়ে রোমন্থন করে সারাটা দিনমানের স্মৃতি, আর তার মনে হয় এত হাসি এত গান এত খেলা আলিঙ্গনের নিবিড় ক্ষণ চুম্বনের উষ্ণতা—একদিনের মধ্যেই এত কিছু ঘটে যাওয়া কি করে সম্ভব হলো! অথচ, এখন, এই একা শয্যায়, সেই অবিমিশ্র সুখানুভূতির স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই তো বাকী নেই! চলে যেতে হবে, বয়স্ক বণিক বন্ধুটি খবর পাঠিয়েছে, মাঝে মাত্র আরও তিনটি রাত! রাজকুমার মনে মনে দেব-দেবীদের কাছে প্রার্থনা জানায়—কালকের দিনটা যেন হয় পৃথিবীর দীর্ঘতম দিন, সূর্যদেব যেন অস্তাচলের পথে বিলীন হয়ে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ান, হাসি-মুখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকেন তাদের দু-জনের দিকে। এইসব অলীক কল্পনার রঙীন আঙ্রাখা বুনতে বুনতে একসময় কুমারের দু-চোখ বুজে আসে ঘুমে, যে চোখ এখন সারারাত স্বপ্ন দেখবে নবান কন্যাকে।

নবান এভাবে কোনোদিন নিজেকে কারো সামনে মেলে ধরেনি আগে। তার সতেরো বছরের কুমারী জীবনে কখনও কোনো পুরুষের পদক্ষেপ ঘটেনি। যে পুরুষটি নীরবে প্রবেশ করলো তার হৃদয়ের অন্তরতম নিভৃতে, তাকেই সে চেয়েছিল একান্ত আপন করে, চিন্তাভাবনার অবকাশ সে পায়নি। ক্ষণিকের অতিথি যে থাকবে না চিরকাল, এ বোধও আক্রান্ত করেনি তাকে। কিন্তু চতুর্থ দিন সহসা তার খেয়াল হলো—যে এসেছে তার জীবনে সে কি থাকবে চিরকাল! এক তীব্র যন্ত্রণা তাকে আকুল করে তুললো, তবু কোথায় এবং কিসের যে সেই যন্ত্রণা, বুঝতে পারলো না সে। এক অজানা আশঙ্কায় নিশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তার উজ্জ্বল মুখে ছায়া পড়লো মলিনতার।

সেই ছায়া কুমারের নজর এড়ায়নি। নির্জন কক্ষে নবানকে দু-হাতে বুকের মাঝে টেনে নিল সে। ডান হাতে তার অবনমিত মুখখানি তুলে ধরে লাজুক চোখদুটিকে চুম্বন করলো—"আজ এত চুপচাপ যে?" নবানের চেহারায় মলিনতার ছাপ গাঢ়তর হলো, চোখ নামিয়ে নিল সে, ঠোঁট কাঁপতে লাগলো থরো থরো, প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারলো না।

—"আমি জানি নবান! তুমি নিশ্চয় ভাবছ আমাদের মিলনের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাঝখানে শুধু তিনটি রাতের ব্যবধান, তারপরেই আমাদের দূরে সরে যেতে হবে। তাই না?" উত্তরে নবানের দু-চোখে এক পাগলাঝোরার ঢল নামলো, সে মুখ লুকালো কুমারের বুকে, আর দু-ফোটা তপ্ত আঁখিজল পড়লো কুমারের হাতে। সে বিচলিত কণ্ঠে বললো—"কেঁদ না, নবান! আমি চপল মানসিকতার মানুষ নই, তাই আমার ভালোবাসা শরৎকালের বৃষ্টির মতো ক্ষণিকের মায়া নয়। তোমার-আমার ভালো-বাসা চিরকালীন! না কেঁদে, আমি যা বলতে চাইছি বুঝবার চেষ্টা করো!"

নবান ফিসফিস করে বললো—"তুমি তো পরদেশী বণিক, দু-দিনের জন্য

ডেরা বাঁধো এক জায়গায়, তারপর চলে যাও অন্য কোনো ডেরায়। সেই সব গান শোনোনি তুমি—ইরানের কবিরা কতই না গান পরদেশী প্রেমের বিপক্ষে রচনা করেছেন?"

—"শুনেছি নবান, তুমি ফ্রামরোজ আফতাবের মতো কবিদের কথা বলছ! কবিরা সব সময়েই যে সত্যিকথা বলে তা কিন্তু নয়। বরং অধিকাংশ কবিই নকল দুঃখের চর্চা করে থাকে। সে যাই হোক, কবিরা অন্ন ও যশের আশায় যা ইচ্ছা লিখুন এখন কথা চলছে তোমার-আমার ভালোবাসার পরিণতি সম্পর্কে। শুধু কথায় হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে না, আবার আমাকে চলেও যেতে হবে এটাও নিশ্চিত, তাই তোমার অনামিকায় আমি পরিয়ে দিই আমার রাজচিহ্ন, আমার প্রেমের পদ্মরাগমণি! এ কেবল অলংকার নয়, নবান! একদিন সময় হলে তুমি জানতে পারবে এর মূল্য কি!"

নবানের অনামিকায় সেই পদ্মরাগমণি স্থান পেল। অপলকে দেখছিল সে কুমারের গম্ভীর মুখচ্ছবি। সহসা সে অনুভব করলো এই মানুষটা পরদেশী নয়, অপরিচিত নয়, সে তার একান্ত আপনজন। সে যদি অনেক দূরে চলেও যায়, সে কখনও ভুলবে না নবানকে, আসবেই, ফিরে সে আসবেই! সজোরে সে কুমারের মুখ চেপে ধরলো নিজের বুকে—"আমি একটা বোকা মেয়ে, কুমার! আমার মূর্খতায় রাগ করো না! কিন্তু আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি, সম্ভবত অবিশ্বাস আর বিচ্ছেদের মধ্যে তফাৎটা ধরতে পারিনি আমি! রাগ করেছ?"

—"না নবান! সম্পর্ক যেখানে অনুরাগের, সেখানে বিরাগকে টেনে আনার অর্থ হয় না কোনো! দেখছ না, অনুরাগের স্পর্শে তোমার স্তনবৃন্ত কঠিন হয়ে বিঁধছে আমার মুখে বুকে। ক্রমশ দ্রবিত হতে হতে এক প্লাবনে ভেসে যাচ্ছ তুমি। আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে! আমি তোমার সবকিছু চাইছি, নবান!"

নবানের পায়ের নীচে হতে থাকে ভূমিকম্পন। তার স্তনবৃন্তে সহসা সে পায় সরস ঠোঁটের আশ্লেষ। কি আশ্চর্য! কোথায় গেল তার আঙরাখা, কোথায় গেল কাঁচুলী-বন্ধন। এক সময় হারিয়ে যেতে যেতে সে তার গভীরতর সত্তায় অনুভব করলো প্রবল বিশাল ও কঠিন এক পৌরুষের অনুপ্রবেশ। বড় ব্যথা, বড় মধুর বাঁধভাঙা প্রেয় ব্যথার আবেশকে একাত্ম করতে করতে এক সময় নবান যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। সে জেগেই ছিল, সমর্পণের আকুতিতে রক্তিম হয়ে উঠেছিল, তার সমস্ত দেহ-মনে উড়ছিল অগণিত রঙীন প্রজাপতি, ফুটে উঠছিল কুঁড়ি থেকে সুগন্ধী ফুলের সমারোহ। সেদিন আর নবান ফিরে যায়নি তার কক্ষে।

দুটি দিন দুটি রাত কেটে যায় দুঃসহ প্রবল আবেগে। নবান এখন যেন এক অন্য দুনিয়ার মানুষ। সে আর আগের মতো দোলাচলচিত্ত নয়। এই সুন্দর পুরুষটি সত্যি সত্যিই কোনো রাজকুমার, না কি নিরাশ্রয় ভবঘুরে—সে

সব প্রশ্নে তার আর রুচি নেই। যেই হোক, সে তার মনের মানুষ। ফিরে সে আসবেই, আসতেই হবে তাকে, নবান এ-কথা বুঝেছে।

শেষ রাত কেটে গিয়ে এখন ভোর। কুমারের বুকে মুখ লুকিয়ে নবান জানতে চাইলো—"তোমার আমার মিলনের ফলস্বরূপ কোনো অতিথি যদি আসে, কোথায় খবর দেবো তোমাকে?" অধীর আগ্রহে তাকে বাহুপাশে বেঁধে প্রশ্ন করে কুমার—"ফল! আমি জানতে পারবো, নবান! ঠিক জেনে যাব! পুত্র হোক বা পুত্রী, সেই হবে আমার প্রিয়তম আপনজন। আমার সব কিছু পাবে সে!"

প্রেমের সীমা বাণীকে অতিক্রম করে গেলে সহজ কথাও ব্যক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কুমার বলতে পারেনি, সে যা বলতে চায়। নবান যা শুনেছে, সেই অনেক। বেশী বুঝে লাভ কি? তাতে তো ভালোবাসা তিক্ত হয়ে যায়। উভয়ে উভয়কে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। বাইরে দিনের আলো তখন উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

তিন বণিক অতিথি যখন সামন্তের প্রাসাদ থেকে বিদায় নিল, তখন নবান আসেনি, আসতে পারেনি। সে তখন কুমারের পরিত্যক্ত শয্যায় বালিশে মুখ লুকিয়ে উপুড় হয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে। নবানের মা সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল। সে অনেক চেষ্টা করে মেয়েকে নিয়ে গেল তার নিজস্ব কক্ষে। হঠাৎ তার চোখ পড়লো নবানের অনামিকার দিকে, আর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলো—"কোথায় পেলি এই আংটি তুই? কে দিলো তোকে?"

নবান অবাক হয়ে বললো—"কে আবার দেবে? উনি দিয়েছেন, স্মারক হিসাবে!"

মা কেঁপে উঠলো—"লুকিয়ে রাখ্ এই আংটি! কেউ যেন না দেখে! তোর ভালোর জন্যেই বলছি!"

—"কেন মা? কি হয়েছে?" সরল মনে প্রশ্ন করলো নবান, কিন্তু মা-র মুখচোখের অবস্থা দেখে সে খুব ভীত হয়ে উঠছিল।

—"এ এক বিশেষ চিহ্ন! এই আংটি যিনি ধারণ করেন তিনি হয় ইরানের শাহেনশাহ, নয় যুবরাজ! যুবরাজ জামাস্প এখন সিংহাসনে আসীন, তাই এই আংটি ভূতপূর্ব শাহেনশাহ কোয়াতের! আমাদের অতিথি মহামান্য কোয়াত্ ছাড়া অন্য কেউ নন! খুব সাবধান, নবান! এ ব্যাপারটা অন্য কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে! তাহলে আমাদের সকলেরই বিপদ!"

শহর থেকে অনেক দূরে পেঁাছে গেছে বণিক তিনজন। কোয়াত্ মনে মনে ভাবছিল—এমনই চলে যেতে হয় মাঝেমাঝে, সব কিছু ছেড়েছুড়ে, যেমন হেমন্ত যায় ফাঁকা মাঠ ফেলে রেখে অন্য কোনো রিক্ততার কাছে, পথের বন্ধু ছেড়ে পথে পথে চলে যায় ফকির যেমন, সেইভাবেই মাঝেমাঝে চলে যেতে হয় দূরে, আবার কাছে ফিরবার স্বপ্ন নিয়ে।

অশ্ব এবং অশ্বতর বাহিনী পিঠের উপর পণ্যসামগ্রীর বোঝা বহন করে এগিয়ে চলেছে এক গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে। কারবাঁর পিছনে পিছনে চলেছে তিনজন অশ্বারোহী সোগ্দী বণিক। এখন বেলা দ্বিপ্রহর। পাহাড়ী পথ ক্রমশ উপরের দিকে উঠে চলে ছ। অশ্বারোহী তিনজনই একেবারে নির্বাক। গতকাল সকালে যাত্রা শুরু করবার পর থেকে তারা সামান্য দু-একটি বাক্যবিনিময় করেছে মাত্র। একস্থানে গিরিসঙ্কট বেঁকে আরো একটি চড়াইয়ের দিকে উঠে গেছে। বাঁকের বাঁ-দিকে পাহাড় কেটে কেটে কিছুটা জায়গাকে সমতল করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় কয়েকটি মাটির ঘর। সেগুলির চারিদিকে উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনী। সামনের দিক থেকে একজন ভৃত্য এসে জানালো যে সীমান্তপাল হাজির আছে, এবং ভিড়ও নেই একেবারেই, কাজেই অধিক সময় নষ্ট হবে না। কারবাঁ এগিয়ে চললো সীমান্তপালের দপ্তরের দিকে। অশ্বারোহীরা এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের ছাউনির দিকে, আর তাদের হৃদ্স্পন্দন হচ্ছিল দ্রুততর। এই শেষ বাধা, তারপরেই মুক্তির সম্ভাবনা! পার হতে পারব কি এই বাধা? —এইসব চিন্তা ক্লিষ্ট করছিল তাদের। দেখা গেল সীমান্তপাল বয়স্ক বণিকটির পূর্ব পরিচিত। উভয়েই পরস্পরকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলো, এবং গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো তারা। তার মধ্যেই হাত বদল হয়ে গেল এক থলি সুবর্ণ দিনার, তাই আলিঙ্গন-অভিবাদনের পালা শেষ হয়ে গেলেও দেখা গেল সীমান্তপালের মুখে সন্তোষের হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

সংলগ্ন একটি কক্ষে রেশমী মাদুর বিছিয়ে একে একে সাজানো হলো কিছু ফল, লাল মদিরা ও পানপাত্র। সীমান্তপাল দুই তরুণ বণিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত হলো। এখনো এরা তেমন পাকাপোক্ত বণিক নয়, অথচ সুবর্ণ দিনারের ব্যাপারে খোলা-হাত। সীমান্তপাল এ-ধরনের বণিকদের খুবই কদর করে থাকে। বাইরে প্রহরীরাও বণিকের পণ্যসামগ্রী চোখ বুলিয়ে দেখেই বলে দিলো—"ঠিক আছে সব"। ততক্ষণে তাদের হাতও বেশ গরম হয়ে গেছে দিনারের স্পর্শে—মনও প্রসন্ন। ঘরে বয়স্ক ব্যাপারীটি এমন নিশ্চিন্ত মনে বসে চষকের পর চষক শেষ করছে, যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই তার। তরুণ দুটি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়েছে তখন। সীমান্তপালের প্রশ্নের উত্তরে বয়স্ক বণিক জানালো যে, তারা যাবার সময়ে হিরাতের পথে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রহরীরা এসে জানালো যে মাল-পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সীমান্তপাল তার ধনী বণিক বন্ধুদের ছাড়তে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত অতিথিরা যখন কয়েকটি অকাট্য কারণ দেখালো, তখন সে আর ধরে রাখার জন্য জোর করলো না।

চড়াই খুব একটা বেশী নয়। সামনে কারবাঁকে রেখে তিন বন্ধু উঁচু-নিচু পথ অতিক্রম করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পেঁছে গেল পাহাড়ের

মাথায়। রাজকুমার ও মিত্রবর্মা পিছনের দিকে তাকালো একবার, রুক্ষ ধূসর বৃক্ষহীন ইরানের দিকে। বয়স্ক বণিকটি বলে উঠলো—"যাত্রার মধ্যপথে পিছনের দিকে তাকাবেন না, মহামান্য কোয়াত্! সামনের দিকে নজর না রাখলে হোঁচট খাবার ভয় থাকে। বিশেষ করে, পথ যেখানে অসমতল।" কোয়াত্ লাজুক হেসে তাকালো সামনে, উত্তর দিকে। পর্বত শ্রেণী সেখানে ক্রমশ নীচু হতে হতে সমতলে গিয়ে মিশেছে। আরো উত্তরে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল পীত বালুকারাশি আদিগন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

উতরাই বেয়ে সমতলে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হেফ্তালের [কেদারীয় হূন দেশ] সীমান্তপাল দু-হাত বুকে রেখে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো কোয়াত্কে, তারপর সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটি অনুচ্চ টিলার মধ্য দিয়ে। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে দেখা গেল একটি সমতল প্রান্তর, অনেকগুলি তাঁবু খাটানো আছে সেখানে, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ী নদী। কাছে পৌঁছাতেই সামনের দিক থেকে হেফ্তাল [কেদারীয়] অশ্বারোহী সেনাদল এগিয়ে এলো এক সুবেশ তরুণের নেতৃত্বে। যখন তাদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাতের ব্যবধান রয়ে গেছে, তখন সহসা হর্ষধ্বনি করে কেদারীয় তরুণটি লাফিয়ে নেমে পড়লো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। অন্যদিকে তখন কোয়াত্ও নেমে পড়েছে, এবং দৌড়াচ্ছে তরুণটির দিকে। মাঝপথে তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, অনেকক্ষণ যাবত শিথিল হলো না সেই নিবিড় বাহুবন্ধন।

—"যুবরাজ মিহিরকুল! কত বড় হয়ে গেছ তুমি! সেই ছোট্টটি দেখে গিয়েছিলাম!"

—"শাহেনশাহ কোয়াত্! এত বছর পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো! এ আনন্দ আমি কথায় প্রকাশ করতে পারছি না, বড় ভাই!

—"বোকা কোথাকার! বড় ভাইকে কি শাহেনশাহ সম্বোধন করে কেউ? ছেলেবেলাকার সাথী আমরা, আজ তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে, দীর্ঘকালের পথকষ্ট থেকে মুক্ত হলাম!"

কথা বলতে বলতে মিহিরকুল এবং কোয়াত্ এগিয়ে গেল একটি লাল মখ্মলী শিবিরের কাছে। সৈনিক ও সান্ত্রীরা ঝুঁকে পড়ে উভয়কে অভিবাদন জানালো, কিন্তু বার্তালাপে তল্লীন থাকায় সেদিকে দৃষ্টি পড়লো না তাদের। শিবিরের সামনে পৌঁছে কোয়াত্ পল্লবকুমার মিত্রবর্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মিহিরকুলের। বয়স্ক বণিকটি যে যুবরাজের পূর্বপরিচিত সেটা বোঝা গেল বণিকের ভব্য অভিবাদনজ্ঞাপন এবং মিহিরকুলের স্মিত হাসি দেখে।

শিবিরের দ্বারে এক অসাধারণ সুন্দরী ষোড়শী উদগ্রীব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বড়ই লাজুক সে, তাই চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না কোয়াতের দিকে। তবে মাঝেমাঝে সে যে আড়চোখে লুকিয়ে-চুরিয়ে অতিথিদের লক্ষ্য করছিল না, এমনও নয়। মিহিরকুল এগিয়ে হাত ধরে তাকে টেনে আনলো কোয়াতের সমীপে

—"বড় ভাই, ইনি হলেন রাজমহিষী ফিরোজদুখ্‌ত্‌-এর কন্যা। আপনি ওর আপন মামা, সে কথা ও জানে, দেখুন তবু লজ্জা পাচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে সুন্দরী কন্যাদের মগজে গর্দভের ঘিলু থাকে। আপনি কি বলেন?"

ষোড়শী এক অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গী করে বলে উঠলো—"হ্যাঁ, তুমি তো সবজান্তা পয়গম্বর।"

কোয়াত্‌ দু-হাত বাড়িয়ে তার ভাগিনেয়ীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো, চুম্বন দিলো তার ললাট-কেশ-আঁখিতে। কন্যা যখন চোখ খুললো তখন কোয়াতের দু-চোখে জল টলমল করছে।

মিহিরকুলের আদেশে পার্শ্ববর্তী শিবির দুটি বয়স্ক বণিক এবং মিত্রবর্মার জন্য সংরক্ষিত হলো। ষোড়শী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মিহিরকুল এবং কোয়াত্‌ প্রবেশ করলো লাল মখ্‌মলী তাঁবুটিতে। শিবিরের ভিতরে আজকের মাননীয় অতিথিদের জন্য স্বাগত-ব্যবস্থাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল। মিহিরকুল জানালো যে সীমান্তের ওপারে জানাজানি না হয়ে যায়, সেই কারণে সে মাত্র একশ' সৈন্য নিয়ে চুপিচুপি তাদের স্বাগত জানাতে এসেছে। সরকারীভাবে শাহী স্বাগত জানানো হবে রাজধানী মার্ভ নগরে। কোয়াত্‌ এই আড়ম্বরহীন কিন্তু অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বাগততে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছে। বিগত পনেরো-ষোলো মাস যাবত যে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, যেভাবে মৃত্যুর করাল ছায়া তাকে অনুসরণ করেছে পদে পদে, কেদারীয় রাজ্যসীমানায় প্রবেশ করবার পর, বাল্যবন্ধু যুবরাজ মিহিরকুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সব যেন মনে হয়েছে সুদূর অতীতের দুঃস্বপ্ন। মনে পড়ে শুধু সম্বিক্‌কে, অন্তরজাগর, আর সপ্তদশী সামন্ত কন্যা নবানকে—যারা তাকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিশারী প্রদীপ দেখিয়েছিল।

ছেলেবেলার বন্ধু-আত্মীয় মিহিরকুল আজ উত্তর ভারত-কপিশ-বাহ্লীক-সুগ্‌ধ্‌-খারেজম্‌-এর মহারাজাধিরাজ তোরমানের যুবরাজ। তার সঙ্গে এসেছে যে পরমা সুন্দরী সদ্য-যুবতী, সে তার আপন ভাগিনেয়ী। অথচ তার নাম এখনো জানা নেই কোয়াতের। কোয়াত্‌ যেদিন কেদারীয় হূন থেকে ফিরে গিয়েছিল ইরানে, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। মিহিরকুল ছিল সাত-আট বছরের বালক, আর এই কন্যাটি তখন ছিল সদ্যজাতা। তারপর দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে গেছে। আজ মিহিরকুল যেন এক সন্ধ্যাকালীন বৈঠকেই সতেরো বছরের সম্পূর্ণ ইতিহাস শুনতে ও শোনাতে চায়। সেও কি সম্ভব?

অতিথিদের বসানো হয়েছে লাল গালিচার উপর। সামনে নানা খাদ্যের সমারোহ, যার মধ্যে বৎসতর-মৃগ-পক্ষী মাংসই প্রধান। তাছাড়া আছে ইরান-ভারত-সৌগ্দ-এর নানা স্বাদু ফল। মেয়েটির সংকোচ দূর হয়ে গেছে, এখন সে এই শিবিরে গৃহিণীর ভূমিকায় নেমে পড়েছে। বহুমূল্য পানপাত্রে দুর্লভ লাল মদিরা ঢেলে সে একে একে বিলি করলো অতিথিদের মধ্যে। ভাবগম্ভীর

মিত্রবর্মার দিকে তাকিয়ে সে যেন একটু থমকে গিয়েছিল। বয়স্ক বণিক চষক থেকে পান করলো এক নিশ্বাসে, তারপরই বললো যে, সে বড় ক্লান্ত, এবং অনুমতি নিয়ে রাজকীয় শিবির থেকে চলে গেল নিজের শিবিরের দিকে। কিছু-ক্ষণ পর মিত্রবর্মাও আর থাকতে চাইলো না, সেও বেরিয়ে গেল শিবির থেকে।

রাজ-শিবিরে এখন শুধু তারা তিনজন। কোয়াত্ তার সুন্দরী ভাগিনেয়ীর স্বর্ণাভ কেশরাশিতে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করলো—"দিদির কি মনে পড়ে আমাকে?"

—সুন্দরী কন্যা কোয়াতের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো কাছে—"আপনার নাম করে কত যে কেঁদেছে মা, সে বলে শেষ করা যাবে না। যেদিন মা খবর শুনলো যে আপনাকে বিস্মৃতি কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, তারপর থেকে কয়েকদিন সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিল। পিতা মহারাজ অনেক বুঝিয়েছিলেন, তবু ফল হয়নি কোনো। তারপর বেশ কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল আপনি কারাগার থেকে পালিয়েছেন। তখন থেকেই মা বলতো আপনি একদিন আসবেনই এই দেশে। প্রায়ই পিতা মহারাজ গুপ্তচর পাঠাতেন ইরানে, কিন্তু আপনি যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলেন। সারা বিবরণ শুনতে শুনতে কোয়াত্ তার ভাগিনেয়ীর সোনালী চম্পক-অঙ্গুলি নিয়ে খেলা করছিল। কন্যার মধ্যেও আগের মতো সংকোচ আর ছিল না। সে মাঝে মাঝে ভাবগম্ভীর কোয়াতের দিকে অপলক তাকিয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল এমন সুদর্শন পুরুষ তাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

মিহিরকুল সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল কোয়াতের পানপাত্র যেন শূন্য না হয়। শিবিরের বাইরের পৃথিবী যেন লুপ্ত হয়ে গেছে তাদের কাছে। কোয়াতের ইদানীংকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অধিক কৌতূহল প্রকাশ করলো না মিহিরকুল। পরিবর্তে সে শোনালো তার ভারতযাত্রার বিচিত্র কাহিনী। ভয়ানক খীবর [খাইবার = মরণফাঁদ] গিরিপথ, বিশাল হিমবন্ত [হিমালয়] পর্বত-শ্রেণী, গন্ধমোদন [হিন্দুকুশ], কপিশার [কাবুলের] দ্রাক্ষাবলয়, সমুদ্রপ্রতিম হিন্দু [সিন্ধু] নদ—অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলো কোয়াত্, যেন তার চোখের সামনে একের পর এক ছবি ভেসে উঠছে। মিহিরকুল বলছিল—"তক্ষশিলা নগরে পৌঁছে এক অপরাধ-বোধে আক্রান্ত হলাম আমি। সেই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্রটি যখন বৌদ্ধ কুষাণ রাজাদের হাতে ছিল, তখন এক ভয়ানক যুদ্ধে আমারই পিতামহ তক্ষশিলা নগরকে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কি অপচয়! তারপর পঞ্চ-আবের [নদীর] দেশ অতিক্রম করে গেলাম যমুনার তীরে অবস্থিত মথুরা নগরে। মথুরা একদা শক রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সুদৃশ্য নগরটিও বর্তমানে পিতা মহারাজ তোরমানের অধীনে। শক রাজার সঙ্গে যুদ্ধে এ নগরটিরও অনেক ক্ষতি হয়।"

—"তাহলে কি কেদারীয় হূন সৈন্য কেবল রাজ্য জয় করেছে, সাধারণ মানুষের কথা, শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা চিন্তা করেনি একেবারেই?"

—"না, একেবারেই করেনি। আমাদের নিজেদেরও সংস্কৃতি বলে তো ছিল না কিছু! পিতামহের আমলেও, এমনকি পিতা মহারাজের প্রাথমিক রাজত্বকাল পর্যন্ত আমাদের পরিচয় ছিল ভবঘুরে লুটেরা। পিতা মহারাজ ইদানীং চেষ্টা করছেন প্রজারঞ্জনের, কিন্তু কুষাণদের সভ্য-ভব্য আচরণের স্মৃতি ভারতবাসীর মন থেকে ঘুচানো সহজ নয়! সাড়ে তিনশ'-চারশ' বছর রাজত্ব করেছে তারা! কিন্তু তারা তো ভারতের সঙ্গে এক দেহে লীন হতে পেরেছিল, আমরা তো এখনো তা পারিনি!"

ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য কোয়াত্ জেনেছিল মিত্রবর্মার কাছ থেকে। সেই বিশাল দেশ, যেখানে বীরের অভাব নেই, কলা-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যে দেশ সমগ্র বিশ্বে অগ্রগণ্য, সেই দেশ কি করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীন হয়ে থাকে—ভেবে পায় না কোয়াত্। মিত্রবর্মা বলেছিল—সংহতি নেই ভারতীয়দের মধ্যে, তবু তারা উন্নততর সভ্যতার মায়াডোরে বেঁধে ফেলে বহিরাগত শাসক জাতিকে, শেষ পর্যন্ত শাসক জাতিও পরিণত হয় ভারতীয় মানুষে। তাই সেই দেশের মৃত্যু নেই, তার নাম বদল হয় না কখনও। কেদারীয় হূনদের জাতি মূলত মিথু [=মিহির, সূর্য]। সূর্য ইরানীদেরও এক প্রভাবশালী দেবতা। আবার ভারতীয় হিন্দু জাতিও সূর্য উপাসক। হূন রাজা তোরমান কিছুদিন আগেই ভারতের গোপগিরি নগরে [বর্তমান গোয়ালিয়র] এক বিশাল সূর্য-মন্দির স্থাপন করেছেন বলে শোনা গেছে। ইরানী-কেদারীয় হূন-ভারতীয়—এরা কি ভবিষ্যতে কোনোদিন এক হয়ে যাবে, ভাবতে লাগলো কোয়াত্।

যদিও ইরানের সীমান্ত পার হয়ে এসেছে কোয়াত্, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহস হবে না কেদারীয় এলাকায় প্রবেশ করবার, তবু সীমান্ত থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে চলে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। পরদিন বিকেলে যুবরাজ মিহিরকুল, কোয়াত্ এবং অন্যান্য সঙ্গীরা শিবিরের পার্শ্ববর্তী নদীটির কিনারা ধরে রওনা হলো উত্তর দিকে। সন্ধ্যা যখন অতিক্রান্ত, তখন তারা পৌঁছালো মরুভূমির কাছাকাছি। সেই রাতটি এবং পরবর্তী সারাটা দিন তারা কাটালো মরুভূমি প্রান্তের বনভূমিতে, যেখানে নদীটির স্রোত রুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি সরোবর। সন্ধ্যার পর শুরু হলো তাদের মরুযাত্রা। মরুভূমির মধ্যে রাতের অন্ধকারে শুধু তারার আলোয় পথ চিনে সঠিক দিশায় চলা খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু শাহী পথপ্রদর্শক এক তরুণ সৈনিক যেন নিজের হস্তরেখার মতোই চেনে মরুভূমির পথ।

সারা রাত পথ চলেও ক্লান্ত হয়নি কোয়াত্। আয়েসের জীবন থেকে বিগত দিনগুলিতে সে সরে এসেছে সংঘর্ষময় জীবনে। আজ তার কাছে কোনো শ্রমই কষ্টসাধ্য নয়। পরদিনও মরুভূমি অতিক্রম করা সম্ভব হলো না।

তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে মুর্গাব নদী পার হতেই কিছুদূরে এক বালিয়াড়ির পিছনে দেখা গেল মার্ভ নগরের সুবিশাল ও সমুচ্চ প্রাকার শ্রেণী। হেফ্‌তাল বা কেদারীয় হূন রাজ্যের বৃহত্তম নগর এই মার্ভ। দূর থেকে যুবরাজ মিহিরকুলের পতাকা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রথ-অশ্ব-গজ-পদাতিকদের এক সুসজ্জিত চতুরঙ্গ বাহিনী এগিয়ে এলো স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে। সমস্ত নগরবাসী ইরানের পদচ্যুত শাহেনশাহকে সম্বর্ধনা জানাতে বেরিয়ে এসেছে প্রাকারের বাইরে। মার্ভের মুখ্য সিংহদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করলো মিহিরকুল ও কোয়াত্‌। পথ সিঞ্চিত করা হয়েছে সুগন্ধী জল দিয়ে, ধূলো যাতে না ওড়ে। চারিদিকে বাজছে আনন্দবাদ্য।

দুর্গে প্রবেশ করে কোয়াত্‌ দাস-দাসী পরিবৃত হয়ে শাহী বিশ্রামকক্ষে আশ্রয় নিল। এখন তার বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। এখনো মহারাজ ভগ্নীপতি ও স্নেহশীলা ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করা বাকি আছে। তাঁরা রয়েছেন অনেক যোজন পথ দূরে। সামনে এখনো রয়েছে মরুভূমির দুস্তর বাধা।

২২॥ পুনর্মিলন

এক সপ্তাহ মার্ভ নগরের রাজপ্রাসাদে নিরুপদ্রব জীবন যাপনের পর কোয়াতের শরীর ও মন আগের মতোই ঝরঝরে লাগছিল। বিগত দিনগুলিতে প্রবল মানসিক চাপ তাকে এতটুকু স্বস্তির অবকাশ দেয়নি। সেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে এখন রয়েছে বন্ধু-রাজ্যে। কোয়াতের যে বন্ধু, সে আবার ইরানের প্রবলতম শত্রু। সে মহারাজা তোরমান। এই খবর ইতিমধ্যে অবশ্যই পেঁছে গেছে ইরানে, এবং তস্পোনের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠীর এখন ক্ষোভে দুঃখে দিশেহারা পাগলের দশা।

নবম দিন কোয়াত্, মিত্রবর্মা ও যুবরাজ মিহিরকুলের যাত্রা শুরু হলো আবার। সকালে রওনা হয়ে দুপুর বেলা তারা চলছিল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। এ-অঞ্চলে এখন শীতের শুরু, তাই মরুপথে চলতে কষ্ট হলেও তা অসহনীয় বোধ হচ্ছে না। গ্রীষ্মকাল হলে রাত্তেই চলতে হতো। তাছাড়া, মরুভূমির পথেও স্থানে স্থানে রাজকীয় বিশ্রামালয় আছে, কারণ এ-পথে প্রায়ই যাতায়াত করে স্বয়ং মহারাজা তোরমান ও তার রাণীরা। চতুর্থ দিনে তারা পেঁছালো বক্ষু নদীর তীরে।

কোয়াতের এখন আর ছদ্মবেশের প্রয়োজন নেই। সকলেই জেনে গেছে যে, সে ইরানের সম্রাট, সামন্ত-শ্রেষ্ঠী পুরোহিতদের চক্রান্তে আজ সে গদিচ্যুত। কিন্তু একবার যে সম্রাট, চিরকালই সাধারণ মানুষের চোখে সে সম্রাট থেকে যায়। বিশেষ করে এই যুগে। ভবিষ্যতে হয়ত এ-ধরনের মনোভাব আর থাকবে না। তাছাড়া, ইরানের শাহেনশাহ আজ কোয়াত্ না হলেও কাল যে আবার সে গদি ফিরে পাবে না, তার ঠিক কি। আজকে যে পথের ভিখারী, কাল সে সিংহাসনে বসলে বসতেও পারে—রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এ-রকম বহুবার দেখা গেছে। কোয়াতের বাড়তি সুবিধা যে, সে মহারাজা তোরমানের পুত্র-প্রতিম নিকট-আত্মীয়। এইসব কারণে তোরমানের সৈন্যদল ও প্রজাদের সামনে তার ভাবমূর্তি সম্রাট হিসাবেই উজ্জ্বল। যাত্রাপথে সর্বত্র তার জন্য মহারাজ তোরমানের মতোই বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কোয়াত্ যে বিশাল সাদা বাহলীক অশ্বের পিঠে আসীন, সেটিও মহারাজা তোরমানের নিজস্ব অশ্বশালার সম্পত্তি। মহারাজা নিজে জাঁকজমক খুবই পছন্দ করে, কিন্তু কোয়াতের পোশাক খুবই দামী অথচ তা সাধারণ বলে মনে হয়। এ-নিয়ে মিহিরকুল কয়েকবার কথা বলেছে তার সঙ্গে, কিন্তু তেমন কোনো সাড়া পায়নি।

মার্ভ নগরে পেঁছাবার পর দু-তিনদিন পর্যন্ত মিত্রবর্মা মরু-নগরের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে মার্ভ নগর পার্থিয়ান এবং পহ্লবদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। যে-সময় মিত্রবর্মার পূর্বপুরুষ ইরানী পহ্লব থেকে ভারতীয় পল্লবে পরিণত হয়। তাই সে নগরটির ইতিহাস

সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক ছিল। দু-তিনদিন কোয়াতের অনেকটা সময় কেটেছে যুবরাজ মিহিরকুলের সান্নিধ্যে, তবু বেশীটা কেটেছে মহারাজা তোরমান প্রেরিত সৌগ্দী ও ভারতীয় সুন্দরীদের সমক্ষে প্রবাদপ্রতিম ইরানী যৌন ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রমাণ পেশ করতে। নারী-সংসর্গ সম্পর্কে কোয়াতু চিরকাল মনে করে এসেছে যে, সেই ক্রিয়া সুস্থ মানুষের মনে সুকুমার প্রবৃত্তির ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে। কিন্তু সেটা সর্বক্ষণের ক্রিয়া হতে পারে না, কারণ কর্মী পুরুষের সময় নানাবিধ ক্রিয়ায় বিভক্ত হওয়া উচিত। তাই চতুর্থ দিনেই নারী বাহিনীকে বাতিল করে কোয়াতু খোঁজ করেছিল মিত্রবর্মার। মিত্রবর্মার গবেষণারও ইতি হয়েছিল সেইদিন থেকেই।

যাত্রাপথের অধিকাংশ সময়ে কোয়াতের পাশাপাশি ছিল মিহিরকুল ও মিত্রবর্মা। আবার কখনো তোরমান-দুহিতাও তাকে সঙ্গ দিয়েছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। সুনসান মরুভূমির দিকে তাকিয়ে কোয়াতু মিত্রবর্মার কাছে জানতে চাইলো, ভারতেও কি মরুভূমি আছে? মিত্রবর্মা ভারতীয় পল্লব, মিহিরকুলও ভারত সম্পর্কে অবহিত, আর গৌতম বুদ্ধের দেশ সম্বন্ধে কোয়াতের কৌতূহলের শেষ নেই বললেই চলে। মিত্রবর্মা দক্ষিণ ভারতীয় রাজকুমার। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ভ্রমণ-পিপাসা তাকে বহু জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। সে বললো ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত [বর্তমান রাজস্থান-সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ] মরুকান্তার প্রদেশের কথা। মিত্রবর্মা সেই মরুভূমির প্রান্ত পর্যন্ত গেছে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। মিহিরকুল এ-দেশের মরু-অঞ্চলে রাক্ষস ও পিশাচের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসের কথা বললো। কিন্তু মিত্রবর্মার মতে প্রতিকুল আবহাওয়া ছাড়া কোনো মরুভূমিতেই অন্য কোনো রাক্ষস বা পিশাচ নেই। কথাটা শুনে তোরমান-দুহিতা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ভারতীয় তরুণটির দিকে। আশ্চর্য মানুষ তো! পিশাচ-রাক্ষসে বিশ্বাস নেই!

বক্ষু নদীর তীরে পৌঁছে মিত্রবর্মা অনেক চেষ্টা করেও তার মুখে প্রফুল্লতার উচ্ছ্বাস গোপন রাখতে পারলো না। মিহিরকুল বলে উঠলো—"বুঝতে পারছি মিত্র, আমাদের বক্ষু নদী দেখে তোমার মনে পড়ে গেছে গঙ্গা নদীর কথা! আমি গুপ্ত সাম্রাজ্যে ছদ্মবেশে পর্যটনের সময় সেই বিশাল-বিচিত্র নদীর দর্শন পেয়েছি।"

—"হ্যাঁ, যুবরাজ। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। তবে ঠিক গঙ্গা নদীর কথা মনে পড়েনি আমার। আমি ভাবছিলাম দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিতা গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী তিনটি বড় নদীর কথা।"

—"আমি দক্ষিণ ভারতে যাইনি, মিত্র। মথুরা নগরী থেকে দক্ষিণে আমি গেছি অবন্তী [উজ্জয়িনী] পর্যন্ত। আরো দক্ষিণে যাওয়া হয়নি।"

—"গোদাবরী দক্ষিণের গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণা-কাবেরীও মাহাত্ম্যখ্যাত

নদী। ভারত ছেড়ে চলে আসবার পর, বড় নদী বলতে আমি দেখেছি কেবল তিগ্রা ও ইফ্‌রাত। আপনাদের বক্ষুও বেশ বড় নদী, কিন্তু ভারতের প্রধান নদীগুলির সঙ্গে এর এক জায়গায় প্রভেদ আছে।"

—"কি বলো তো ?"

—"গঙ্গা-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরীর জল একমাত্র বর্ষা কালেই এ-রকম ঘোলাটে হয়ে থাকে। গ্রীষ্মে বা শীতে দেখতে পাবেন জল একেবারে স্বচ্ছ, নীলাভ। ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধি কুরু॥"

কোয়াত্ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—"কি ভাষা এটা ? এর অর্থই বা কি ?"

—"এটি একটি সংস্কৃত শ্লোক, কোয়াত্। সংস্কৃত ভারতের শিক্ষিত-জনের ভাষা। শ্লোকটিতে অনেকগুলি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী আমাদের বিশাল ও পবিত্র নদীগুলির নাম। অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলি বিশাল আকার ধারণ করে। অধিকাংশ নদীই নাব্য, তাই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম জলপথ।"

বক্ষু নদীর দুই কিনারেই বড় বড় অট্টালিকা আছে। রীতিমতো নগর স্থাপনের কাজ চলছে এখনো। নদীর ওপারে কিছু দূরে দেখা যায় উদ্যান-শোভিত সুন্দর রাজপ্রাসাদ। নদী পার হতেই খবর পাওয়া গেল যে, মহারাণী, (কোয়াতের দিদি) কনিষ্ঠকে আগাম অভ্যর্থনা জানাতে মাত্র দু-দিন আগেই পেঁাছেছেন রাজপ্রাসাদে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ সতেরো বছরের অদর্শনের ফলে এবং কোয়াতের ইদানীংকালের ভাগ্যবিপর্যয়ের সংবাদ শুনে মহারাণী খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। কোয়াত্‌কে কাছে পাবার জন্য তিনি এমনই উৎসুক হয়েছিলেন যে রাজধানী থেকে ছ-দিন দূরত্বের পথ অতিক্রম করে তিনি নিজেই চলে এসেছেন বক্ষু তীরবর্তী এই রাজপ্রাসাদে। মার্ভ নগর থেকে এক হাজার সৈনিক ও অধিকারী অনুগমন করছিল কোয়াত্ ও যুবরাজ মিহিরকুলের। মহারাণীর আগমন সংবাদ শুনে তারা কয়েক দিনের জন্য বিশ্রামের প্রার্থনা জানালো। রাজধানীতে পেঁাছাবার তাড়া ছিল না কোনো। সৈনিকদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। কোয়াত্ ও মহারাণীর দেখা হলো প্রাসাদে। মহারাণী চোখের জলে যেন ভেসে গেলেন। তাঁর কন্যা কোয়াতের চমৎকার পরিচর্যা করেছে, কোনো প্রকার অসুবিধা হতে দেয়নি জেনে মহারাণী খুবই প্রসন্ন হলেন। কয়েকটি দিন কেটে গেল হাসি-গানে, পুরনো দিনের নানা কাহিনী ও ঘটনাকে স্মৃতিচারণ করে। এই আনন্দঘন পুনর্মিলনের সময়ে সম্বিকার অনুপস্থিতি দু-জনের মনেই ব্যথার সঞ্চার করছিল বারবার। হূন রাজ্যে কোয়াত্ পেঁাছাবার পর থেকে এখন চলছে তৃতীয় সপ্তাহ। এখন পর্যন্ত একবারও এ-কথা ভাববার অবকাশ কোয়াত্ পায়নি যে, সে নিজের রাজত্বে নেই। তার মনে হয়েছে সে

যেন এখনো ইরানের শাহেনশাহ, রাজধানী তস্পোন ছেড়ে সে বেরিয়েছে এক রাজকীয় সফরে। অবশ্যই তাকে সবকিছু ভুলিয়ে রেখেছে মিহিরকুল, ভাগিনেয়ী এবং মহারাণীর একান্ত প্রচেষ্টা ও মধুর অতিথিসেবা।

পঞ্চম দিনে বক্ষু নদীর নিম্নগামী ধারাকে অনুসরণ করে আবার শুরু হলো মহারাজা তোরমানের রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা। এবার দলে সংযুক্ত হয়েছেন মহারাণী এবং তাঁর দু-হাজার দেহরক্ষী সৈনিক, পরিচারক-পরিচারিকার দল। এখানেও মরুভূমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, তবে নিঃসীম বালুকারাশি আর নেই। বক্ষু নদীর কিনারায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় জনপদ। শোনা গেল আগে কিছুই ছিল না এ-সব স্থানে। মহারাজা তোরমানের রাজত্বকালেই এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। মিত্রবর্মা যদিও ভারতের বাইরে অনেক দেশে গেছে, এই অঞ্চলটিতে আগে সে কখনও আসেনি। তাই নতুন দেশ দেখার আনন্দে ও উত্তেজনায় সে বিশেষ কথা বলছে না কারো সঙ্গে।

এখনো বরফ পড়া শুরু হয়নি, কিন্তু শীতের কামড় অত্যন্ত প্রখর। হাওয়া বইছে জোরে, ছুরির ফলার মতো বিঁধছে শরীরে। রাজকীয় অশ্বারোহীদের দেহ ঢাকা পড়েছে উত্তর দেশের ক্যায়েস্-আম্নীর [কাশ্মীর] অঞ্চলে তৈরি-করা দামী চামড়ার আজানুলম্বিত পোশাকে। চামড়ার উপরিভাগের পশম যেমন মাখনের মতো নরম ও মসৃণ, তেমনি রেশমের মতো উজ্জ্বল। দুধ-সাদা পোশাক পরে আছেন মহারাণী ও তাঁর কন্যা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অনিন্দ্যসুন্দরী, সাদা পশমের আচ্ছাদনে তাদের মনে হচ্ছে যেন দেবীমূর্তি।

বক্ষু নদীর তীরে বিভিন্ন জনপদে স্থাপিত বৌদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘারাম দেখে মিত্রবর্মা যুগপৎ অবাক ও আনন্দিত হলো। পথ চলতে চলতে বহুবার সে আশ্রয় নিয়েছে ভারতের বিভিন্ন সঙ্ঘারামে। সেখানে সে দেখেছে দেশী-বিদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। সঙ্ঘারামগুলি বিদ্যা ও কলার পীঠস্থানস্বরূপ, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সমাগত সাহসী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মিলনক্ষেত্র। তাই প্রথম সঙ্ঘারামটিতে সে গেল আলাপ-পরিচয় করতে। সেখানে তার সাক্ষাৎ হলো এক বয়স্ক ভারতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে। ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু খবর দিতে পারলো না ভিক্ষুটি, কারণ সে যখন দেশ ছেড়ে চলে আসে তখনও মিত্রবর্মার জন্ম হয়নি। তবে সংস্কৃত ভাষা সে ভোলেনি এখনো, তাই অনেকক্ষণ তার সঙ্গে নানা আলোচনায় সময় কাটালো মিত্রবর্মা। বিদেশে বহুদিন বসবাস করলে তবেই মানুষ বুঝতে পারে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার মহিমা।

পথে প্রথম বড় শহর পড়লো বাবকন্দ। এটি মূলত বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর। এ-শহরেও দু-তিনটি বৌদ্ধ-বিহার আছে। পরবর্তী নগরটির নাম বুখারা [বুখারা = 'বিহার' শব্দটির সোগ্দী রূপ]। এই নগরে স্থাপিত [২৫৭ খৃঃ] বিশাল বৌদ্ধ বিহারটির নাম অনুসারেই জায়গাটি 'বুখারা' নামে পরিচিত

হয়েছে। মিত্রবর্মা বিহারটিতে অন্ততপক্ষে দশ হাজার ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর সমাবেশ হয়েছে বলে মনে করেছিল। পরে জানা গেল যে, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা সাত হাজার, তার মধ্যে ইরানী-সোগ্দী-ভারতীয়-চীনা-মঙ্গোল ইত্যাদি অনেক জাতির মানুষই আছে। মিত্রবর্মা শুনেছিল কেদারীয় হূনেরা বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী। মহারাজা তোরমান সম্বন্ধেও সে শুনে এসেছে যে, সে না কি অসংখ্য বৌদ্ধদের হত্যা করেছে। অথচ, বিহারের বয়স্ক ভিক্ষুরা জানালো যে তাদের ধর্মাচরণে মহারাজা তোরমান কখনও কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। উপরন্তু, রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রায় জনা-পাঁচেক সদস্যই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ইতিহাসকার অসৎ হলে এমনই বিকৃত তথ্য প্রকাশ পেয়ে থাকে—মিত্রবর্মা মনে মনে ভাবলো। যুবরাজ মিহিরকুলও কথাপ্রসঙ্গে মিত্রবর্মাকে একবার বলেছিল—"ব্যক্তিগতভাবে দেশের রাজা যে-ধর্মেরই অনুগামী হোন না কেন, সুশৃংখলভাবে প্রজাপালনের জন্য সবসময়েই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত!" মিহিরকুলকে যতখানি চিনেছে সে, মিত্রবর্মার মনে হয় না যে যুবরাজ মনে এক ভাবেন, আর মুখে বলেন অন্য কিছু। অনেক বছর যাবত পথে পথেই বাস করেছে সে, অনেক মানুষকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগও হয়েছে তার, মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তার বিচারে সচরাচর ভুল হয় না। মিত্রবর্মার সন্দেহ হয় যে, হূনদের বর্বরতা নিয়ে যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলি সম্ভবত ষোলো আনা সত্য নয়। তস্পোন নগরে এবং অন্যান্য স্থানে সে হূনদের দেখেছে। তাদের গায়ের রঙ ও চেহারার সঙ্গে কেদারীয় হূনদের কোনো মিল নেই বললেই চলে। সেই সব হূনদের গোঁফ-দাড়ি থাকে না তেমন, ভুরু ও চোখ কিছুটা তেরচা হয়ে উপরের দিকে ওঠা থাকে, হনুর হাড় উঁচু হয়, নাক দীর্ঘ হয় না। তাহলে কেদারীয়দের হূন বলা হয় কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলো স্বয়ং মিহিরকুল—"আমরা হূন নই, মিত্র। প্রকৃত পক্ষে আমরাও পার্থিয়ান ও শক জাতির উত্তরপুরুষ। যদিও আমরা ছিলাম যাযাবর শ্রেণীভুক্ত, পশুপালন ছিল আমাদের জীবিকা, উত্তর দিকের দেশ-গুলিতেই আমাদের আদি বসবাস। কালক্রমে হূনরা উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করলো। আর্স্তি, শক, পার্থিয়ান গোষ্ঠী প্রতিরোধ করেছিল। হেরে গিয়ে তারা দক্ষিণের দিকে পালিয়ে যায়। কেদারীয় গোষ্ঠী ছিল ছোট, তারা হূনদের আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং আগের মতোই যাযাবর জীবন যাপন করতে থাকে। পরবর্তীকালে হূন বংশীয় অওয়ার সম্প্রদায়ের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের কেদারীয় গোষ্ঠী এই অঞ্চলে চলে আসে। এখানে তখন কুষাণ বংশীয় সামন্ত রাজাদের শাসন চলছিল। বেশীদিন আগের কথা নয়, মেরেকেটে পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর হবে। সে যাই হোক, কুষাণ বংশ তখন অথর্ব হয়ে পড়েছে। তাদের না ছিল কোনো রণকুশলতা আর না কোনো শাসন ক্ষমতা।

আমাদের সঙ্গে লড়াই হলো কুষাণদের, পরাজিত হয়ে তারা পালিয়ে গেল ভারতে, আমরাও তাদের ধাওয়া করতে করতে ভারতে গেলাম। শুরু হলো কেদারীয়দের রাজ্য বিস্তার। এ-সব ঘটেছিল আমার প্রপিতামহের সময়ে, কিছুটা বা পিতামহের সময়েও। আমরা হূন রাজ্য থেকে এসেছিলাম বলে আমাদেরও সকলে হূন বলতে লাগলো। কেদারীয় জাতি যুদ্ধে নিপুণ হলেও হূনদের মতো তারা নৃশংস নয়।"

মিত্রবর্মা হেসে বললো—"অথচ তাদের নাম অহেতুক যুক্ত হয়ে আছে কেদারীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে।

—"ইতিহাস হয়ত এই অকরুণ সত্যটিকে মেনে নেবে একদিন। সমকালীন ইতিহাস রচনা খুবই কঠিন কাজ। দর্পণে নিজের মুখ দেখতে হলে একটু পিছিয়ে যেতেই হয়, একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই!"

—"হ্যাঁ, যুবরাজ। ঠিকই বলেছেন আপনি। আচ্ছা, তাহলে সেই হূনরা এখন কোথায়?"

—"তারা আছে, মিত্র। যেখানে আমাদের আদি নিবাস, সেই খাজার সমুদ্র [ক্যাস্পিয়ন] থেকে সাঁঝ সাগর [ব্ল্যাক সী] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আবার নীল-দুগ্রাই মহানদীর [ব্লু ড্যানুব] উধর্বগামী ধারাকে অনুসরণ করে ক্রমশ তারা ছড়িয়ে পড়েছে উপরের দিকে। বর্তমানে তারা খাজার, অওয়ার, বুলগার ইত্যাদি নামে পরিচিত।"

—"আপনাদের দেশের একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগছে খুব। এ-দেশের মানুষ ধার্মিক পক্ষপাতমুক্ত। ইরানে আজ দেরেস্তদীনের অনুগামীদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়। শুধু তাই নয়, দেরেস্তদীনের নাম উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক। এ-দেশের মানুষ অধার্মিক নয়, আবার ধার্মিক অসহিষ্ণুতাও তাদের মধ্যে নেই।"

—"অশেষ ধন্যবাদ, মিত্র। বিদেশী হয়েও তুমি আমাদের এই অশিক্ষিত সৈনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌গুণের সন্ধান পেয়েছ। তুমি কি ইতিহাসকার, মিত্র?"

—"আমি মানুষ, আমি মানবতাবাদী, যুবরাজ।"

সপ্তম দিনে যাত্রীরা হূন রাজধানী থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত রাজোদ্যানে পেঁছালো। মহারাজা তোরমান ইরানের ভূতপূর্ব শাহেনশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাজোদ্যানে উপস্থিত ছিল। সে তার বিশাল বক্ষের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো কোয়াত্‌কে। তার উন্নত ললাট, ধবধবে শাদা দাড়ি এবং স্নিগ্ধ নীলাভ চোখ দেখে মিত্রবর্মা নিশ্চিত হলো যে, দেশ-বিদেশের মানুষ মিথ্যাই তোরমানের নামে নৃশংসতার অপবাদ দিয়ে থাকে।

কোয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল এক ভব্য প্রাসাদ আর তার আদেশ পালনের জন্য অসংখ্য দাস-দাসী। প্রাসাদটি রাজ-অন্তঃপুর থেকে বেশী দূরে নয়। মহারাজা তোরমান অধিকাংশ সময়েই থাকেন নগরের উপকণ্ঠে এক বিস্তৃত ময়দানের মধ্যে নির্মিত শিবিরে। রাজকীয় শিবিরের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে এক বিশাল শিবির-নগরী। ময়দানটি প্রকৃতপক্ষে মরুভূমিরই অংশ বিশেষ। মিত্রবর্মা ঘুরে ঘুরে দেখেছে সব কিছু। কিন্তু বিশাল রাজধানী নগর এবং অগণিত প্রাসাদ থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে এই শিবির-নগরীর অস্তিত্বের ব্যাপারটা মাঝেমাঝেই তাকে ভাবিয়ে তোলে। রাজধানী-নগর খুবই উন্নত মানের সন্দেহ নেই। বিশেষ করে জলাভাব দূর করবার যে সকল ব্যবস্থাদি নগরে করা হয়েছে তা অত্যাধুনিক। নগরটি যদিও মরুভূমিসংলগ্ন, তবু পথের দু-ধারে আছে সুউচ্চ বৃক্ষের সারি, মাঝেমাঝেই বিস্তীর্ণ উদ্যান, সুদৃশ্য সরোবর। নগরটির বয়স মাত্র পঞ্চাশ বছর। শোনা যায়, তোরমানের পিতা নগর-নির্মাণের জন্য ভারত থেকে অনেক বাস্তুকারদের এখানে এনেছিলেন। তাই এখানকার স্থাপত্যরীতিতে মিত্রবর্মা ভারতের নানা প্রান্তের প্রভাব লক্ষ্য করলো।

নগরের চার প্রান্তে সারি সারি ফসলের ক্ষেত, তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্বচ্ছ জলের নহর [কাটা খাল]। তারপর আবার উদ্যান, ফল-বাগিচা—শীতের শুরুতেই সেগুলিকে ভারমুক্ত করা হয়েছে। ফল-বাগিচা পার হলেই আদিগন্ত বালুকারাশি। মহারাজা তোরমানের শিবির-বসতি সেই বালুকারাশির উপর নগরের উত্তর ও পশ্চিম সীমানা জুড়ে বিস্তৃত। শিবির-নগরীর এলাকা রাজধানী নগরের থেকে আয়তনে কম নয়। মহারাজা এবং সামন্তদের তাঁবুগুলি এক-একটি মহলের মতো সুসজ্জিত। যে তাঁবুটিতে রাজ-দরবার বসে সেটি কয়েক হাজার বৃক্ষকাণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড় করানো এমনই এক বিশাল চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত যে, সেখানে পাঁচ হাজার মানুষ অনায়াসে বসতে পারে। দরবারের সাজসজ্জা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তোরমান কুষাণ-ইরানী-ভারতীয় বিভিন্ন জাতির শিল্পীর সহায়তা গ্রহণ করেছে। মহারাজা যে বিদেশ থেকে শুধু লুটের সম্পত্তি নিয়ে আসে এমন নয়। বিদেশের শিল্পী-কবি-বিদ্বান ও সুন্দরী নারীদেরও সে দেশে নিয়ে আসে, কারণ তাতে করে কেদারীয় হূনদের রুচি এবং রূপ দুইই উন্নত হবে। অথচ এখনো সে পুরানো তাঁবু-জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করে, এবং প্রাচীনপন্থী কেদারীয়দের কাছে গৃহবাসী মাত্রেই ভীরু, নির্জীব ও বণিকদের পদলেহী ছাড়া অন্য কিছু নয়। তোরমানের প্রাসাদগুলি বৈভবে ঐশ্বর্যে সাসানী রাজবংশের বা ভারতীয় গুপ্ত বংশের প্রাসাদগুলির থেকে কোনো অংশে কম নয়, সে বা তার সামন্তরা যে নিজের

নিজের প্রাসাদে একেবারেই থাকে না, তাও নয়। তবু তাবু-জীবনের প্রীতি তাদের মোহ গত পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালের মধ্যেও কেটে যায়নি।

তাবু-নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে কেদারীয় সেনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পঁচিশ হাজার সৈন্য ও সেনাধিকারী। নগরীটি অব্যবস্থিত নয়। পথ-ঘাট, জলের ব্যবস্থা, দোকান-পাট, পণ্য-বীথি সবই আছে এখানে। এ-ধরনের বীথিও আছে যেখানে বিদেশ থেকে আনীত দাস-দাসী বিক্রয় করা হয়; কোথাও বা উঁচুজাতের ঘোড়া।

কেদারীয় হূনদের জীবনে অশ্বের গুরুত্ব অসীম। তারা সব্জি খায় না বললেই চলে, কারণ তাদের দেশে সব্জির ফলন কম। জনসাধারণের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য অশ্ব-মাংস, তবে কোনো মাংসেই অরুচি নেই তাদের। অশ্ব তাদের প্রধান বাহন, আবার ঘোটকী-দুগ্ধ তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ পানীয়। ওই দুধ থেকে কুমিশ [এক জাতীয় মদ] তৈরী হয়, এবং স্বয়ং তোরমান পর্যন্ত মাঝেমাঝে অশ্ব-মাংস এবং কুমিশ না পেলে খাদ্যে পানীয়ে অরুচির অভিযোগ করে থাকে। অথচ সে এবং তার সামন্তরা দেশ বিদেশের সুস্বাদু ভোজ্যে অভ্যস্ত। তোরমানের রাজ্যে অশ্ব-মাংস ছাড়া ভেড়া-খাসি-বরাহ ইত্যাদিরও প্রচলন আছে। কুষাণ-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সূর্যদেবকে নিবেদনের উদ্দেশ্য ছাড়া গো-হত্যা সাধারণত করা হয় না। তাই গো-মাংস আজকাল সহজলভ্য নয়।

কোয়াত্ পদচ্যুত শাহেনশাহ হলেও তার পক্ষে নগরের পথে যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব নয়। ইরানের শাসকগোষ্ঠী কোয়াত্ নামক কাঁটাকে নির্মূল করবার প্রাণপণ প্রয়াস করবে, এ-কথা সকলেই জানে। এ-নগরের মধ্যেই যে কোনো গুপ্তঘাতক নেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু মিত্রবর্মার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে তার পরিচয় হয়েছে যে ভারতীয় রাজ-কুমারের সঙ্গে, সে মহারাজা তোরমানের এক প্রিয় সভাসদ। মিত্রবর্মা ভারতীয় রাজকুমারের সঙ্গে তাবু-নগরীতে ভ্রমণ করতে করতে এগিয়ে গেল দাসদাসী বিক্রয় বীথির দিকে। কাছাকাছি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বহু দালাল তাদের পিছু নিল। কেউ বলে ভারতীয় সুন্দরী দাসীর গুণপনার কথা, আবার কেউ বলে চোদ্দ বছরের তুখার [তিব্বতী] দাসীর কামকলায় দক্ষতার কথা। অনেকে করলো চীনদেশীয় দাসীর বন্ধনপটুত্বের গুণকীর্তন, অনেকে দিলো অনন্তযৌবনা অওয়ার দাসীর শারীরিক গঠনের সরস বিবরণ। কিন্তু তারা তো দাসী কিনতে আসেনি। তারা দেখতে এসেছিল জীবন্ত লাশগুলিকে, যাদের জীবনমৃত্যু নির্ভর করে ক্রেতাদের মর্জির উপর, যারা মানবজন্ম পেয়েও এক অমানবিক প্রথার শিকার হয়ে পড়েছে। মিত্রবর্মা দাস-দাসীদের দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলো অন্তরজাগর এদের সম্বন্ধে কি বলতেন। এরাও তো মানুষ। এদেরও অবশ্যই আছে প্রিয় স্বদেশভূমি, প্রিয় আত্মীয়-স্বজন। এরা কেউ স্বেচ্ছায় আসেনি এখানে। প্রত্যেকেরই বর্তমান স্থিতির পিছনে কোনো

না কোনো বঞ্চনার ইতিহাস নিশ্চয় আছে। আজ তাদের ভেড়া-ছাগলের মতো খোলা বাজারে বিক্রী করা হচ্ছে। দাস ব্যবসায়ীর আদেশে তাদের হাসতে হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতাদের দিকে তাকিয়ে, সে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, অমলিন নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু কেন এই বৈষম্য? অনেক ভেবেও মিত্রবর্মা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারে না। তাই আবার তার মনে পড়ে যায় অন্তরজাগরের কথা। তিনি পারতেন, অবশ্যই তিনি এর সঠিক জবাব দিতে পারতেন।

আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল মহারাজার শিবিরে। ভোজসভাটি আয়োজিত হয়েছিল কোয়াতের সম্মানার্থে। কোয়াতের সঙ্গে উপস্থিত ছিল তার বর্তমানকালের ছায়াসঙ্গিনী—সুন্দরী ভাগিনেয়ী। মিত্রবর্মা এবং ভারতীয় সভাসদটি বসেছিল অনেকটা তফাতে। মিত্রবর্মা লক্ষ্য করছিল যে, মহারাজ নিজে বেশী খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছে না, কিন্তু প্রত্যেকটি কেদারীয় সর্দার, সামন্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির দূতদের খালি পানপাত্র তার চোখের ইশারায় পলকে ভরে দেওয়া হচ্ছে। মিত্রবর্মা ভারতীয় সভাসদটিকে বললো—"বন্ধু, একটু আগেই আমরা দেখে এলাম দাস-দাসীদের পণ্য বীথি, আর এখানে দেখছি রাজার ভোজসভায় খাদ্য ও পানীয়ের যথেচ্ছ অপচয়! মানুষে মানুষে কি দুস্তর প্রভেদ, তাই নয়?"

—"আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করো, মিত্র। মহারাজা তার সামন্ত ও সর্দারদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে। বরং বলা যায়, বড় ভাইয়ের মতো। কিন্তু এই আচরণ সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে করবে না!"

—"কেন বলো তো?"

—"এরাই মহারাজার বাহুবল! তাই বিদেশে তোরমান রাজোচিত আচরণ করলেও এখানে সে একটি বৃহৎ পরিবারের অভিভাবকমাত্র! মহারাজা একটি যাযাবর গোষ্ঠীর প্রধান, যে গোষ্ঠীর মন থেকে যাযাবর-বৃত্তির স্মৃতি মুছে যায়নি এখনো। রাজা তাঁবুতে বসবাস করে এইসব সামন্ত ও সর্দারদের মন রাখতে। সে যদি হঠাৎ তাঁবু-জীবন ছেড়ে প্রাসাদে বসবাস শুরু করে, তাহলে সর্দার-সামন্তরা তাকে আর আগের মতো সম্মান দেবে না!"

—"জানো বন্ধু, তুমি আমার একটি সমস্যা দূর করে দিলে নিজের অজানিতে!"

—"অজানিতে নয়, মিত্র! চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই এই তাঁবু-জীবন সম্বন্ধে ভাববে। তোমার চোখে-মুখে আমি সেই ভাবনার ছাপ প্রথম দিনই দেখেছিলাম!"

—"ধন্যবাদ, বন্ধু! আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও! তুমি তো রাজার বিশ্বস্ত সভাসদ, তাহলে তোমার প্রতি রাজার আচরণ কেমন?"

—"খুবই ভালো। আমি দাস নই, কিন্তু সিংহাসন থেকে আমি অনেক নীচে।"

—"মিহিরকুল কিন্তু বলে তারা গণতান্ত্রিক শাসনে বিশ্বাসী।"

—কথাটা অসত্য, কারণ সামন্ত বা সর্দারদের সঙ্গে স্বার্থপ্রণোদিত সদ্ব্যবহারই গণতন্ত্রের একমাত্র মাপকাঠি নয়।"

—"আমাদের ভাষা এখানে কি কেউ বুঝতে পারছে?"

—"কেদারীয়রা যোদ্ধা এবং প্রশাসক হিসাবে খুবই উন্নত, কিন্তু ভাষা সম্পর্কে তারা খুবই অজ্ঞ। বিশেষত, সংস্কৃত ভাষার দুরূহ ব্যাকরণ এদের পক্ষে কোনোদিনও ভেদ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না। তবু চলো, বাইরে যাই! দ্যাখো, তোমার বন্ধু শাহেনশাহ ঠিকমতো উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সুন্দরী রাজকন্যা তাকে প্রায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সামন্ত-সর্দার-সেনাপতি সকলেই বুঁদ হয়ে আছে মদিরার নেশায়। একমাত্র ঠিকঠাক আছে তোরমান। কিন্তু তার দৃষ্টি আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের উপর পরবে না। তাই বলছি মিত্র, চলো খোলা হাওয়ায় যাই!"

পথে কয়েকটি মাতাল সেনাপতি ছাড়া কারো সামনা-সামনি হতে হলো না। তারা সকলেই মিত্রবর্মাকে চেনে এবং সমীহ করে ভারতীয় সভাসদটিকে। প্রশ্ন করে জানতে পারলো মিত্রবর্মা, সভাসদটির নাম বীরভদ্র।

—"ভাই বীরভদ্র, তুমি গণতন্ত্রের কথা বলছিলে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি সে কেবল কেতাবি জ্ঞান। লিচ্ছবি গণতন্ত্রের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ......"

—"যৌধেয় গণতন্ত্রের কথা শোননি?"

—"নামের সঙ্গে পরিচিত আছি, তার বেশী কিছু জানি না।"

—"মাত্র সত্তর বছর আগেও ভারতের যৌধেয় গণতন্ত্রের ধ্বজা শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী হরিতাবলী [হরিয়ানা] প্রদেশে উড্ডীন ছিল। শক রাজারা, এমনকি সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত যৌধেয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারেনি। তুমি তো দক্ষিণ ভারতের পল্লব কুমার, তাই না শুনে থাকলে ·· ···"

—"আমি শুনতে চাই!"

—"ঠিক আছে, অবশ্যই শোনাব! আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে, আমার নাম বীরভদ্র যৌধেয়। গুপ্তরা আমার মাতুল বংশ। তোরমান যৌধেয়দের অপছন্দ করে, কিন্তু অধিকতর যশস্বী গুপ্তবংশের গুণমুগ্ধ সে। তাই আমি শেষ-নাম বদলে নিজেকে গুপ্ত-বংশীয় রাজকুমার হিসাবেই এখানে পরিচয় দিয়েছি।"

—"যৌধেয় গণরাজ্য তাহলে আর ·· ?"

—"না, নেই! সে আজ তোরমানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।"

—"তাহলে বীরভদ্র, তুমি নিশ্চয় কোনো স্বপ্ন দেখেছ?"

—"স্বপ্ন ?"

—"হ্যাঁ, স্বপ্ন মানে কোনো মহান্ কাজের মানসিক পূর্ব-কল্পনা। আমি তো দেখেছি, বীরভদ্র! এক মহান্ স্বপ্নদ্রষ্টা আমাকে সেই স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন যদি কোনোদিন আকার পায়, তাহলে মর্ত্য-ভূমি পরিণত হবে স্বর্গে! আমাদের কালে না হোক, কোনো এক দূর ভবিষ্যতে!"

—"হ্যাঁ, মিত্র, আমিও দেখেছি স্বপ্ন! সে স্বপ্ন যৌধেয়-ভূমির স্বাধীনতার, গণরাজ্যের পুনস্থাপনার!"

—"আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বীরভদ্র! তোমার আমার দু-জনেরই স্বপ্ন স্বাধীনতার! যদি আমাকে কখনো প্রয়োজন হয়, ডাক দিতে ভুলো না কিন্তু!"

—"কখনোই ভুলবো না, মিত্র! কোনোদিন না!"

সূর্যাস্ত হয়ে গেলে দুই বন্ধু যে যার ডেরায় ফিরে গেল! মিত্রবর্মা মনে মনে প্রার্থনা করলো—"হে মজ্দক! হে অন্তরজাগর! বীরভদ্র যেন সফল হয়! আমরা যেন সফল হই! আমাদের পথ পৃথক, কিন্তু লক্ষ্য এক! এভাবেই সবাই মিলে আমরা পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবো!"

এবারে শীতটা পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। নহরগুলির জল কমে গেছে অনেক। মিত্রবর্মা বন্ধু কোয়াতের অনুমতি নিয়ে নগরের বাইরের এলাকাতে এক উদ্যান ভবনে বাস করছে। দু-তিনদিন অন্তর অবশ্যই তাকে কোয়াতের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়। কোয়াত্ তার প্রাসাদে বন্ধুহীন নয়, কারণ ইতিমধ্যে ইরান থেকে সিয়াবকুশ এসে গেছে। কিভাবে, কত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাকে, সে এক আলাদা কাহিনী। বীরভদ্র যৌধেয়র নিবাস মিত্রবর্মার উদ্যান ভবনের কাছাকাছিই বলা যায়। পথে-ঘাটে-প্রান্তরে এখন প্রায়ই হিমের সাদা চাদর পড়ে থাকে। বিকেলের পর পথে বার হওয়া মানেই অসুখকে সেধে ডেকে আনা। তাই দিনের অনেকটা সময় বীরভদ্র ও মিত্রবর্মা একসঙ্গেই থাকে। কখনো মিত্রবর্মা তাকে শোনায় অন্তরজাগরের মধুর স্বপ্নের রূপরেখা, কখনো বা গৌতম বুদ্ধের উপদেশ ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা চলে তাদের মধ্যে। মিত্রবর্মা নিশ্চিতরূপে একজন স্বপ্নদর্শী, এবং বীরভদ্র যৌধেয় তার সমস্ত অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে অসমর্থ হলেও সে যে স্বপ্নদর্শিতায় পিছনে পড়ে নেই তা বোঝা যায়। মিত্রবর্মা ইচ্ছা করেই মহারাজা তোরমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অধিক বাড়ায়নি। মহারাজা তবু মাঝেমাঝেই তার খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে, কারণ কোয়াতের কাছে সে শুনেছিল যে, এই ভারতীয় তরুণটি অসামান্য বিদ্বান, বিশ্বস্ত এবং অশেষ গুণসম্পন্ন। উপরন্তু, সে পল্লব বংশীয় রাজকুমার। পল্লব বংশ শক জাতিরই একটি শাখা, এবং সেই সূত্রে তারা কেদারীয় হূনদের আত্মীয়। দু-একবার তোরমান নিজে থেকেই কথা বলেছে মিত্রবর্মার সঙ্গে, এবং অনুভব করেছে তার বুদ্ধির প্রাখর্য। তোরমান নিজের বাছাই করা দাসীদের মধ্য থেকে একজন বিদেশিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে মিত্রবর্মার উদ্যান ভবনে।

দাসীটি কোন দেশ থেকে এসেছে তা বুঝতে পারেনি মিত্রবর্মা এবং বীরভদ্র। মেয়েটির নাম শকলা [স্কলাব্], তাই মনে হতে পারে সে শক। কিন্তু তা নয়। প্রথম দর্শনেই মিত্রবর্মা চকিত ও প্রভাবিত হয়েছিল। মেয়েটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, বর্তুল নিতম্ব ও কলসসদৃশ বক্ষযুগল ছাড়া মেদের নামমাত্র নেই শরীরে, সুউচ্চ ঋজু চেহারা। তার পিঠময় ছড়িয়ে আছে দুগ্ধ-শুভ্র কেশরাশি, ফলে পিছন থেকে সহসা কোনো বৃদ্ধা নারী বলে ভ্রম হয়। অবশ্যই অনুভবী ব্যক্তিরা বৃদ্ধা ও তরুণীর কেশরাশির মধ্যে উজ্জ্বলতার পার্থক্য বুঝতে পারে। তার চোখ দুটি নীল শালুকের মতো এবং দেহের বর্ণ রক্তিমাভ শঙ্খসদৃশ। অনাবশ্যক বাক্যালাপে সে অভ্যস্ত নয়, কারণ সে অত্যন্ত লাজুক। মিত্রবর্মা জানে মেয়েটি যুদ্ধ ও দাসত্বের আরো একটি শিকার। তাই অন্যান্য পরিচারক-পরিচারিকাদের মতো এর সঙ্গেও সে খুবই

সম্ভ্রম আচরণ করতে লাগলো। মিত্রবর্মা দাসপ্রথার কট্টর বিরোধী, কিন্তু কেদারীয় রাজ্যে বসবাস করে সে-কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। তাই সে আচরণের মাধ্যমে তার মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে। অন্যান্য দাস-দাসী তার আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত তুষ্ঠ ছিল। ধীরে ধীরে শ্বেত-কেশীর সঙ্কোচও দূর হতে লাগলো। এখন সে প্রশ্ন করলে জবাব অবশ্যই দেয়, কিন্তু নিজে থেকে কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে না।

ইদানীং পুরোদমে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। মিত্রবর্মা অধিকাংশ সময় কাটায় গৃহে, এখন তার অখন্ড অবসর। একদিন অঝোর ধারায় ঝরে চলেছে তুষার, আর শ্বেতকেশী একটি স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে দেখছে সেই দৃশ্য। কি কাজে যেন সে ঘরে ঢুকে তাকে অমন ভাবমগ্ন দেখে নীরবেই চলে যাচ্ছিল মিত্রবর্মা। তার পায়ের শব্দে মুখ ফেরালো শ্বেতকেশী, এবং তার চোখে এক অস্বাভাবিক দ্যুতি দেখে থমকে দাঁড়ালো মিত্রবর্মা। সে যখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শ্বেতকেশীর কাছে, তখন সে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বাতায়নের বাইরে তুষারপাতের দিকে।

—"শ্বেতা, ভালো লাগে বুঝি তুষারপাত দেখতে?"

—"হ্যাঁ, প্রভু, বড় ভালো লাগে। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়। খুব বরফ পড়ে আমাদের দেশে। জমাট বেঁধে যায় যখন, যুবক-যুবতীরা কাঠের পাদত্রাণ পরে হাতে লাঠি নিয়ে বরফের উপরে পিছলে পিছলে দৌড়ায়, খেলা করে, পড়েও যায় মাঝেমাঝে, আবার উঠে দাঁড়ায়। মাথার টুপি সাদা হয়ে যায়।"

—"তুমিও তো খেলতে তাদের সঙ্গে, তাই নয়, শ্বেতা?"

—"হ্যাঁ, প্রভু, সে-কথাই মনে পড়ছিল।"

—"মনে হচ্ছিল না, আবার যদি ফিরে পেতাম সেই স্বপ্নময় মধুর সময়?"

—"হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল।"

—"অথচ এখানে এক অচেনা দেশে অপরিচিত কিছু কঠোর মানুষদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আজ তুমি আটক হয়ে আছ। খুব কষ্ট হয় তোমার, শ্বেতা?"

থরথর করে কাঁপতে লাগলো শ্বেতকেশীর ঠোঁট। সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। চোখ থেকে নীরবে গড়িয়ে পড়লো দু-ফোঁটা জল। মিত্রবর্মা অপরাধীর মতো কণ্ঠস্বরে বললো—"কিছু মনে করো না, শ্বেতা! অজানিতে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।"

—"না, প্রভু! আপনার সমবেদনা-মাখা কথা শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল।"

—"অনেক দূরে সেই দেশ? কত দূরে? কোন দিশায়?"

—"দূরত্বের হিসাব তো জানি না, প্রভু! এখান থেকে পশ্চিম দিশায়। অওয়ার গোষ্ঠী হঠাৎ আক্রমণ করেছিল আমাদের। আমার বাবা ছিলেন

গোষ্ঠীপতি। তাঁর নেতৃত্বে নারী-পুরুষ সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল মোকাবিলা করতে, কিন্তু ওরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। ওরা আমাদের শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সমস্ত যুবতী নারীদের বন্দী করে ওরা নিয়ে গিয়েছিল অওয়ার রাজ্যে। বিশাল সেই রাজ্য, শুনেছি ঘোড়ার পিঠেও এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছাতে পাঁচ-ছ' দিন লেগে যায়। চার বছর অওয়ার মহারাণীর পরিচারিকা ছিলাম। মাত্র দু-বছর আগে ভেট হিসাবে আমাকে কেদারীয় মহারাজার হাতে তুলে দেওয়া হয়।"

—"অন্তঃপুরের দাসীদের মধ্যে তুমিই কি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলে?"

—"না, প্রভু, আমি ছিলাম কুরূপাদের মধ্যেই একজন। অওয়াররা পছন্দ করে বাদামী রঙের ছোট ছোট চোখ, খর্ব নাসিকা, বৃহৎ হাঁ-মুখ, উঁচু হনুর হাড় ইত্যাদি। অর্থাৎ, ঠিক যা অপছন্দ করে ইরানী এবং কেদারীয়রা। মহারাজা তোরমান আমাকে পছন্দ করবেন সে ওরা জানতো। মহারাজার একটি কন্যা তো অওয়ার যুবরাজের পত্নী। তাই কুরূপাকে সরিয়ে দেওয়াও হলো, আবার শক্তিশালী আত্মীয় খুশীও হলেন।"

—"অওয়ার অন্তঃপুরে তুমি কি এখানকার চেয়ে বেশী সুখী ছিলে?"

—"দাসীর সুখ-দুঃখ বোধ মরে যায়, প্রভু! আমার জন্যে অওয়ার ও কেদারীয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই। কিন্তু আপনার প্রাসাদে আসবার পর থেকে নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে আমিও মানুষ, আমি শুধু ক্রীতদাসী নই। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

কোয়াত্ কেবলমাত্র মহারাণী পীরোজ দুখ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নয়, মিহিরকুলের মতো সেও তার পুত্র, মহারাজ তোরমান মনে মনে ভাবে। কোয়াত্ ইরানের শাহেনশাহ ছিল, এ-কথাটা মনে থাকে না তোরমানের। কোয়াত্ও তার সঙ্গে কখনো পুত্রের ন্যায় আবার কখনো ধৃষ্ট মিত্রের মতো আচরণ করে থাকে। কোয়াত্ এখানে সর্বপ্রকার রাজোচিত সুখভোগ করে। সারা জীবন এভাবেই সে কাটাতে পারে। একবার মুখ ফুটে বললেই তোরমান তাকে বিশাল এক জায়গীর দিয়ে দিতে রাজী আছে। মিহিরকুলেরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু কোয়াত্ কি করে ভুলে যাবে তার সাসানী রক্ত, সাসানী সিংহাসন—যা আইনত তার! আর যদিও বা ভুলে যায়, মনে করিয়ে দেবার জন্য সিয়াবক্শ তো সঙ্গেই রয়েছে সর্বদা। তাই মাঝেমাঝেই কোয়াত্ একান্তে তোরমানের কাছে হৃত সিংহাসন ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে সামরিক সহায়তার আবেদন পেশ করে থাকে।

তোরমানের পক্ষে নানা দিক বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। সাসানী রাজ সিংহাসনে যেই আসীন থাকুক, তার সামরিক শক্তি হ্রাস পায়নি, এটা সে জানে। হঠাৎ বহির্দেশ আক্রমণ করে বসলে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার

সুযোগ নিতে পারে অওয়ার রাজ্য। সিংহাসন আত্মসাৎ করবার ব্যাপারে তারা আত্মীয়তার কথা ভুলে যেতেই অভ্যস্ত। আবার অন্যদিকে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী গুপ্ত বংশও দুর্বল নয়। সব দিক বিচার করে তোরমান বর্তমান সময়কে ইরান আক্রমণের প্রতিকূল মনে করে। তাই সে আশার কথা শোনায় কোয়াত্‌কে, কিন্তু কার্যত করে না কিছুই। কোয়াত্‌কে খুশী রাখতে চায় সে, তাই মহারাণী পীরোজকে সে কোয়াত্‌ ও পীরোজ-দুহিতার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। রাজার শ্যালক হওয়ার থেকে জামাতা হওয়া অনেক বেশী নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করা। কোয়াত্‌ তার ভাগিনেয়ীর রূপমুগ্ধ তো ছিলই, পীরোজেরও পূর্ণ সম্মতি ছিল। এদিকে সিয়াবক্‌শ এবং মিত্রবর্মাও বিবাহ প্রস্তাবকে সমর্থন করলো। তাই কিছুদিনের মধ্যেই কোয়াতের পত্নী তালিকায় সংযোজিত হলো আরো একটি নাম—শাহদুখ্‌ত।

শীত ঋতু সমাপ্ত হলো। মরুভূমির বুকে গলে গেল জমাট বরফ। মরু-তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হোক্‌, পিঙ্গল বালুকারাশির উপর সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখা দিলো। রাজধানীর উদ্যানগুলি সজ্জিত হলো নতুন হরিৎ সাজে। প্রকৃতি এখন পূর্ণ উল্লাসে মত্ত। কোয়াত্‌-সিয়াবক্‌শ-মিত্রবর্মা মাঝেমাঝেই দিন গোনে, কত মাস কেটে গেল প্রতীক্ষায়। ইরান থেকে গুপ্ত খবর আসতে থাকে প্রায়ই। এখনো কোয়াত্‌ মহারাজা তোরমানের কাছে দরবার করে চলেছে। সে জানে তার প্রথম প্রতিপক্ষ হবে গজনস্পদাত্‌। জামাস্প এবং ইরানের সিংহাসন এখন তারই সম্পত্তি, নামে না হোক, কাজে। সেই কোয়াতের অপসারণের জন্য দায়ী, বর্তমানে ইরানের দৃঢ়তম স্তম্ভ সে।

মনে মনে মহারাজা তোরমান অবশ্যই চাইছিল যে, তার পুত্রপ্রতিম জামাতা খসরু সাসানী সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হোক। কিন্তু এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোয়াতের ছেলেমানুষী জেদ এবং কথায় কথায় রাগ করা একেবারেই মনঃপুত ছিল না তার। সে জানতো যে দিন-রাত্রির অনেকটা সময় সে অন্তঃপুরে আমোদ-প্রমোদেই কাটায়। অথচ কোয়াতেরই অন্তরঙ্গ সহচর মিত্রবর্মা এবং সিয়াবক্শ যে, সাসানী সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়সংকল্প, এবং এ বিষয়ে যে তারা নানা পরিকল্পনা করে রেখেছে, এ সংবাদও তোরমানের কাছে গোপন ছিল না। তার মনে হয়েছিল কোয়াতের ব্যবহারিক বুদ্ধি কম তাই সে মাঝে মাঝে মিত্রবর্মার মনের গোপন খবর পেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই ভারতীয় রাজকুমারটি এমনই চরিত্রের যে যদিও বা তার বুক ফাটে, মুখ তার সহজে খোলে না। ওদিকে সিয়াবক্শ রাজকার্যে এমনই দক্ষ যে শুধুমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং সৈন্য পরিচালনার পরিকল্পনার ব্যাপারেই সে নির্ভুল নয়, বহুদূর তম্পোন নগরী এবং ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে কোথায় কি ঘটছে, সে বিষয়েও তার জ্ঞান অসাধারণ। তোরমান তার এই সংবাদ সংগ্রহের সূত্রের রহস্যভেদের অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। তোরমান খুবই সমীহের দৃষ্টিতে দেখে এই তরুণ দুটিকে। কিন্তু কেন যে তারা কোয়াতের মতো আরামপ্রিয় শাহেনশাহর শুভানুধ্যায়ী হয়ে রয়েছে, সে তথ্য প্রকাশিত হয়নি তার কাছে।

জনসাধারণকে ধর্মের দোহাই দিয়ে কোয়াতের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোয়াত্ অপসৃত হবার কিছুদিনের মধ্যেই লোকে চোখের সামনেই ধনী শ্রেষ্ঠী-সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর মানুষের লুটের তাণ্ডব দেখেছে। নির্ধন জনগণের পক্ষে কথা বলবার মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, কোয়াতের অপসারণে মদত দেওয়া মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। তারা মনে মনে কোয়াতের পুনরাগমন এবং বর্তমান শাসকদের পতন কামনা করছিল।

কোনো এক অদৃশ্য সূত্র থেকে সমস্ত খবর নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছিল শিয়াবক্শ-এর কাছে। জামাস্প শাসক হিসাবে খুবই দুর্বল ছিল, দেশের কার্যভার সামলে রেখেছিল উত্তর সীমান্তের গজনস্পদাত্। রোমান সম্রাট বহুদিন থেকেই ইরানকে কব্জায় আনতে চাইছিল। মাঝেমাঝেই রোমান সেনাবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো ইরান রাজ্য। অন্য দিক থেকে ককেশাস অঞ্চলের প্রবল হূন সৈন্যও যখন-তখন ইরান রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করতে লাগলো। ইরানী সৈন্য তাদের লুটপাট থামাতে পারলো না। জনসাধারণ ইতিমধ্যেই সরকারী কর্মচারী-অধিকারী-সৈন্য-বাহিনীকে লোভী এবং অপদার্থ বলে চিহ্নিত করে ফেলেছিল। তাই ছোটখাটো

গণ-বিক্ষোভও শুরু হলো ইরানের বিভিন্ন স্থানে। এইসব অভ্যুত্থানগুলিকে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হলেও সাধারণ মানুষ তখন ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে।

এ-সব খবর তোরমানের কানেও নিয়মিত পেঁাছে দিচ্ছিল কেদারীয় গুপ্তচর বাহিনী। একদিন মিহিরকুলকে তলব করলো তোরমান। যুবরাজকে সে কেদারীয় ও ইরান রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তের ছটি স্থানে পাঁচ হাজার ক'রে সেনা মোতায়েন করবার আদেশ দিলো, যাতে শত্রুপক্ষ বুঝতে না পারে ঠিক কোন সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ শুরু হবে। তারপর হস্তীবাহিনীর প্রধানকে আদেশ দিলো উক্ত স্থানগুলির কাছাকাছি পাঁচশত করে হাতি তৈরী রাখতে। ভারতে রাজ্যবিস্তারের পর থেকেই তোরমান হস্তীবাহিনীকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তুলেছিল, এবং বর্তমানে তার বাহিনীতে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক সুশিক্ষিত হাতি আছে। ভারতীয় সেনাপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তোরমানের হস্তীবাহিনী তার প্রায় সমস্ত শত্রুরই ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যেদিন তোরমান মিহিরকুল ও হস্তীবাহিনীর প্রধানকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেয়, সেদিনই সন্ধ্যায় মহারাজার শিবিরে হাজির হলো কোয়াত্, সিয়াবক্শ ও মিত্রবর্মা। সিয়াবক্শ কোয়াতের প্রতিনিধি ও সেনানায়ক হিসাবে মহারাজাকে ইরানের বর্তমান অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং সীমান্তের বাইরের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করলো। এই সময়েই যে ইরান আক্রমণ করা উচিত, এ-কথা সে বললো বারবার। তোরমান অনুমান করতে চাইছিল সিয়াবক্শ ও মিত্রবর্মার সামরিক বুদ্ধি কতখানি প্রখর। তাই সে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু প্রশ্ন করে চলেছিল।

—"কোয়াত্, এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধটা তোমার বা তোমাদের! যুবরাজ মিহিরকুল তার নিজস্ব দশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রথম লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গ দেবে। তারপর সে ফিরে আসবে। আমার তিরিশ হাজার সৈন্য তুমি যতদিন চাইবে তোমার সঙ্গে থাকবে। আমি প্রয়োজন হলে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আরো সৈন্য পাঠাবো! এতো গেল লোকবলের প্রসঙ্গ। কিন্তু রণকৌশল সম্পর্কে আমার বা মিহিরকুলের কোনো সাহায্য তুমি পাবে না। সেটা তোমাকে বা তোমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে। এখন শুভানুধ্যায়ী হিসাবে এবং আত্মীয় হিসাবে আমি জানতে চাই—কোন পথে তোমরা ইরানের উপর প্রথম হামলা করবে?" কোয়াত্ যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলো, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সিয়াবক্শ-এর দিকে। সিয়াবক্শ এ-প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—"মহারাজ! এ বিষয়ে আমরা আপনার মতামত শিরোধার্য করে নেব ভেবেই এসেছিলাম!"

—"না, সিয়াবক্শ! এভাবে হয় না! উত্তম সেনানায়ক উত্তম যোদ্ধা না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাকে উত্তম মানের যুদ্ধকৌশল জানতেই হবে!

নইলে সে বেশীদিন টিকবে না। সে যাই হোক, এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমাদের ভাবা উচিত ছিল, কারণ প্রথম হামলাতেই যদি সহজে বিজয়ী হওয়া যায়, তাহলে শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে যায়। মিত্রাবর্মা, তুমি কি ভেবেছ কিছু?" মিত্রবর্মা অনেকক্ষণ ধরেই একটি ভূর্জপত্রের উপর আনমনে আঁকিঝুঁকি কাটছিল।

সে হেসে জবাব দিলো—"আগে ভাবিনি, মহারাজ। নতুবা সিরাবকশ-এর কাছ থেকেই আপনি শুনতে পেতেন। মহামান্য কোয়াত্, রণনিপুণ সিরা এবং এই অধমের চিন্তা অভিন্ন। যাই হোক, হ্যাঁ মহারাজ, আমি এক্ষুণি ভেবেছি—আমরা খোরাসানের সীমান্ত দিয়েই ইরানে প্রবেশ করবো।"

—"কিন্তু মিত্রবর্মা, ওটাই তো সব থেকে বিপদসংকুল পথ! ওখানেই তো পাহারা সব থেকে অধিক।"

—"জানি মহারাজ, সব পথেই পাহারা থাকবে। রোমান সীজার [সম্রাট] জুলিয়াসের মতো এলাম-দেখলাম-জয় করলাম বর্তমান যুগে আর সম্ভব নয়। তবে কি না, পাহারা তো শিথিল করে দেওয়া যায়। অবশ্যই আপনার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।"

—"কিন্তু কিভাবে? তুমি কি জানো যে, গজনস্পদাত্ গোপনে ভারতীয় গুপ্ত সম্রাটের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, আবার অওয়ারদেরও খেপিয়ে তুলছে কেদারীয়দের বিরুদ্ধে?"

—"সেটাই তো স্বাভাবিক, মহারাজ। তবে গুপ্ত সাম্রাজ্য আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, কারণ তারা নিজেরাই এখন আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। ভয় অওয়ারদের, কারণ তাদের রাজত্ব বিশাল, এবং আত্মীয় হলেও আপনার শত্রু। কিন্তু তিরিশ হাজার সৈন্য কমে গেছে বলে তারা আপনার রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পাবে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ তারা জানে যে আপনার রাজ্যে সাধারণ নাগরিকও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তিরিশ হাজার সৈন্যের কম-বেশীতে কিছু যায়-আসে না আপনার।"

—"কথা ঘুরিও না, মিত্রবর্মা। পরিষ্কার ভাষায় বলো, কি চাও তুমি?"

—"মহারাজ, বলবার মতো কথা না থাকলে, কথা ঘুরিয়ে বলবার মতো কথাটা মনে মনে ভেবে নেওয়া আমার একটা বদ অভ্যাস। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কি চাই আমি। আপনার জামাতা, আমার প্রিয় বন্ধু, মহামান্য কোয়াত্ যাতে ইরানের সিংহাসনে আবার বসতে পারেন, প্রথম যুদ্ধেই যাতে তিনি গজনস্পদাতের মনোবল ভেঙে দিতে পারেন, সে-জন্য তাঁকে গজনস্পদাতের রাজধানী খোরাসান নগর জিতে নিতে হবে। এবং সে-জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্যবান যুবকের মৃতদেহ।" কোয়াত্ ও সিরা খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকালো মিত্রবর্মার দিকে। তোরমানও কম অবাক হয়নি।

—"কি বললে? মৃতদেহ?"

—"হ্যাঁ, মহারাজ! একটি সবল যুবকের মৃতদেহ, যাতে শত্রুপক্ষ মনে করে যে সে আপনার গুপ্তচর, কিংবা সৈন্য!"

—"এ-সব কি বলছ, মিত্রবর্মা? এর অর্থ কি?"

—"ধরুন এ-ধরনের একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল ইরান-বাহলীক সীমান্তের কাছে। তার কাছে পাওয়া গেল কেদারীয় মহারাজার নামাঙ্কিত পরিচয়-পত্র এবং একটি চিঠি, যাতে লেখা থাকবে অমুক দিন অমুক সময় স্বয়ং মহারাজা তোরমান পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এবং পাঁচ হাজার হস্তীবাহিনী নিয়ে বাহলীক সীমান্ত পার হয়ে ইরানে প্রবেশ করবেন। চিঠিটা পড়ে গজনস্পদাত্ কি করবে, মহারাজ?"

—"তোরমানকে বাধা দেবার জন্য বাহলীক সীমান্তে উপস্থিত হবে।"

—"মহারাজা তোরমানের পোশাকে সজ্জিত কোনো সেনাপতি কুড়ি হাজার সৈন্য এবং এক হাজার গজ নিয়ে বাহলীক সীমান্তে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করবেন না। ইতিমধ্যে খোরাসান দখল করে নেবেন মহামান্য কোয়াত্ এবং যুবরাজ মিহিরকুল।"

তোরমান অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মিত্রবর্মার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো—"ঠিক আছে কোয়াত্, মিত্রবর্মা যা চাইছে তাই হবে! তোমরা প্রাসাদে যাও, বিশ্রাম করো! কাল সকালে আবার আমরা মিলিত হবো!" তোরমানের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালো কোয়াত্ ও সিয়াবকুশ। মিত্রবর্মা মাথা নীচু করে ভূর্জপত্রে আঁকিঝুঁকি কেটে চললো। তোরমান তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো—"যাও, কোয়াত্! তোমার মিত্রটির সঙ্গে আমি একান্তে কয়েকটি কথা বলতে চাই! কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রাসাদে গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে!" কোয়াত্ ও সিয়া শিবির থেকে প্রস্থান করলো।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো তোরমান, তারপর সহসা কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রশ্ন করলো:

—"তুমি কি পরিচয় লুকিয়েছ সকলের কাছে?"

—"না, মহারাজ!"

—"ভারতে কি ফিরে যাবে না কোনোদিন?"

—"ইচ্ছা করে খুব, মহারাজ! যাওয়া হবে কি না কে জানে! অনেক কাজ যে বাকী রয়ে গেছে এখনো!"

—"কোয়াতের কাজ?"

—"মানুষের কাজ!"

—"অন্তরজাগরের কাজ? সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজ? দ্যাখো, মিত্রবর্মা, কয়েক শতক আগে বুদ্ধ, লাওৎ সে, যীশু—সব ধর্মেরই নেতারা তাদের নির্দেশিত সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, এবং ব্যর্থ হয়েছেন। বারবার যা

পরীক্ষিত ও ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাকে আবার পরীক্ষা করা মূর্খতারই নামান্তর বলে মনে হয়।"

—"হয়ত, মহারাজ! তবু মানুষ স্বপ্ন দেখবেই, কোনো মহান্ কার্যের পূর্বকল্পনা করবেই! মানুষের এই মানসিক গতিপ্রবাহকে থামানো যায় না।"

—"ঠিক আছে, মিত্রবর্মা, তুমি তোমার মতে পথ চলো, আমি আমার মতে! আর হ্যাঁ, যে জন্য তোমাকে বসিয়ে রেখেছি—তোমাব পথ বিপদের পথ, মিত্রবর্মা! যদি কখনো দ্যাখো যে চারিদিক থেকে বিপদ তোমাকে ঘিরে ফেলেছে, অথচ দরজাগুলি সব বন্ধ, তাহলে তোরমানের কাছে চলে এসো, এই অসভ্য নিষ্ঠুর হূনটার কাছে। সে হাত ধরে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবে!"

—"আমি যতদূর জানি, তোরমান অসভ্য বা নিষ্ঠুর নয়, এমন কি হূনও নয়! আপনার এই কৃপার কথা কোনোদিন আমি ভুলবো না; প্রয়োজন হলে আর কারো সামনে না যাই, আপনার কাছে আসতে দ্বিধা হবে না আমার!"

—মৃদু হেসে তোরমান বললো—"সফল হও, পুত্র! শব্ব-খয়ের!"

—"শুভরাত্রি, মহারাজ!"

মিত্রবর্মার কৌশল আশ্চর্য রকমের সুফল দিলো। কোয়াত্-সিয়াবক্শ-মিহিরকুল প্রায় বিনা যুদ্ধেই দখল করে নিল খোরাসান নগর। রাজ্যের প্রজারা অতিষ্ঠ তো ছিলই, কাজেই দলে দলে যুবকেরা এসে যোগ দিলো কোয়াতের সঙ্গে। গজনস্পদাত্ যখন বাহলীক সীমান্ত থেকে দ্রুত ফিরে আসছিল, তখন তোরমানের এক-সৈনদলের সঙ্গে যুদ্ধে সে মারা পড়লো। ইরানের সেনাবাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো কোয়াতের সামনে। খোরাসান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোয়াত্ ইরানের একটি বিশাল অঞ্চলে তার প্রভুত্ব স্থাপন করলো।

তখন গভীর রাত। তোরমান-দুহিতা স্বামীর চুম্বনে আশ্লেষে আবার নতুন করে এক মধুর অবচেতনে ডুবে যাচ্ছিল। একেবারে হারিয়ে যাবার আগে সে শুধু একবার বলে উঠলো—"কবে যে তম্পোনে পৌঁছাবো, পাতে-শাহ্!" এ-কথা কোয়াতেরও মনের কথা।

বসন্তের প্রস্ফুটিত কাননে, মাতাল-করা সৌরভের মধ্যে, বসে আছেন অন্তরজাগর। তাঁর চতুর্দিকে উড়ছে অসংখ্য মৌমাছি, অথচ তাঁকে দংশন করছে না কেউ। শেষবার আমরা যখন তাঁকে দেখেছিলাম, তখনকার সময় থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে একটিই পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। বিগত তিন বছরে তাঁর সমস্ত কাঁচা-পাকা চুল ধবধবে শাদা হয়ে গেছে। তাঁর আসন থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা। কিন্তু অন্তরজাগরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে একটি শিশুর উপর। প্রজাপতির পিছনে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে শিশুটি, তার অঙ্গবসনপ্রায় স্খলিত, মাঝেমাঝেই পড়ে যাচ্ছে সে, আবার উঠে দৌড়োচ্ছে। রঙীন প্রজাপতি তার চাই-ই চাই। অন্তরজাগর স্মিত হেসে তরুণীটিকে প্রশ্ন করলেন—"নাম রেখেছ কিছু?"

—"না, অন্তরজাগর। ওর পিতা এসে নাম রাখবেন ভেবে এখনো কোনো নাম দেওয়া হয়নি। আপনিই কোনো নাম দিন না, অন্তরজাগর। তাতে ওর পিতার তো কোনো আপত্তি থাকবে না।"

—"সুলক্ষণযুক্ত বালক। নামও উপযুক্ত হওয়া উচিত।"

—"কিন্তু বড় দুষ্টু, জানেন। কোনো কিছুর জন্য জেদ ধরলে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির করে মারে।"

—"শিশুর পিতা গতকালই মাত্র নগরে পেঁছেছেন। যুদ্ধের ধুলো-বালি মুছছেন হয়ত শরীর থেকে। পুত্রের নামকরণ পিতারই করা ভালো। তিনি তো এসে পড়বেন আজ-কালের মধ্যেই।"

এমন সময় কয়েকটি লাল-সাদা গোলাপ হাতে করে শিশুটি দৌড়ে এসে উঠে বসলো অন্তরজাগরের কোলে। তরুণী-মাতাটি অবাক হয়ে দেখলো যে প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আর তিনি শিশুর মতো অনাবিল হেসে তাঁর অসমবয়স্ক সখাটির সঙ্গে নানা মজার কথা বলতে লাগলেন।

নবান অপাঙ্গদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো বহুশ্রুত বহুনিন্দিত বহুচর্চিত অন্তরজাগরকে, যিনি তার স্বামীর পরমশ্রদ্ধেয় গুরু। নবান ভাবছিল কেন এই মানুষটি সম্বন্ধে একদিন খোরাসান নগরের মানুষ থুতু না ফেলে কথা বলতো না, আর আজ কেন প্রতিটি সামন্ত-শ্রেষ্ঠী তাঁর সাক্ষাৎ পাবার আশায় তাদেরই প্রসাদের সামনে ভিড় করে আছে। নবান শুনেছে তিনি না কি বলে থাকেন—"যতদিন পৃথিবীতে ধনভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন মানব সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতিস্থাপন করাও অসম্ভব।" তাঁর এই উক্তি প্রসঙ্গে বহুজনের বহু কটূক্তি সে শুনেছে, তবু মানুষটির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে নবানের, তিনি যেন দীন দরিদ্র বেশে সজ্জিত সমস্ত পৃথিবীর শাহেনশাহ, তিনি যেন এক শান্তির নিলয়, প্রাণের আরাম, হৃদয়ের ঈপ্সিত সুখ।

খোরাসান নগর থেকে দূরে, সীমান্তপালের দুর্গে, ইরানের মুকুটহীন শাহেনশাহ গজনস্পদাতের মৃতদেহ পড়ে আছে। তার সমস্ত সৈন্য যোগ দিয়েছে কোয়াতের সঙ্গে। বিশাল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। কোয়াত্ বসে আছে একটি সিংহাসনে। পার্শ্ববর্তী সিংহাসনে রয়েছে যুবরাজ মিহিরকুল এবং সেনাধ্যক্ষ সিয়াবকুশ। দশ হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছে এক অখ্যাত গ্রামীণ সামন্তের প্রাসাদ পাহারা দেবার জন্য। সকলেই আশ্চর্য বোধ করেছে। কিন্তু সিয়াবকুশ জানে সেই প্রাসাদে অতিথি হয়ে এসেছেন তাদের গুরু অন্তরজাগর, আর কোয়াত্ জানে সেই প্রাসাদে পিতার সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এক শিশুপুত্র, ইরান রাজ্যের এক ভবিষ্যৎ প্রমুখ, নবান-কোয়াতের মিলনের ফসল।

একে একে স্থানীয় সামন্ত প্রভু ও শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষ কোয়াতের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আনুগত্য জানিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিরতির পরে পরেই শোনা যাচ্ছে প্রবল হর্ষধ্বনি। একেক জন সামন্তের সশস্ত্র সৈন্যদল যোগদান করছে কোয়াতের পক্ষে। কিন্তু আজকের এই আনন্দের দিনে, প্রথম বিজয় লাভের এই তুমুল উৎসবে মিত্রবর্মাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোয়াত্, মিহিরকুল, সিয়াবকুশ—সকলেরই মনে সশঙ্ক জিজ্ঞাসা—কোথায় গেল সেই বীর ভারতীয় তরুণ?

সমবেত সেনাবাহিনী চিৎকার করছে। তাদের দাবী অত্যাচারী গজনস্পদাতের মৃতদেহকে তারা বল্লমের ডগায় নাচাতে নাচাতে সারা খোরাসান নগর প্রদক্ষিণ করবে। কোয়াতের সন্দেহ হয় যে এ-ধরনের কোনো অনুমতি দিলে হয়ত তাকে সাধারণ মানুষ অন্যান্য অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের সমান মনে করবে। মিহিরকুলের কাছে শত্রু সেনাপতির মৃতদেহ আর কুকুর-বিড়ালের মৃতদেহের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। বরং জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবার জন্য সে এ-ধরনের প্রদর্শনকে অনুমোদন করে থাকে। সিয়াবকুশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না—গজনস্পদাতের মতো শক্তিশালী মহাবীরকে কে বা কারা যুদ্ধে পরাজিত করলো। তবে কি বাহলীক সীমান্তে উপস্থিত ছিল স্বয়ং তোরমান? কারণ সম্মুখ যুদ্ধে গজনস্পদাত্ অপরাজেয়, অথচ তার দেহে যে অস্ত্রাঘাত দেখা যাচ্ছে, সে তো সাধারণত দ্বন্দ্বযুদ্ধেই হয়ে থাকে। এক ইরানী সামন্ত এসে কোয়াতের সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো—"মহামহিম শাহেনশাহ, গজনস্পদাত্ ছিল সাধারণ মানুষের শত্রু। আপনি মেহেরবানী করে সেই ঘৃণ্য শৃগালটির মৃতদেহ জনতার হাতে ছেড়ে দিন। যা খুশী করুক তারা!"

একটি জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"না, শাহেনশাহ, তা হয় না!" সকলে অবাক হয়ে দেখলো ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে এক তরুণ। তার পরিধানে সাধারণ পোশাক, কিন্তু কটিদেশে ঝুলছে এক দীর্ঘ তরবারি, যা সাধারণত ভারতীয় সৈনিকদের ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো কোয়াত্—"মিত্রবর্মা ! বন্ধু মিত্রবর্মা !"

—"হ্যাঁ, শাহেনশাহ, আপনার দাস ! আমাদের মহাশত্রু গজনস্পদাতুকে পরাজিত করেছে দু'শ সৈন্যের একটি দল, যারা আমার নেতৃত্বে বাহলীকের পথে গজনস্পদাতুকে খোরাসান প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা দেয় ! যুবরাজ মিহিরকুল, আপনার অনুমতি ছাড়াই আমি কেদারীয় সেনাদের ব্যবহার করেছি, সেজন্য যে কোনো শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব ! যাই হোক, শত্রুকে অপমানকর কথা বলে তাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্ররোচিত করি এবং হত্যা করি। তাই এই মৃতদেহের উপর আমার দাবীই অগ্রগণ্য !"

ভিড়ের মধ্য থেকে এক খোরাসানী সামন্ত বলে উঠলো—"কিন্তু গজনস্পদাতুকে যে যোদ্ধাটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করে, তার পরনে ছিল লাল পোশাক, এবং গজনস্পদাতু অন্যায়ভাবে তার বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর অস্ত্রাঘাত করে। আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন সে ব্যক্তি আপনিই ?"

কোনো কথা না বলে মিত্রবর্মা তার শরীর থেকে কঞ্চুকটি খুলে ফেলে। ভিতরে দেখা যায় লাল পোশাক, মহান্ অন্তরজাগরের চিহ্ন সম্বলিত। দর্শক-বৃন্দ হর্ষধ্বনি করে ওঠে। মিত্রবর্মা বাঁ পায়ের হাঁটু দেখায়। সেখানে ক্ষত গভীর, এখনো রক্ত ধারা গড়িয়ে পড়ছে। দর্শকেরা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। মিত্রবর্মা তখন টলছে, তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরের তরাসে, সারা অঙ্গে অসহ্য ব্যথা। কোয়াত্ উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—"মিত্র, তোমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছে গতকাল, এখনো রক্ত পড়ছে ক্ষত থেকে··· ?"

মিত্রবর্মা হাসলো—"হ্যাঁ, মহামান্য কোয়াত্ ! আপনি তো জানেনই কত আঘাত সহ্য করে পথ চলেন আমাদের গুরু অন্তরজাগর, তাই আমিও তাঁরই অনুকরণে রক্তপায়ে পথ হাঁটি, যদি সেই রক্তের স্পর্শে দু-একটা ছড়ানো-ছিটানো বীজ কখনো ফসলের রূপ ধারণ করতে পারে !"

—"গজনস্পদাতের মৃতদেহ নিয়ে কি করতে চাও তুমি, মিত্র ?"

—"বন্ধু, শাহেনশাহ ! মৃত ব্যক্তি আমাদের শত্রু ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই ! এতেও সন্দেহ নেই যে তিনি মস্ত বড় একজন বীর ছিলেন ! তাঁর মৃতদেহ নিয়ে কোনো পৈশাচিক উল্লাস হবে কেন ? মৃতদেহের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ, তার কোনো অর্থ হয় ? তাই আমি চাই বিরোচিত মর্যাদা সহকারে তাঁর দাহ-সংস্কার করা হোক !

সমস্ত প্রাঙ্গণ মিত্রবর্মার ইচ্ছা শুনে হর্ষপ্রকাশ করলো। পূর্বতন মুখ্য সামন্ত প্রভু গজনস্পদাতু রাজবংশীয় ছিল। সাক্ষাৎ পারিবারিক সম্পর্ক ছিল তাঁর ও কোয়াতের। তাঁর ভূতপূর্ব সেনাদল আচরণিক দিক থেকে তাঁকে ঘোর অপছন্দ করতো, তবু সেই বিখ্যাত বীরের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে জনসাধারণের দ্বারা পদদলিত ও পিষ্ট হতে থাকবে, এই ভবিতব্য মন থেকে মেনে না নিতে পারলেও জনগণের রোষের কারণে কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। তাই তারা

এই নির্ভীক ভারতীয় তরুণটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। এ-ধরনের রক্তাম্বর-মানুষ যদি দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য হবে, এই ভরসায় সকলেই জয়ধ্বনি করে উঠলো মিত্রবর্মার নামে।

ক্রমাগত রক্তক্ষরণ, শারীরিক ব্যথা-বেদনা, নিদ্রাহীনতা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মৃতপ্রায় মিত্রবর্মা তখন জ্ঞানহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছে সিংহাসনের সামনে। কোয়াত্, মিহিরকুল ও সিয়াবক্শ দ্রুতপদে এগিয়ে এসেছে তাকে তুলে ধরতে।

সেই রাত্রেই গজনস্পদাতের পার্থিব শরীরকে রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে মৃত্তিকার গভীরে শায়িত করা হলো। মিত্রবর্মাকে পাঠানো হলো নবান দুখ্তের আশ্রয়ে। সেখানে রয়েছেন অস্তরজাগর, তাই ভয়ের কিছু নেই।

খোরাসান বিজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ইরানের এক-তৃতীয়াংশ এখন কোয়াতের দখলে। তবু বাকী দু-ভাগ এখনো জয় করা হয়নি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোট-বড় সামন্তদের সেনাবাহিনী যোগ দিয়ে চলেছে শাহেনশাহর দলে। মহারাজা তোরমানের তিরিশ হাজার সৈন্য এবং হস্তী-বাহিনীকে বাদ দিয়ে কোয়াতের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এছাড়া জনসাধারণের সমর্থন তো আছেই।

গজনস্পদাতের অন্তিমসংস্কার সম্পন্ন হয়ে গেলে মিহিরকুল ফিরে গেল তার নিজস্ব দশ হাজার সৈন্য নিয়ে। তস্পোন পর্যন্ত অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু তোরমানের নির্দেশ অমান্য করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত। তোরমান-দুহিতা এবং কোয়াত্ দুর্গেই বসবাস করছে। মিহিরকুল চলে যাবার পরদিন কোয়াত্ ও শাহদুখ্ত একান্তে মিলিত হবার সুযোগ পেল অনেকদিন পরে।

—"খোরাসান আপনি জিতে নিয়েছেন তিনদিন আগে। ব্যস্ত ছিলেন খুবই, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু এর মধ্যে একবার অন্তত নবান দুখ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল আপনার।"

—"নবান দুখ্তের কথা কে বলেছে তোমাকে?"

—"আকা [প্রভু]। আমি ইরানের রাণী, মহারাজা তোরমানের কন্যা—আমার কি গুপ্তচর থাকতে পারে না!"

—"নবানের কথা আমারই বলা উচিত ছিল তোমাকে, যেমন বলেছি মহারাণী সম্বিকার কথা। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ রাণী, নবান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অবশ্যই উচিত ছিল আমার। সে আমার··"

—"সে আপনার পুত্রের জননী, আকা। আর আমার বড় বোন। আপনি আজই যান সেখানে। উপরন্তু, তাঁরই আশ্রয়ে রয়েছেন বীর মিত্রবর্মা, যিনি আহত। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী করুন। আর পরমগুরু

অন্তরজাগরও সম্ভবত আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাঁকে প্রতীক্ষারত রাখা কি উচিত? আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আজই যান! আমার জন্য চিন্তা করবেন না। দেশে-বিদেশে আমার পিতার কম করে হলেও পঞ্চাশটি পত্নী রয়েছে। সে নিয়ে আমার মাতা, আপনার ভগ্নী, কখনও কোনো দুশ্চিন্তা করেন না। শাহেনশাহ, মহারাজা, সম্রাট—তাঁরা চিরকালই বহু বিবাহের পক্ষপাতী। আমি এ-সব দেখে দেখে অভ্যস্ত; আকা!"

মিত্রবর্মা অনেকটা সুস্থ এখন। তার রোগশয্যার চারদিক ঘিরে বসে আছে নবান, কোয়াত্, সিয়াবক্শ। শিশুটিও আছে সে ঘরে—আপন মনে খেলছে সে। কোয়াত্ তার এই সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুত্রটিকে দেখে খুবই প্রসন্ন। তার প্রসন্নতা দেখে মুখ টিপে হাসছিল নবান। আর কোয়াতের বড় ইচ্ছা করছিল শিশুটিকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ চটকায়। কিন্তু বড়ই ছট্ফটে শিশুটি। সিয়াবক্শ বাচ্চা কোলে করা খুব একটা পছন্দ করে না, কিন্তু শিশুটি মাঝে মাঝেই অনায়াসে তার কোলে এসে বসছিল, উদ্দেশ্য অবশ্য মিত্রবর্মার কাছ থেকে গল্প শোনা। নবান-এর মুখ থেকে সে শুনেছিল যে সামনের গম্ভীর অথচ সুদর্শন পুরুষটিই তার পিতা, কিন্তু পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে এখনো সে সচেতন হয়নি।

হঠাৎ সে বলে উঠলো—"আমি অন্তরজাগরের কাছে যাব!" এবং নানীর কোল ফেলে দৌড়োতে দৌড়োতে চলে গেল। কোয়াত্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—"অল্প বয়স থেকে সৎসঙ্গ করা খুবই ভালো। আশ্চর্য মানুষ আমাদের এই অন্তরজাগর। ছোট্ট শিশুরও তাঁর প্রতিই বেশী টান!"

মিত্রবর্মা বললো—"এখনো পুত্রের কোনো নাম দেওয়া হয়নি, কোয়াত্! নামকরণ অনুষ্ঠানটি কিন্তু তস্পোনে পেঁছেই করে ফেলা উচিত হবে!"

—"কেন? অন্তরজাগর নাম দেননি কোনো?"

—"না। দেশের প্রথা অনুযায়ী নামকরণ পিতার কাজ।" বললো নবান।

—"কোনো নাম ভাবোনি তুমি?"

—"ভেবেছি, কিন্তু আপনার যদি পছন্দ না হয়!"

—"শুনিই না আগে!"

—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় যার জন্ম, তাকে খুস্রব বলা হয়!"

—"খুস্রব? হ্যাঁ, চমৎকার নাম! আমার পুত্রের নাম খুস্রব রাখা হবে!"

দেখা গেল নামটি সকলেরই পছন্দ হয়েছে।

গভীর রাত। রণক্লান্ত দুটি শরীর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে। কারো চোখে ঘুম নেই এখনো। নবান তৃপ্ত। ইরানের শাহেনশাহ তাকে ও

তার পুত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহারাণী সুশিবকা এবং রাণী শাহদুখতের পাশাপাশি সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পাবে সে, যে কিনা সামান্য এক সামন্ত সর্দারের কন্যা। তার স্বপ্নের নগরী তস্পোন আর বেশী দূরে নয়। নবাবের রেশমী শরীরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোয়াত্ও স্বপ্ন দেখছিল—ইরানের সিংহাসনে বসে আছে সে।

তিগ্রা এখনো আগের মতোই প্রবাহিত হচ্ছে মন্থর গতিতে। যেন দুই কিনারায় কি ঘটে চলেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই তার। যা ঘটে চলেছে, সে তো নতুন কিছু নয় তার কাছে। সহস্র শতাব্দী ধরে সে দেখে আসছে কখনো রক্তস্নান, আবার কখনো আনন্দস্রোতে অবগাহন। কিন্তু তস্পোন নগরীর অনেক মানুষই আজকাল বিনিদ্র রজনী যাপন করছে। তাদের ভীতির কারণ : কোয়াত্ তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রায় বিনা বাধায় অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে তস্পোনের দিকে। এবং আকস্মিকভাবেই দেশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে রোমান সৈন্যদলও হানা দিতে শুরু করেছে। কোয়াত্ ও তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে চিন্তা ততটা নেই, যতটা ভয় কেদারীয় হুন রাজা তোরমানের সৈন্যদের সম্বন্ধে। তস্পোনের অপার ঐশ্বর্য তারা লুটেপুটে নিয়ে যাবে, সন্দেহ নেই তাতে। কোয়াত্ হয়ত অন্যান্য অত্যাচার সামলাতে পারবে, কিন্তু হুন সৈন্য লুণ্ঠন করবে না, সেটা অবিশ্বাস্য। উপরন্তু, একটি সাধারণ হুন সৈনিকও যদি মারা যায়, তাহলে তস্পোনের ভস্মীভূত হতে দেরি লাগবে না। এ-সব কথা ভাবছে তারাই, যারা একদিন কোয়াত্‌কে পথের ভিখারীরও অধম করে দিয়েছিল।

সমস্ত দুর্গ-প্রাসাদে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। লোকজন যাতায়াত করছে না এমন নয়, কিন্তু সকলেরই মুখে যেন তালা লেগে আছে, সকলেই সকলকে দেখছে আড়চোখে। আসলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এইসব পরিচারক ও কর্মচারীবৃন্দ। এমন সময় শ্বেত অশ্বচালিত রথে উপস্থিত হলো শ্বেতাম্বর মগোপতান্-মগোপত্। কোয়াত্‌কে সিংহাসনচ্যুত করার পিছনে সব থেকে সবল হাত ছিল তারই, এবং সেই কাজে তার মুখ্য সহায়ক ছিল গজ্‌নস্পদাত। "ধর্ম আজ বিপন্ন"—এই জিগির তুলে জনসাধারণকে কোয়াত্ এবং মজদক্-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষ ঢেলেছিল সে-ই, ইস্তেখার নগরীর দেবী ভগবতীর দোহাই সে-ই দিয়েছিল। গজ্‌নস্পদাত আজ নেই, সমস্ত ইরানের সাধারণ মানুষ, নিশাপুর এবং তেহরানের সামন্ত প্রভুরাও আজ কোয়াতের পক্ষ অবলম্বন করেছে। মগোপতান্-মগোপতের চেহারা ধারণ করেছে পাণ্ডুরবর্ণ।

দুর্গের একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রতীক্ষারত শাহেনশাহ জামাস্প, জনা কয়েক রাজ-অমাত্য এবং প্রধান সেনাপতি বোইয়া। সকলেরই মুখে চিন্তার কালো মেঘ। মগোপতান্-মগোপত্ কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলো। প্রথা অনুযায়ী শিষ্টাচার বিনিময়ের পর জামাস্প বললো :

—"আমরা আপনার সুপরামর্শের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। যে-সব খবর পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের সেনাবাহিনী যুদ্ধ-

বিমুখ হয়ে পড়েছে, তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্র যে ঠিক কোথায় তাও বোঝা যাচ্ছে না। গজনস্পদাতের মৃত্যুর পর ··· ।"

—"আমি আর কি পরামর্শ দিতে পারি? কোয়াত্ এবং মজদকের প্রতিশোধের বড় কোপটা তো আসবে আমারই উপর।"

প্রধান সেনাপতি বোইয়া অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো :

—"আমরা সকলে একই নৌকার যাত্রী। নৌকা যখন ডুববে তখন ছোট অপরাধী আর বড় অপরাধীর ভাগ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না। প্রকৃত সত্য এই যে কোয়াত্ এগিয়ে আসছে, এবং প্রায় বিজয়-মিছিল নিয়েই। তস্পোন থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে আছে তারা। এখন আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—হয় পলায়ন, নয় আত্মসমর্পণ। আপনি কি করতে বলেন?"

—"তৃতীয় পথ, অর্থাৎ প্রতিরোধ কি একেবারেই সম্ভব নয়?"

—"না। আপনার ধর্মযুদ্ধের বুকনি এখন অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। প্রতিরোধ যারা করতে পারে তারা আপনাকে-আমাকে বাতিল করে দিয়েছে। আমরা আপনার মতামত জানতে চাইছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য পলায়ন এবং আত্মসমর্পণের অর্থ একই।"

—"আমি তো বলি ভবিতব্যের সামনে মাথা নত করাই ভালো। নতুবা আমাদের দোষে হাজার হাজার নির্দোষ প্রজাদের হয়ত প্রাণ হারাতে হবে।"

জামাস্প সশব্দে হেসে উঠলো—"আপনাকে আমি শিশুকাল থেকে দেখে আসছি, মগোপত্। পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে আপনি বোধহয় প্রথম বার গরীব প্রজাদের কথা ভাবলেন, তাই নয়?" মগোপতান্-মগোপত্ যেন শুনতেই পেল না কথাটা।

কেদারীয় হূনরা ছোট ছোট শহর লুট করে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা প্রতীক্ষা করছিল তস্পোনে পৌঁছানো পর্যন্ত। সম্ভবত তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো, কিন্তু মজদক অস্তরজাগরের স্নিগ্ধ উপস্থিতি এবং ভাবগম্ভীর মধুর বাণী কেদারীয় হূনদেরও প্রভাবিত করলো। নগরীর প্রবেশদ্বারে আত্মসমর্পণকারী জামাস্প, প্রধান সেনাপতি বোইয়া, মগোপতান্-মগোপত্ এবং অমাত্যদের বন্ধন-শৃঙ্খল নিজের হাতে খুলে দিলো কোয়াত্। কেদারীয় সৈন্যদের কোথাও কোনো শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গে লিপ্ত হতে দেখা গেল না।

কোয়াত্ দ্বিতীয় বার ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করলো। অস্তরজাগরের মধুর স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপায়িত হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা।

আবার এসেছে বসন্ত ঋতু। স্বচ্ছ নদীর জলে, আঙুরের লতাপাতায়,বাগিচার গোলাপ বনে, নতুন ঘাসে—সর্বত্রই বসন্তের সাজোসাজো সাড়া ছড়িয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান নানা রঙের জমায়েত। আকাশের পশ্চিম প্রান্তকে অরুণরাগে রাঙিয়ে দিয়ে দিনমণি চলেছেন অস্তাচলে, আর পূর্ব দিগন্তে তখন নবোদিত চন্দ্র উঁকি দিচ্ছেন।

উদ্যানে বহু নর-নারীর ভিড়, কিন্তু কোনো উচ্ছ্বাস নেই, নেই কোলাহল। বাতাবরণ শান্ত, সমাহিত। সেচনালার ধারে একান্তে বসে আছে সিয়াবক্‌শ ও মিত্রবর্মা। বহু বছর তারা এমন নিশ্চিন্ত হয়ে একান্তে বসে কথা বলবার অবসর পায়নি। দু-জনেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। সিয়াবক্‌শ তার সৈন্যাপত্য নিয়ে, মিত্রবর্মা আপন গবেষণায়।

মিত্রবর্মার ধারণা ইরানের আকাশে আবার দেখা দেবে দুর্যোগের ঘনঘটা। শুনতে থাকে সিয়াবক্‌শ, কারণ সে জানে তার এই ভারতীয় বন্ধুটি অকারণে কোনো আশংকা প্রকাশ করবে না। তাছাড়া, ইতিহাস ও দেশ-কালের নানা নজিরের মাধ্যমে মিত্রবর্মা যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, সেগুলি সচরাচর ভুল হয় না।

পশ্চিম দিক সর্বদাই ইরানের শত্রুপক্ষ ছিল, আজও তাই আছে। যবন দেশ [গ্রীস] ও ইরানের রাজ্যসীমার মধ্যে যে সমুদ্রের বাধা ছিল, তাকে সর্বপ্রথম অতিক্রম করেছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা অলিক্‌সুন্দর [আলেকজান্ডার]। তিনি শুধু ইরানের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি জয় করেননি। বহু নগর স্থাপন করেছিলেন তিনি, যেখানে পরবর্তীকালে অসংখ্য যবন সৈন্য বসবাস করতে থাকে। যবন সভ্যতা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ইরানের বড় বড় শহরে। উচ্চ মানের সভ্যতা সব সময়েই গ্রাস করে ফেলে অনুন্নত সভ্যতাকে। তাই যবন প্রভাবে ইরানের সভ্যতা অধিকতর পুষ্ট হয়। পরে যখন রোমানরা যবনদের পরাজিত করে, তখন তারাও গ্রীক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু সেই সময় থেকেই ইরান পশ্চিম প্রান্তে দুর্বল হয়ে পড়ে।

যে কোনো দেশের জন্যেই স্বাভাবিক সীমান্ত, প্রতিরক্ষার কাজে অমূল্য সম্পদ, যেমন আছে ভারতে। কিন্তু দেশকে শক্তিশালী ও সম্পদশালী করে তোলার জন্য শুধু প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের কথা ভাবা অনুচিত। তাতে চিন্তাধারা এক-পেশে হয়ে পড়ে, যা দেশের আত্মিক প্রগতির পক্ষে হানিকারক। বিশেষ করে, এমন অবস্থায় দেশের সেনাবাহিনী যদি দু-একটা বড় সফলতা পায়, সঙ্গে সঙ্গে রাজা বা সম্রাট মনে ভাবতে থাকে সে অজেয়, এবং প্রায় অকারণেই আরো যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। আর এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত যে যুদ্ধ মানুষকে নৃশংস ও রক্তলোলুপ করে তোলে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে

না যে যুদ্ধ বিজ্ঞানবিরোধী, কারণ মানুষের প্রধান কর্তব্য যেখানে সৃষ্টি করা, যুদ্ধ সেখানে কেবল ধ্বংস ছাড়া কিছুই করতে পারে না। যুদ্ধ যদি কিছু সৃষ্টি করে তো সে হলো ঘৃণা।

ইদানীংকালে রোমানদের অজেয় দুর্গ আমিদা জয় করেছে ইরানী সৈন্য। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? বেহিসাব রক্তক্ষয়, মনুষ্যত্বের অবমাননা, লুটতরাজ, নির্বিচার হত্যা—এ-সব ছাড়া অন্য কিছু তো দেখা যায়নি। শাহেনশাহ কোয়াত্ এবং সেনাপতি গুন্নারের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তি ফিরে এসেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু রোমান নগরীটি বহুদিন সেই অত্যাচারের স্মৃতি বহন করবে বুকে। কতজনের বুকের ভিতরে যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকবে, তাই বা কে বলতে পারে?

রাজতন্ত্র ও দিব্যতন্ত্রে ইত্যাকার অনেক কারণেই মেলবন্ধন ঘটা সম্ভব নয়। রাজতন্ত্র কখনো পশ্চিমে রোমান এবং কখনো উত্তরে যাযাবর আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে থাকবে, ফলে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে, এবং নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে স্বার্থান্বেষী সেই পুরোহিত গোষ্ঠী। বর্তমানে ইরান রাজ্যেও সেই হালই চলছে। কাজেই ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, সন্দেহ নেই।

মিত্রবর্মা এবং সিয়াবুকশ যখন এ-ধরনের কথাবার্তায় মগ্ন, চন্দ্রকিরণে স্নাত আপাদমস্তক শ্বেত বস্ত্রে আবৃত এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী মূর্তি তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। সিয়াবুকশ তাকে সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন জানায়। মিত্রবর্মা বলে ওঠে—"স্বাগত, বশ্বিশ্নান্-বাম্বিশ্ন সম্বিক্। বহুদিন পরে আপনার দর্শনলাভ করে ধন্য হলাম।"

"ছাড়ো তো ও-সব দরবারী কায়দা-কেতা। আমি কি শুধুই মহারাণী, তোমাদের বন্ধু নই?"

—"এসো, প্রিয় বন্ধু, সম্বিকা। বসো আমাদের কাছে।" মিত্রবর্মা হাত ধরে আকর্ষণ করে সম্বিকাকে পাশে বসালো।

—"কোনো গোপন আলোচনা না কি, সিয়া?"

—"না, এমন কিছু নয় যা তোমার সামনে বলা যাবে না।"

—"প্রসঙ্গটা কি?"

—"আমিদা বিজয়!"

—"আমিদা বিজয়ের পর থেকে শহর ও নগরগুলিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি তোমরা?"

মিত্রবর্মা হেসে বললো—"হ্যাঁ, অসংখ্য রোমান দাসী এসেছে। তাদের শ্বেত গাত্রবর্ণ ও ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি দেখে অনেক সামন্ত প্রভু এবং পুরোহিতরা রক্ষিতা বদল করবে এমনও শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু বৃদ্ধ পুরোহিতের সহধর্মিণীরা স্ত্রী-বদলের আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছে।"

—"না, সেকথা বলছি না। সব কিছু দেখে অবাক হয়ে ভাবছি মানুষের

কি ভয়ানক কলঙ্ক এই দাসপ্রথা ! বুদ্ধ, মানী, অন্তরজাগর কেউই তো নির্মূল করতে পারলেন না এই প্রথাটি ! ইদানীং বেশ কিছু স্নানাগার খুলেছে শহরে নগরে, সেটা কি লক্ষ্য করেছ ?”

—“সেটা তো রোমান সভ্যতার প্রভাব ! রোমানরা আবার স্নানের অভ্যাসটি আয়ত্ত করেছিল যবনদের কাছ থেকে ! আমাদের জনসাধারণ তো কোনোদিন স্নানের প্রয়োজনই বোধ করেনি ! আর রোমান প্রভাবে তারা এখন গরম জলে স্নান করতে শিখছে, পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি গেছে তাদের ! অথচ মগোপতু মোবিদ বলছে এটা না কি ধর্মবিরোধী আচরণ !”

—“ধর্মবিরোধী ? দেহের শুদ্ধতা, পরিচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দ্য ধর্মবিরোধী আচরণ ? আমাদের দেশে, ভারতে, স্নান না করে মন্দিরে প্রবেশ করাটা তো অপরাধ ! অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই ! অনেকে বলে থাকেন, যে জল জীবনদায়ী—তাতে পাদস্পর্শ করলে সে না কি অপবিত্র হয়ে যায় ! শাহেনশাহ কোয়াতু তার গুরু অন্তরজাগরের মতো প্রত্যহ স্নান করে, সেনাপতি সিয়বক্শও ! তাই মগোপতুরা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের নিন্দা করে থাকে !”

—“তাহলে জলের মধ্যে অবগাহন স্নান পাপ, কারণ তাতে জল মলিন হয়ে যায় ! জলকে আগুনের উপর রেখে গরম করা পাপ, কারণ তাতে অগ্নিদেব রুষ্ট হন ! মৃতদেহকে আগুনে জ্বালালেও পাপ, কারণ দেবতা তাতেও রুষ্ট হয়ে যান ! সিয়াবক্শ তার মৃতা স্ত্রীকে কবর দিয়ে ধরিত্রী দেবীকে অপবিত্র করেছে ! উফ্, যা কিছু মগোপতুদের অপছন্দ, সে সমস্ত কিছুই পাপ, পুণ্য নেই কিছুতেই !”—সম্বিকা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো ।

—“অথচ যদি আমি আমার মৃতা স্ত্রীকে প্রথা অনুযায়ী চিল-শকুনের খাদ্য হিসাবে রেখে দিতাম, তাহলে দুর্গন্ধের চোটে স্বয়ং বায়ুদেবতারও অপবিত্র হবার সম্ভাবনা ছিল না কি ?”

—“আস্ত বুদ্ধির ঢেঁকি এক একজন !”

—“না সম্বিকা ! মগোপতুরা কেউই নির্বোধ নয়, বরং অন্যদের বোকা বানাতে তাদের জুড়ি মেলা ভার ! ধর্ম তো নিছক মানুষের পরাম্পরাগত কিছু ধারণার সমষ্টি, আর শ্রদ্ধাভক্তি হলো হাতিয়ার ! এগুলির সাহায্যেই পুরোহিত গোষ্ঠী মানুষের চোখে ঠুলি বেঁধে রাখে !”

—“আমাদের আন্দোলন কি তবে বিফলে গেল ? আমরা কি সময়ের আগেই অগ্রসর হয়েছিলাম ?”

—“আগে-পরের প্রশ্ন নয় ! আসল কথা, পুরোহিত গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর প্রভাবের মায়া-জাল বিছিয়ে রাখবেই ! অন্তরজাগর যা বলেন, বুদ্ধ যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন—জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ সে-সবের মর্ম বোঝে না, বুঝতে চায়ও না ! অথচ মহাপুরুষদের পক্ষে মনোহারী মিথ্যা কথা বলাটাও সম্ভব নয় ! আর এইখানেই পুরোহিত গোষ্ঠী জিতে যায় ! ধন-সম্পদ বা

সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তাই তারা শ্রেষ্ঠী বা সামন্তদের চেয়ে কম যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। বর্তমানে মগোপতান্-মগোপত্ গুলনাজ রাণী নবান-দুখ্তের পুত্র খুস্রবের শিক্ষা-দীক্ষার সমস্ত ভার নিজের হাতে নিয়েছে, সেটা কি লক্ষ্য করেছ?"

—"হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি। কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?"

—"কোয়াত্ যে রাণী নবানদুখ্তের প্রতি এবং পুত্র খুস্রবের প্রতি অধিক মেহেরবান, সেটা আমি যেমন জানি, তার থেকে বেশী জানে গুলনাজ!"

সম্বিক্ প্রতিবাদ করলো—"না, মিত্র, এটা তোমার ভুল ধারণা। কোয়াত্ পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে না।"

—"কারণ, তুমি তার সহোদরা, এবং মহারাণী। কিন্তু সম্বিকা, কোয়াত্ হয়ত এখনো হাতছাড়া হয়ে যাবার মতো ততটা এগোয়নি। তাকে ফেরানো এখনো সম্ভব। অবিলম্বে পুরোহিত গোষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠীদের কূটনৈতিক চাল থেকে তাকে সাবধান করা জরুরী। এবং সেটা তোমার কাজ।"

—"সে দেখা যাবে। কিন্তু মিত্র, কাবুস্‌কে কি রকম মনে হয় তোমার?"

—"অন্তরজাগরের শিক্ষার গুণে, খানিকটা তার নিজের গুণেও, কাবুস্ আজ সর্বজনমান্য তরুণ রাজকুমার। দেশের সমস্ত মানুষ তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। শাহেনশাহ নিজেও তার গুণগ্রাহী। জনসাধারণের জন্য জলাশয় ও সেচনালা খনন, রাজপথ-সেতু-শিক্ষালয়-চিকিৎসালয়-নতুন নগর নির্মাণে সবথেকে অগ্রণী কাবুস্। এমন জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কাবুসের মধ্যে যেন এক বৈরাগী ভাব দেখা যায়, এবং রাজকুমারদের মনোভাব জানতে বেশী দেরি লাগে না পুরোহিত গোষ্ঠীর। তাই মগোপতান্-মগোপত্ গুলনাজ কুমার খুস্রবকে ইরানের সিংহাসনে বসাবার যে স্বপ্ন দেখছে, তার পিছনে যুক্তি তো আছেই। কাবুসের মতো নরম-স্বভাব সহৃদয় রাজকুমার তার পছন্দ হবে কেন?"

সিয়াবক্শ-এর ভ্রু-দুটি কুঞ্চিত হয়ে যায়—"যতদিন শাহেনশাহ মহামহিম অন্তরজাগরের অনুগামী থাকবে, আমি জানি ততদিন ভয়ের কিছু নেই! কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান মগোপতান্-মগোপত্ গুলনাজ আগের মহাপুরোহিত আত্তুরের মতো মূর্খ নয়, বৃদ্ধও নয়।" মিত্রবর্মা মহারাণী সম্বিকার দুটি নীলোৎপল আঁখির দিকে তাকিয়েছিল—"আমার হাত কলম ধরতে জানে, তরবারিও! কখনও কাঁপে না, কাঁপেনি কখনও।"

পঞ্চাশ হাজারী সেনাপতি সিয়াবক্‌শ-এর সুরম্য প্রাসাদের চালচলনে কোনো পরিবর্তন এখনো হয়নি। কিন্তু চারিদিকে ভয়, প্রচ্ছন্ন আশংকা। চারিদিকে নীরবতার অখণ্ড প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। অন্তঃপুরে পরিচারক-পরিচারিকার দল দম দেওয়া পুতুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোরে নিশ্বাস নিতেও তারা যেন ভয়ভীত।

একটি কক্ষে সিয়াবক্‌শ, মিত্রবর্মা ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইশাই-মোহান্ত বাজান গম্ভীর আলোচনায় মগ্ন। শাহেনশাহ কোয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুস্ বা পজ্‌শাখারশাহ সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। কাবুসের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান মানুষ সমস্ত ইরানে একটিও পাওয়া যাবে না। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে তার শিক্ষা-দীক্ষা মজদ্‌ক অন্তরজাগরের কাছে কেন হলো, তাহলেও উত্তর দেওয়া যেতে পারে সে-জন্য দায়ী তার মাতা-পিতা, সে নিজে নয়। আজকাল মগোপত্ মোবিদ্ গুলনাজ রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলছে। অন্তরজাগর এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ রক্তের পবিত্রতা ইত্যাদির অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন অনেক আগেই।

গুলনাজের কোপের পাত্র মজদ্‌কপন্থীরা। কিন্তু কাল যে কার উপরে কোপ এসে পড়বে তা কে জানে। মিত্রবর্মা বা সিয়াবক্‌শ নিজেদের অনিষ্ট চিন্তায় কাতর হবার পাত্র নয়। সিয়াবক্‌শ রাজদ্রোহী নয়, কোয়াতের প্রতি তার আনুগত্য সন্দেহাতীত, কিন্তু কোয়াতের মধ্যে সে পক্ষপাতের মনোভাব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রাজা বা রাণীর পক্ষপাতদুষ্টতা একটি রাজ্যকে অনায়াসে দুর্বিপাকে ফেলে দিতে পারে। মিত্রবর্মার কাছে সে শুনেছে, ভারতীয় সম্রাট দশরথের পত্নী কৈকেয়ী ও তার দাসী মন্থরার কাহিনী। সিয়াবক্‌শ মনে করে যে আজকের ইরানে কৈকেয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে শাহেনশাহ কোয়াত্ স্বয়ং, এবং মগোপত্ মোবিদ্ গুলনাজ মন্থরার ভূমিকায়। আর্মেনিয়া এবং ইব্রীস্থ ন [আইবর] অঞ্চলের সমস্ত মন্দিরাধ্যক্ষদের আদেশ পাঠানো হয়েছে যে, তারা যেন পুরানো ধার্মিক প্রথাগুলি পুনঃপ্রচলন করে। পজ্‌শাখারশাহ কাবুস্‌কে মোবিদ্ গুলনাজ কায়দা করে রাজধানী থেকে বহুদূর পজ্‌শাখার প্রদেশের প্রশাসক করে পাঠিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার শিষ্য খুস্‌রব বেশীক্ষণ শাহেনশাহ কোয়াতের নজরের সামনে থাকতে পারে। নজরের বাইরে থাকা যে ক্রমশ মনের বাইরে চলে যাওয়ারই নামান্তর, সেটা ধূর্ত মোবিদ্ গুলনাজ ভালোভাবেই জানে। আবার এটাও সে বোঝে যে সরাসরি কাবুসের বিরোধিতা করা উচিত হবে না, কারণ সে শাহেনশাহর সহোদরার পুত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা অসীম। কিন্তু খোরাসান নগরে সেই সামন্ত সর্দারের পৌত্র খুস্‌রবকে শাহেনশাহ কোয়াতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বানাবার জন্য মোবিদ্ গুলনাজের চেষ্টার কোনো সীমা নেই। খুস্‌রব শাহেনশাহর প্রিয়তম

পুত্র, এবং গুলনাজের প্রিয়তম শিষ্য। শিষ্য ভবিষ্যতে সিংহাসনাসীন হলে মোবিদ্ গুলনাজ হয়ে যাবে দেশের সর্বেসর্বা। তারপর, খুস্রুবকে একবার রাজকীয় ভোগবিলাসের স্বাদ দিতে পারলে সে আর সেই মোহচক্র থেকে কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবে না। মোবিদ্ গুলনাজ জানে তখন কি-ভাবে পায়ের তলায় পিষতে হবে তাকে।

অসুবিধা হলো একটাই—খুস্রুবের শরীরে দু-তরফা রাজরক্ত নেই। অথচ, গুলনাজ রক্তের পবিত্রতা রক্ষার সপক্ষে গোঁড়া প্রবক্তা। গুলনাজ চেষ্টা করেছিল খুস্রুবকে যাতে রোমান সম্রাট কাইজার জুস্তিন পালিত পুত্ররূপে স্বীকার করে। তাহলেই রক্ত সম্পর্কিত দোষটা কেটে যাবে। কিন্তু রোমান মন্ত্রী প্রোক্লস্ সম্রাট জুস্তিনকে বোঝালেন যে প্রথাটি বর্বরজনোচিত। বর্তমানে সম্রাট জুস্তিনের প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে দায়ী করা হচ্ছে সিয়াবক্শকে, এবং শাহেনশাহ মগোপত্ মোবিদ্ গুলনাজের এই অপপ্রচারে বিশ্বাস করছে। রোমান মন্ত্রী প্রোক্লস্ এবং সিয়াবক্শ যে প্রতিপক্ষ হয়েও বন্ধু, সে-কথা কোয়াত্ জানে। এ-কথাও কোয়াতের অজানা নয় যে সিয়া পরবর্তী শাহেনশাহ হিসাবে খুস্রুবের তুলনায় কাবুস্কেই বেশী পছন্দ করে।

মিত্রবর্মা সব কিছুই জানে। তবু সে চুপচাপ শুনছিল।—"বন্ধু সিয়াবক্শ, কোয়াতের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি আমিও। তাই বলছি, তোমার জীবন বর্তমানে বিপন্ন মনে করি।"

—"জানি, মিত্র! তাতে দুঃখ নেই। মৃত্যু তো জীবনেরই শেষ মূল্যদান! দুঃখ তো একটাই—পৃথিবীর মাটিতে যে স্বর্গকে আমরা নামিয়ে আনতে চেয়েছিলাম, যে মধুর স্বপ্নের রূপরেখা আমরা এঁকেছিলাম, এবার হয়ত তাকে নির্মমভাবে পদদলিত করা হবে! অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে আমাদের মহীরুহের স্বপ্ন!"

—"না, সিয়াবক্শ! সত্যের অঙ্কুরকে যতোই পদদলিত করো তার নাশ হতে পারে না। অঙ্কুর যদি মৃত্তিকার গভীরে একবার প্রোথিত হয়ে যায়, তবে সে আবার কোনো না কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়! মনে রেখ, বন্ধু, মানবিক মিত্রতা ও সাম্য কেবলমাত্র ভাবজগতের কথা নয়, বাস্তবিক জগতেও তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই সুখলাভের একমাত্র পথ!"

সেইদিনই গভীর রাত্রে শাহী অশ্বারোহী বাহিনী সিয়াবক্শকে গ্রেপ্তার করলো। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারালয়ে আজ বড় ভিড়। দেশের প্রধান সেনাপতির বিচার প্রহসন আজ অনুষ্ঠিত হবে, এবং বিচারপতির আসনে বসেছে মগোপত্ মোবিদ্ গুলনাজ। গুলনাজের সহকারী হিসাবে আছে শ্রেষ্ঠী সোরেন। উভয়েই সিয়াবক্শ-এর বিরোধী, এবং দর্শকদেরও বুঝতে বাকী নেই আজ সেনাপতির ভাগ্যে কি ঘটতে

চলেছে। কোয়াতের নিজস্ব সেনাবাহিনীর দুশ' সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত সিয়াবকুশ বিচারালয়ে প্রবেশ করলো। তার হাত-পা শৃঙ্খলিত। তার চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সে বিচারকের সামনে দু-জন বিপক্ষীয় ব্যক্তিকে দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

শ্রেষ্ঠী সোরেন তাকে সাধারণ অভিযুক্তের মতো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু গুলনাজ বুদ্ধিমান, সে জানে এই সিয়াবকুশ একদিন শাহেনশাহর প্রিয়পাত্র ছিল, এবং যুদ্ধবিদ্যায় তার সমকক্ষ ব্যক্তি ইরানে কেউ নেই। একজন খ্যাতিমান সেনানায়কের পক্ষে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসাটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাই সে ভব্যতা বজায় রেখে সিয়াবকুশকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলো।

এর পর শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন, যাতে সিয়াবকুশ উত্তেজিত হয়ে উঠে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে। কিন্তু তার শান্ত নিস্পৃহ উত্তরে প্রশ্নকর্তারাই ক্রমশ বিপাকে পড়তে লাগলো। ঈসাই-ইহুদী-হিন্দু শব-সৎকার পদ্ধতি সম্পর্কে সিয়াবকুশ-এর অনুকূল মত ক্ষিপ্ত করে তুললো সোরেনকে। সিয়া যুক্তিজালে বেঁধে ফেললো সোরেনকে, এবং ইরানী প্রথার অবৈজ্ঞানিকতার কারণ দর্শাতে লাগলো, অতি বড় শত্রু গুলনাজও মনে মনে তার তারিফ না করে পারলো না।

কিন্তু যখন সিয়াবকুশ স্বীকার করলো যে সে বিশ্বের সমস্ত প্রমুখ ধর্মগুলির ভালো দিকগুলিকে শ্রদ্ধা করে, এবং ইরানী ধর্মের খারাপ দিকগুলিকে পরিবর্তন করবার আশা রাখে, তখনই তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা সহজতর হয়ে গেল, যে অভিযোগ প্রমাণ হলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে, সেই মাথা উঁচু করে স্মিত হেসে সিয়াবকুশ অকম্পিত কণ্ঠস্বরে বললো—"ধন্যবাদ, ভাই মগোপত্। রাজনীতির খেলায় আজ তোমার জিত হলো, তবে কিনা একটু ভুল হয়ে গেল তোমার। রাজপুরোহিত যখন বিচারপতির আসনে বসে, আর তার সহকারী হয় কুকুরেরও অধম শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর কোনো প্রতিনিধি, তখন বিচার যে কি হয় তা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানে, এবং ইতিহাস তার সম্বন্ধে কি লিখবে তা তুমিও জানো। তুমি অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী, নীচ প্রকৃতির মানুষ, তবু অনুরোধ করি, এই দেশটাকে যেন আর কারো হাতে বেচে দিও না। বিশেষ করে এই অনুরোধ, ঐ শ্রেষ্ঠীটির প্রতি, কারণ তাদের গোষ্ঠীই সাধারণত দেশের মর্যাদা বেচাকেনা করে। এবার তোমার সৈন্যদের বলো মগোপত্, আমাকে এই কক্ষ থেকে যেখানে নিয়ে যাবার নিয়ে যাক।"

গুলনাজের ইশারায় সেনাবাহিনী সিয়াবকুশকে নিয়ে যেতে থাকে। সহসা সোরেন উঠে এসে থুথু ফেলে সিয়াবকুশ-এর মুখে। সে থমকে দাঁড়ায়, আস্তিনে মুখ মোছে, তারপর জোড়া হাতের হাতকড়া দিয়ে সজোরে আঘাত করে সোরেনের কপালে। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে ছিটকে পড়ে সোরেন, তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। দর্শকবৃন্দ স্তব্ধ, সৈন্যদল নিশ্চুপ।

—"কিছু মনে করো না, গুলনাজ! কুকুরদের আমি সবসময়েই পদাঘাত করে থাকি। আজ হাত তুললাম, কারণ এটাই আমার জীবনের শেষ আঘাত। বিদায়, বন্ধু! চলো, সেনাপতি!"

দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই চোখ তখন অশ্রুসজল।

আবার এসেছে নবরূপে সেজে বসন্ত ঋতু। মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিপাত চতুর্দিকের শ্যামলিমাকে করেছে গাঢ়তর। অথচ কোথাও কোনোদিকে বসন্ত-উৎসবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আর তিগ্রা নদী তো চিরকালই বড় নিস্পৃহ, বড় স্বার্থপর। মানব-জগতের দুঃখ-সুখের দিকে ফিরেও তাকায় না সে, উত্থান-পতনকে অবহেলা করবার মতো অবসরও তার নেই।

দু-বছর আগে ইরান বিনা কারণেই রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আর্মেনিয়া ও আইবর দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় ইরানের মজদয়াস্নী ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বাইজান্টিয়ান্ ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ইরানের বহু মানুষ যেমনভাবে মজদয়াস্নী প্রভাবকে উপেক্ষা করে অন্তরজাগর প্রবর্তিত দেরেস্তদীন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই একই কারণে, একইভাবে। আসলে মগোপত্ সম্প্রদায় জন্মসূত্রে উচ্চ-নীচ ভেদভাবকে এত বেশী প্রকট করে তুলেছিল যে, সাধারণ মানুষ প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করছিল বঞ্চনা ও অপমানের জ্বালা। সে তুলনায় বাইজান্টিয়ান্ ধর্ম ছিল উদার এবং সাম্যভাবে বিশ্বাসী। ক্রমশ আর্মেনিয়া ও আইবর প্রদেশ ইরানের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ইরানের প্রচলিত ধর্মের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। শবদেহ সংকারের ক্ষেত্রে দেখা গেল তারা কবর দেবার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। কোয়াত্ এবং খুস্রব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আবার তাদের দখ্ম্ প্রথায় [চিল-শকুনের খাদ্য হিসাবে মৃতদেহকে খোলা জায়গায় ছেড়ে রাখা] ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো। আইবর-রাজ গুর্জীন সাহায্য প্রার্থনা করলো বন্ধু বাইজান্টিয়ান্ মতাবলম্বী কাইজার জুস্তিনিয়নের কাছে। ইরান ও রোমানদের মধ্যে বেধে গেল যুদ্ধ।

সবে দু-বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অপমানজনক যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নেওয়ার আঘাত আজও ভুলতে পারেনি কোয়াত্। ওদিকে জুস্তিনিয়ন গণ্য হচ্ছে বাইজান্টিয়ান্ ধর্মের ত্রাণকর্তা রূপে। নিজের ধর্মপ্রাণতা প্রমাণ করবার অভিলাষে সে প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্র অধ্যয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ লেখক-দার্শনিকদের তালিকায় আছেন পিথাগোরাস্, সক্রেটিস্, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, অ্যাস্কাইলাস্ প্রমুখ। হাজার হাজার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে, বহু গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়েছে।

তস্পোন আজ যবন [গ্রীক] শরণার্থীতে ছেয়ে গেছে। কোয়াত্ তাদের গুন্দেশাপুর নগরে একটি গ্রীক শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার অনুমতি দিয়েছে। এমন কি সে আর্থিক সহায়তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, সে উদারনীতিতে বিশ্বাসী। প্রতিদ্বন্দ্বী রোমান কাইজারের শত্রু মাত্রেই তার বন্ধু, এটাই সে লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে

চায়। গ্রীক শাস্ত্রের শৈল্পিক, দার্শনিক ও নৈতিক উচ্চতাকে অনুধাবন করবার ক্ষমতা কোনোদিনই ছিল না মূর্খ ইরানী পুরোহিতগোষ্ঠীর। তাই মনে মনে তারা কোয়াতের উপর রুষ্ট হয়ে আছে। অবশ্যই খুস্‌রুব তাদের বুঝিয়েছে যবনদের সাহায্য করবার পিছনে কোন রাজনৈতিক চাল কাজ করছে।

বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবার পর থেকে কোয়াতের একমাত্র চিন্তা কি করে খুস্‌রুবকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা যায়। পথের কাঁটা সিয়াবক্‌শকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। কিন্তু কাবুস্‌ এখনো পজ্‌শাখার প্রদেশের শাসনকর্তা, এবং তার পক্ষে মজদ্‌কপন্থীদের প্রভূত সমর্থন আছে। অন্তরজাগর গ্রামীণ জনসাধারণের চোখে আজ প্রায় দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। আর রয়েছে চতুর ও মহাবিদ্বান মিত্রবর্মা। কিন্তু না, আগে অন্তরজাগর, তারপর মিত্রবর্মার পালা আসবে—মনে মনে ভেবে রেখেছে খুস্‌রুব ও তার গুরু মোবিদ্‌ গুলনাজ।

—"শাহেনশাহ। মজদ্‌ক অন্তরজাগরকে শেষ না করলে আপনার-আমার সিংহাসন নিরাপদ নয়, কারণ সে এবং তার শিষ্যসেবকরা চায় ভ্রাতা কাবুস্‌কে। কাবুস্‌কে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে সন্ন্যাসী হবার যতখানি উপযুক্ত, শাহেনশাহ হবার ততখানিই অনুপযুক্ত। সে যদি শাহেনশাহ হয়, তাহলে অন্তরজাগরের অশুভ প্রভাবে পড়ে, ইরানকে সে বেচে দেবে হয় রোমান কাইজারের কাছে, নয় হূন রাজা মিহিরকুলের হাতে। কাজেই ছল করে হলেও অন্তরজাগরকে হটাতে হবে।"

—"পুত্র খুস্‌রুব। আমার মৃত্যুর আগেই আমি তোমাকে ইরানের সিংহাসনে বসাবো, তাতে তুমি বা গুলনাজ কোনো সন্দেহ রেখো না মনে। কিন্তু অন্তরজাগরকে হটিয়ে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই কি ছলে তোমরা কার্যসিদ্ধি করবে, সেটা আমার জানা দরকার। ভুলো না, তার পাশে আছে মহাবিদ্বান এবং মহাকৌশলী মিত্রবর্মা, এবং মিত্রবর্মার পিছনে আছে আমারই সেনাবাহিনীর প্রায় কুড়ি হাজার কেদারীয় হূন। তারা মিত্রবর্মার আদেশ মানবে আগে, তোমার-আমার আদেশ মানবে পরে। কাজেই খুব সাবধান। এবার বলো, কি ছলের কথা ভেবেছ তোমরা।"

—"অন্তরজাগর এবং তার অনুগামীদের শাস্ত্রবিচার এবং বিতর্কের জন্য তস্পোনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার তিনদিন আগে আপনার অনুরোধে মিত্রবর্মা যাবে রোমান কাইজার জুস্তিনিয়নের কাছে কোনো এক বিশেষ বার্তা বহন করে।"

—"তারপর?"

—"অন্তরজাগর তস্পোনে আসবে। সঙ্গে আসবে প্রমুখ অনুগামীর দল···"

—"তারপর?"

—"ধৈর্য হারাবেন না, পিতা! তারপর কি হবে সে আপনি পরেই না হয় জানবেন!"

দেবোদ্যানের অধিবাসীরা শাস্ত্রবিচারের জন্য আমন্ত্রণের সংবাদ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তারা জানে যে যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রবিচার ও বিতর্কের ক্ষেত্রে মজদ্‌কপন্থী বিদ্বানদের কোনোদিনই মজদ্‌য়াস্নী পুরোহিতরা পরাজিত করতে পারবে না, কারণ মজদ্‌য়াস্নী ধর্মে কেবল ভাবাবেগ ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নেই। উপরন্তু শোনা গেছে যে ভারতীয় বিদ্বান মিত্রবর্মা শাহেনশাহ কোয়াতের প্রতিনিধি রূপে কাইজার জুস্তিনিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। দেবোদ্যানে খবর দুটি প্রচারিত হওয়া মাত্র সকলেই মনে করছে যে, সম্ভবত কাবুস্‌কে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবার পূর্বাহ্নে শাহেনশাহ কোয়াত্‌ এভাবেই ধীরে ধীরে দায়িত্ব অর্পণ করছে মজদ্‌কপন্থীদের উপর।

সেচনালার কিনারা ধরে হাঁটছেন অন্তরজাগর ও মিত্রবর্মা।

—"তাহলে আগামীকাল সকালেই রওয়ানা হচ্ছ তুমি?"

—"হ্যাঁ, অন্তরজাগর!"

—"বেশ, কিন্তু শান্তিদূতের সঙ্গে বিশ হাজার কেদারীয় হূন সেনা কেন যাচ্ছে, মিত্র?"

—"কেদারীয় হূন সেনা আমার অনুগত, এবং আপনার অনুগামী। তাই ওরা থাকলে খুস্‌রুবের পক্ষে আপনাকে হত্যা করা সহজে সম্ভব হবে না।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন অন্তরজাগর—"এটা তোমার আশঙ্কা, না নিশ্চিত প্রত্যয়?"

—"নিশ্চিত প্রত্যয়!"

—"অন্য কাউকে বলেছ?"

—"না।"

—"তাহলে না বলাই ভালো, মিত্র!"

—"আপনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন, আর আমাকে চুপ করে থাকতে হবে?"

—"বৈরী হয়ে কি শত্রুতাকে দূর করা যায়, পাগল! অবৈরী থেকে বৈরিতা দূর করতে হবে!"

—"আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন, কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষের কুটিল হিংস্রতা সম্বন্ধেও অসচেতন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!"

—"মিত্র, তুমি তো বিদ্বান মানুষ। শুধু প্রত্যক্ষ সফলতা-অসফলতার কথা ভাবো কেন? আজ থেকে তিনশ' বছর আগে মহাজ্ঞানী মানী এবং তাঁর চার হাজার অনুগামীদের হত্যা করা হয়েছিল। তা বলে কি সাম্যের আদর্শ লুপ্ত হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে? জেনে রেখো, মিত্র, কোনো বলিদানই ব্যর্থ হয় না! আত্মবলিদান সাধারণ মানবকে প্রেরণা দেয় উচ্চতর মানব হতে!"

—"আপনার আত্মবলিদান আমার চোখে আত্মহত্যারই শামিল।"

—"তুমি যখন ফিরে আসবে, হয়ত তখন আমি আর থাকব না। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তোমার?"

—"আপনি যাতে থাকেন, আপনার আদর্শ যাতে বেঁচে থাকে, তার ব্যবস্থা করা। দোহাই আপনার, অন্তরজাগর! এর অধিক কোনো প্রশ্ন করবেন না, কোনো আদেশ দেবেন না নতুন করে। আমি ভারতীয়, কাজেই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। বহু বছর ধরে মনের ভাব গোপন করার সাধনা করেছিলাম, কিন্তু আপনার ছত্রছায়া মাথার উপর থেকে উঠে গেলে মনের ভাব প্রকাশ হয়ে যাবেই। আমিও চাই যে সেটা প্রকাশ হোক। আপনি আমার আদর্শ, আমার জীবনের একমাত্র সঞ্চয়! আপনার প্রতি আমার সমস্ত আনুগত্য অটুট আছে এবং থাকবে। তবু বলি, প্রভু, আপনি বড় একদেশদর্শী, আপনি বড় স্বার্থপর।"

—"এ কি মিত্রবর্মা? তোমার চোখে জল? অন্য যে কোনো লোক হলে বিশ্বাস করা যেতো, কিন্তু তোমার চোখে···!"

—"হ্যাঁ, প্রভু, অনেক দিন বাঁধ দিয়ে রেখেছিলাম তো, মাঝখানের পলিমাটিও পরিষ্কার করবার সময় পাইনি, আজ বোধহয় বাণভাসিতে উপচে পড়েছে তাই।"

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আজ সহস্রাধিক মানুষের জমায়েত। শাহেনশাহ কোয়াত্ মঞ্চের উপর সিংহাসনে আসীন। আজ বর্ণানুসার আসন সাজানো হয়নি। মগোপত্ গুলনাজ ও পুরোহিত সম্প্রদায়, উচ্চ এবং মধ্যম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠীকুল, প্রধানমন্ত্রী, রাজকুমার খুস্রুব, সেনাপতিবৃন্দ—সকলে মঞ্চের সামনে মাটিতে একদিকে বসেছে। সামনে, একটু দূরে বসেছেন অন্তরজাগর, এবং তাঁর পিছনে পঞ্চাশ জন মজদ্কী বিদ্বান।

কোয়াত্ ইশারা করলো। শাস্ত্র বিচার শুরু করবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালো মগোপত্ গুলনাজ—"আজকের শাস্ত্র বিচার সভায় আলোচ্য বিষয় হলো মজদ্ক প্রবর্তিত নারী-পুরুষের নির্বাধ মেলামেশা করাবার প্রথা। এই প্রথার পক্ষে যুক্তি পেশ করবার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি মজদ্ক অন্তরজাগরকে।

অন্তরজাগর উঠে দাঁড়ালেন। সহসা পর্দা নেমে এলো মঞ্চের সামনে। কোয়াত্কে আর দেখা গেল না। শোনা গেল খুস্রুবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—"শেষ করে দাও! একটা মজদ্কপন্থীও যেন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে না যায়।" সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ' তীর নিক্ষিপ্ত হলো অন্তরজাগরকে লক্ষ্য করে। তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। যন্ত্রণায় যাঁর আকুল হয়ে আর্তনাদ করে ওঠা উচিত, তিনি হাসলেন মধুর হাসি। চোখের সামনে যাঁর ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার, তাঁর চোখ যেন সহসা উজ্জ্বলতর হয়ে স্নেহসিক্ত হয়ে তাকিয়ে রইলো খুস্রুবের দিকে। টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন—"খুস্রুব—ঈশ্বরের আনন্দ, ঈশ্বরের

ইচ্ছা।" তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে তাঁর অনুগামীরাও একে একে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে সৈন্যদের আক্রমণে। আবার শোনা গেল খসরুবের আদেশ—"সমস্ত মজদকপন্থী কুত্তাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে ঝুলিয়ে রাখো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। কিন্তু অন্তরজাগরকে নয়। তাকে রথে চাপিয়ে ঘোরানো হবে সারা দেশের গ্রামে-শহরে-নগরে। তার গলিত বিকৃত মৃতদেহ দেখে যার চোখে জল আসবে, তাকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। পৃথিবীতে মজদকপন্থী কেউ যেন না বেঁচে থাকে!"

মজদকী বিদ্বানদের মৃতদেহ বল্লমের ডগায় ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছে সৈন্যরা। ধুলো উড়ছে পায়ে পায়ে। সেই ধুলোয় ধূসরতর হচ্ছেন অন্তরজাগর। অকালবৃদ্ধ কোয়াত্ কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালো তাঁর মৃতদেহের পাশে। হয়ত অনেক পুরনো স্মৃতি ভিড় করে এলো তার মনে। সেই প্রথম পরিচয়, সেই নগর-পরিদর্শন, বিস্মৃতি কারাগার···আরো কি যেন, কি যেন? মনে পড়ে না কোয়াতের। কিছুতেই মনে পড়ে না।

কোয়াতের পাশে এসে দাঁড়ালো পুত্র খসরুব। সে কোয়াতের ব্যথাতুর মুখভাব লক্ষ্য করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো—"দেখবেন মহামান্য পিতা, চোখে জল না এসে যায়। সৈন্যদের প্রতি আমার নির্দেশ তো শুনেছেন আপনি!"

কোয়াত্ তার প্রিয় পুত্রের এই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করে কেঁপে ওঠে আরো, মৃদুস্বরে বলে—"রাজতন্ত্রে পুত্র মাত্রেই জনকভক্ষী, মাতা-পিতার হন্তারক।" খসরুব পিতার সেই মৃদু স্বর শুনতে পায়, এবং উচ্চতর অট্টহাস্যে আন্দোলিত হতে থাকে।

এমন সময় প্রাসাদ-দ্বারে এক প্রবল উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায়। কলরবে বিরক্ত হয়ে খসরুব চীৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছে, এমন সময় উন্মুক্ত শোনিত-সিক্ত তরবারি হাতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে মিত্রবর্মা। তাকে দেখে খসরুব উদ্ভাসিত আনন্দে বলে ওঠে—"আসতে আজ্ঞা হোক্ বিখ্যাত ভারতীয় বিদ্বানের। অনেক দিন ধরেই ভাবছি তোর মৃতদেহটা বল্লমের ডগায় নাচাবো, আর মাথাটা কেটে পাঠিয়ে দেবো কুকুরের বাচ্চা মিহিরকুলকে। আজ সে আশা পূর্ণ হবে।"

মিত্রবর্মা যায়নি রোমান সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে যা ভেবেছিল, ঘটেছে তাই। আসতে দেরি হয়ে গেছে তার। সে তাকিয়েছিল অন্তরজাগরের শান্ত সমাহিত মৃত মুখটির দিকে। খসরুবের আস্ফালন সে শুনেছিল। তার দিকে না তাকিয়েই সে বললো—"পূর্ণ হবে না, দো-আঁশলা রাজকুমার। তোমার দো-আঁশলা বেশ্যাপুত্র গুরু গুলনাজও সামলাতে পারবে না আমাকে, এবং আমার সেনাবাহিনীকে।" ততক্ষণে প্রায় বিশ হাজার কেদরীর হুন সেনা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ঘিরে ফেলেছে চারিদিক। খসরুব বুঝতে পেরেছে যে তার নিজস্ব সেনাবাহিনী হুন সেনা দেখেই পালাবার পথ খুঁজছে, এবং

প্রধান প্রতিপক্ষ মিত্রবর্মা সব কিছু ভুলে তাকিয়ে আছে তার গুরু অন্তরজাগরের মৃত স্মিত মুখের দিকে। প্রথা অনুযায়ী কোনো আহ্বান না জানিয়েই সে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিত্রবর্মার উপর, সঙ্গে তিনজন অনুগত সেনাপতি। সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় শূন্যে, ঝলসে ওঠে মিত্রবর্মার তরবারি, এবং খুসরুবের তিন সেনাপতি হাত চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে। খুসরুব অবাক হয়ে দেখে যে সে নিরস্ত্র, তার তরবারি শত্রুর হাতে।

—"তোমাকে দো-আঁশলা বলেছিলাম তোমার জন্মসূত্রের কারণে নয়, খুসরুব! যারা রাজা হতে চায়, অথচ অস্ত্র শিক্ষা করে না; যারা মানুষ হয়েও মানুষকে না ভালোবেসে হত্যা করে নির্বিচারে, তারাই দো-আঁশলা, যেমন তুমি! তোমার ভবলীলা শেষ করতে আমার এক পলকও লাগা উচিত নয়, কিন্তু আমি সব কিছুই চাই ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে!"

—"কি চাও তুমি?"

—"তোমার ভয়ংকর মৃত্যু, খুসরুব! গুরু অন্তরজাগরের মৃতদেহ আমি নিয়ে যাবো। এক বছরের মধ্যে ফিরে আসবো সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী পঞ্জশাখারপত্ কাবুসকে সঙ্গে নিয়ে। ঠিক যেমনভাবে তোমার পিতা কোয়াত্‌কে বসিয়েছিলাম ইরানের সিংহাসনে, প্রয়োজনবোধে তোমাকে এবং কোয়াত্‌কে হত্যা করে কাবুস্‌কে বসাবো সেই সিংহাসনে। তুমি, তোমার পিতা বেইমান কোয়াত্ বা রাজকুমার কাবুসের মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ আর কি হতে পারে? রাজতন্ত্র কি-ই বা দিতে পারে দেশকে, দেশের মানুষকে? দেশের মানুষ তোমাদের বারবার বসাবে সিংহাসনে, আর তোমরা বারবার পুরোহিত-শ্রেষ্ঠীদল সামন্তবৃন্দের স্বার্থের খাতিরে তাদের পথে বসাবে? কিন্তু দুনিয়ায় বহু শতাব্দী ধরে এমনই হতে থাকবে, আর আমরা যথাসম্ভব সেই অন্যায়-অবিচারকে রুখতে থাকবো!"

মিত্রবর্মার ইশারায় অন্তরজাগরের মৃতদেহ তুলে নিল হূন সেনাবাহিনী। রাজকীয় মর্যাদায় কুচ্‌কাওয়াজ করতে করতে চলে যেতে লাগলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ থেকে। কোয়াতের সামনে থমকে দাঁড়ালো মিত্রবর্মা—"সব কিছু মনে আছে তো, শাহেনশাহ?"

—"হ্যাঁ, মিত্র!"

—"বড় বুড়ো হয়ে গেছ তুমি।"

—"হ্যাঁ, মিত্র! তুমি নেই কাছে, সিয়াকে আমিই দূরে ঠেলে দিয়েছি!"

—"জানি, কোয়াত্! যখন শুনবে আমি ফিরে আসছি কাবুস্‌কে সঙ্গে নিয়ে, তুমি বরং ঝাঁপিয়ে পড়ো তিগ্রায়। কাবুস্ সিংহাসনে বসবার পর আমিও কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাবো, আমাদের মধুর স্বপ্নকে কারো মধ্যে সঞ্চারিত করে। আমরা থাকব না, কিন্তু আমাদের মধুর স্বপ্ন চিরকাল থাকবে, সে অমর!"

—"আমি, শাহেনশাহ কোয়াত্, সেই অমরত্বকে প্রণাম করি!"

—"বিদায়, বন্ধু!"

অন্তরজাগরের মৃতদেহ, মিত্রবর্মা, কেদারীয় হূন সেনা—সকলেই চলে যায় একে একে। কোয়াত্ তাকিয়ে দেখে সেই শোভাযাত্রা। সে জানে তারা আবার ফিরে আসবে। তাই সে তিগ্রা নদীর সেতুর দিকে হাঁটতে থাকে।

পরিশিষ্ট

মজদ্‌ক কাল্পনিক চরিত্র নয়। এই উপন্যাসে তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাও লেখকের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলে সহৃদয় পাঠক যেন উড়িয়ে না দেন। উপন্যাস রচনার সময় আমি বেশ কিছু ইতিহাস গ্রন্থ পড়েছিলাম, যার একটি তালিকা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এইসঙ্গে দাখিল করছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, মজদ্‌ক সম্পর্কে প্রাপ্তব্য ঐতিহাসিক তথ্যাবলী পারসিক ও মুসলমান লেখকদের তুলনায় অধিকতর সংখ্যায় কৃশ্চিয়ান লেখকরাই আহরণ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। Ecclesiastical History রচনার প্রবণতা কৃশ্চিয়ানদের মধ্যেই প্রথম লক্ষিত হয়, সম্ভবত এটাই তার মুখ্য কারণ।

১ ॥ ইরানের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীনতম লেখক সম্ভবত জোশুয়া স্তীলিত। *The Chronicle of Joshua Stylite* [Cambridge Edition—1882] গ্রন্থটিতে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর ক্রনিকলের রচনাকাল ৫০৩ খৃঃ। অর্থাৎ সেই সময়ে শাহেনশাহ কোয়াত্‌ হৃত সিংহাসন উদ্ধার করেছেন। স্তীলিতের রচনায় ৪৯৪ খৃঃ থেকে ৫০৬ খৃঃ পর্যন্ত ইরান, ইরান-শ্বেত হূন রাজনৈতিক সম্পর্ক, ইরান-রোমান বৈরিতা, বাইজান্‌টিয়ান ধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া আছে।

স্তীলিত নিঃসন্দেহে ইরানের সভ্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজী ছিলেন না। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ও ইরানের যুদ্ধের কারণ হিসাবে তিনি মুখ্যত দায়ী করেছেন শাহেনশাহ কোয়াত্‌কে। কোয়াতের নামকরণ করেছেন 'the Barbarian', এবং ইরানী সৈন্যদলের 'The uncivilised brutes'। ৫০১ খৃঃ অব্দে কোয়াত্‌ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। স্তীলিতের মতে থিওদোসিয়স্‌পোলিস্‌ নগরের প্রত্যেকটি গৃহ লুট করা হয়েছিল, 'and, thereafter, no house remained upright……it [the city] turned into a huge expanse of knee-deep ashes…'।

স্তীলিতের গ্রন্থটি শেষ হয়েছে অমিদা নগরের পতনের কাহিনী বর্ণনা করে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের উপর এটি ছিল…'the second onslaught of the Barbarian' [৫০৬ খৃঃ]। স্তীলিত দাবী করেছেন যে অমিদার যুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় আশী হাজার মানুষ মারা যায়, এবং কোয়াতের আদেশে

'the corpses were thrown into the river Dazla' [তিগ্রা]। তারপর তিনি বলছেন—'বোকাটা জানতো না যে মৃতদেহ নদীর জলকে দূষিত করবে, এবং নদীটি তার রাজ্যের ভেতর দিয়েই নীচের দিকে নেমে গেছে।' লেখক এ-কথাও বলেছেন যে অমিদা নগরেই কোয়াত্ প্রথম 'Public Bathhouses' দেখেন। সেগুলির অনুকরণেই তস্পোন, তেহেরান, গুন্দেশাপুর প্রভৃতি ইরানী নগরে স্নানাগার স্থাপন করা হয়।… 'শয়তানটা অমিদা নগরেই জীবনে প্রথম বার স্নান করে…আশা করা যায় এবার সে ধীরে ধীরে সভ্য মানুষে পরিণত হবে · '।

স্তীলিত শাহেনশাহকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন। সেগুলি তাঁর কোয়াত্-বিরোধী মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। আমি মনে করি তাঁর ভাষা প্রকৃত ও নিরপেক্ষ কোনো ঐতিহাসিকের ভাষা নয়। তবু তাঁর রচনায় কোয়াতের বিরুদ্ধে বণিক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র, কোয়াতের গদিচ্যুতি, মহারাণী সম্বিকার রূপবর্ণনা, মহাসেনাপতি সিয়াবক্শ-এর সহায়তায় কারাগার থেকে পলায়ন, কেদারীয় হূন রাজ্যে আশ্রয়লাভ, সিংহাসন পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসকারগণ অনেকেই স্তীলিতের এই চিত্রচরিত্র সমর্থন করেছেন।

মজদ্দক সম্বন্ধে স্তীলিতের মন্তব্য : 'he was no Jesus…a very difficult man, indeed…almost uncontrollable in many ways… one of the greatest sons and the most secular person ever born on the Sasani soil…' ইত্যাদি প্রমাণ করে যে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিদেশী ঐতিহাসিককেও প্রভাবিত করেছিল। পৃথিবীর খুব কম মহাপুরুষই তাঁদের সমকালীন ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন।

২॥ প্রকোপিয়স্ ছিলেন বাইজান্টিয়ান ধর্মাবলম্বী পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার। ৫২৭ খৃঃ অব্দে তিনি রোমান প্রধান সেনাপতি বেলিজিওর আইনসংক্রান্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি শাহেনশাহ কোয়াতের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত দেখেছিলেন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর রচিত গ্রন্থটি প্রকাশ করে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে কোয়াত্ তাঁর স্ত্রী মহারাণী সম্বিকার পোশাক পরিধান করে বিস্মৃতি কারাগার থেকে পলায়ন করেন। বিস্মৃতি-কারাগারের প্রধান কারাগারিক সম্বিকার প্রেমমুগ্ধ ছিল। কোয়াতেরই অনুরোধে মহারাণী অনেক মাস পর্যন্ত তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় চালিয়ে যান। প্রোকোপিয়সের মতে '…through Queen Sambik was not given the sack after the deposed Emperor became reinstated on the throne of Iran, he never again slept with her under the impression that she had a lot of happy times with the Jailor, as well as with Shiabux, his trusted ally…'।

উপন্যাসে যে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলিতে প্রোকোপিয়সের গ্রন্থ অনুসরণ করাই আমি উচিত মনে করেছিলাম, কারণ তিনি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে পৌঁছে প্রকৃত ইতিহাসকারের কাজ করেছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। অযথা কাউকে ছোট বা বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা তাঁর রচনায় নেই।

৩॥ আগাথিয়াস [৫৮৩ খৃঃ] ছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক। কোয়াত্ এবং তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁর রচনাই সর্বাপেক্ষা মান্য করা হয়ে থাকে। তস্পোনের রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজের সংগ্রহশালা থেকে তিনি তথ্যাদি আহরণ করেন, এবং ইতিহাসের নিরিখে সেইসব দলিলের সত্যতা যাচাই করে নেন। যে সকল ঐতিহাসিক রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন, তাদের রচনার সত্যতা সম্পর্কে আগাথিয়াস সর্বদাই সন্দিহান ছিলেন। তাই যাচাই না করে তিনি কখনও লিখিত তথ্যকে মেনে নিতেন না।

পূর্বতন অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতো তিনিও সামন্ত-শ্রেষ্ঠী-পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রের ফলে কোয়াতের গদিচ্যুতি, কারাবাস, পলায়ন, কেদারীয় হূন রাজ্যে আশ্রয় লাভ, মহারাজা তোরমানের কন্যার সঙ্গে বিবাহ, তোরমান-পুত্র যুবরাজ মিহিরকুলের সাহায্যে ইরান আক্রমণ এবং সিংহাসন পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পরবর্তীকালে কোয়াতের আচরণের পরিবর্তনের বিবরণ উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে, তার প্রধান সূত্র আগাথিয়াসের গ্রন্থ এবং জাঁ মলালা রচিত ক্রনিকল।

৪॥ জাঁ মলালা আন্তিয়াক নগরে জন্মেছিলেন [৫৬৫ খৃঃ]। আগাথিয়াসের রচনায় যে ঘটনার আভাস মাত্র দেওয়া হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেছে জাঁ মলালের গ্রন্থে। মানীপন্থী বা মজদ্‌কপন্থীদের নেতা ছিলেন অন্তরজাগর। মহারাণী সম্বিকা গোপনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাহেনশাহ কোয়াত্‌ও অন্তরজাগরের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, কেদারীয় হূন রাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সময়ে ইরানের সাধারণ মানুষের মনকে কোয়াতের পক্ষপাতী করার পিছনে অন্তরজাগর ও তাঁর অনুগামীদের অনেকখানি হাত ছিল। অন্তরজাগর ভেবেছিলেন যে কোয়াত্ সিংহাসনে পুনর্বার বহাল হলে মানী-প্রবর্তিত দেরেস্তদীন পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পাবে, এবং পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাবে। কার্যত তা হয়নি। অন্তরজাগর শাহেনশাহ কোয়াতের দ্বিতীয় পুত্র খুস্‌রবকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করে নিতে রাজী ছিলেন না। মহারানী সম্বিকার পুত্র কাবুস্ ছিল তাঁর পছন্দসই প্রার্থী। কিন্তু কোয়াত্ ছিলেন খুস্‌রবের প্রতি পুত্রস্নেহে অন্ধ। তোরমান-দুহিতার পুত্র ছিল জন্মান্ধ। কাজেই সে সিংহাসনের যোগ্য প্রার্থী ছিল না। খুস্‌রবের পরিকল্পনা অনুসারেই একটি ধর্মসভায় দেরেস্তদীনের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্তরজাগরও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই